বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে

অশোককুমার দে এম. এ., পি-এইচ. ডি.

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার ○ ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ১৯৭১,

প্রকাশক :
কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার
ঢাকা—১

মুদ্রণে :
এম, আলম
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড,
ঢাকা—৩

পিতামহ ও পিতামহীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

ভূমিকা

একজন বৈজ্ঞানিক আসলে কিছু প্রমাণ করেন না, প্রকৃত ব্যাপার খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন। সাহিত্য-সমালোচক সাহিত্য-এলাকার সেই বৈজ্ঞানিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষণীতে আমার প্রীতিভাজন ছাত্র ডক্টর শ্রীঅশোককুমার দে বৈজ্ঞানিক-নিষ্ঠায় বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপ নির্ণয়ের সেই চেষ্টাই করেছেন। দুর্লভ ও অনতিসুলভ তথ্যের সাহায্যে তাঁর এই প্রয়াস। বাংলা গদ্যে সামাজিক মানুষের ভিড়, বাংলা কথাগদ্যের বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায় লেখকের বস্তুপঠন ও বস্তুনিষ্ঠা তথা বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির পরিচয় বহন করছে।

অপেক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও ডক্টর দে যে-নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে' গবেষণাগ্রন্থটির রচনাকর্ম সম্পন্ন করেছেন, তার সম্পূর্ণ পরিচয় সকলে হয়তো পাবেন না। আমি পেয়েছি। এবং মুগ্ধ হয়েছি।

বয়সে নবীন হলেও বাংলা উপন্যাসকে আজ আর অপরিণত বলা চলে না। বৈচিত্র্যে ও অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্যে কিঞ্চিদধিক শতাব্দীকালের ১৮৭২-১৯৭১ বাংলা উপন্যাস কম সমৃদ্ধ নয়। পাঠকের প্রশ্রয় সে ভোগ করে আসছে জন্মলগ্ন থেকেই। উপন্যাসকেই এক অর্থে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা 'লোক' সাহিত্যরূপে গণ্য করা যায়। জনপ্রিয় হলেও উপন্যাসের আভিজাত্য অস্বীকৃত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে সাধারণভাবে ছাড়াও বিশেষ-পত্ররূপে তার স্বীকৃতিলাভ উল্লেখযোগ্য। আর উপন্যাসের আলোচনা? হয়েছে। হচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জিজ্ঞাসু পাঠককে তৃপ্ত করার পক্ষে তার পরিমাণ ও প্রকৃতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই উপন্যাসের স্বতন্ত্র আলোচনার গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে সম্প্রতি। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি রচনা ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আমার 'রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়' গবেষণাগ্রন্থটির রচনা ও ছাপার কাজ ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

প্রায় সেই সময়েই আমার প্রীতিভাজন ছাত্র অশোক আমার কাছে উপন্যাস নিয়েই গবেষণা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁর উৎসাহে বাংলা উপন্যাসের

উদ্ভব-যুগের সেই কুয়াশাচ্ছন্ন স্তরটিকে আমরা বেছে নিলাম, যেদিকে আলোকপাতের দায়িত্ব অপরিহার্য বলে মনে হয়েছিল।

মুদ্রণপ্রমাদ প্রভৃতি ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ডক্টর দে তাঁর গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রথম পর্যায়ের এবং তার শিল্পরূপের যে তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন তার উপযোগিতা এই থিসিসের পরীক্ষকদ্বয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও অধ্যাপক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, গ্রন্থে প্রকাশিত সব মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের সঙ্গেই আমি ও অপর পরীক্ষকদ্বয় একমত নই। এ দেশে বিশেষত সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে, গবেষকগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ-সুবিধাদানের আমরা একান্ত পক্ষপাতী। গবেষণা-নির্দেশক আসলে পরামর্শদাতা বন্ধু। গবেষক নির্দেশকের প্রতিধ্বনিমাত্র হলে উভয়েই ব্যর্থ।

'বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে' গবেষণাগ্রন্থটি একটি বিশেষ কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট কমিটির একটি পূর্বপ্রচলিত নিয়ম-সংশোধনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। তখন পর্যন্ত [ডিসেম্বর, ১৯৬৯] বিভাগীয় প্রধান কোনো কারণ না দেখিয়েও গবেষণা-ইচ্ছুক ছাত্রের আবেদনপত্র প্রথম স্তরেই খারিজ করে দিতে পারতেন। গবেষণা-নির্দেশককে থাকতে হতো অসহায় দর্শকের ভূমিকায়। আমি অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত নিয়মটির সংশোধন সম্ভব হয়েছিল। আদর্শগত কারণে সেদিন যে ঝুঁকি নিতে হয়েছিল তার সুফল এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গবেষণা-নির্দেশক ও গবেষকই ভোগ করতে পারছেন, এই আমার অসামান্য তৃপ্তির কারণ।

উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক, ব্যক্তিবিশেষের একক উদ্যমে কিছুই সম্ভব ও সফল হয় না। ব্যক্তি উপলক্ষমাত্র। অনেকের সহৃদয়তা ও সহযোগিতার ফলেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতিগত প্রশ্নে যাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম তাঁদের তাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সেদিন যিনি সর্বাধিক সহযোগিতা করেছিলেন, তিনি—এদেশের অন্যতম শিক্ষা-নেতা ও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ্ গঠনের অন্যতম অব্যবহিত প্রেরণাদাতা রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের সুযোগ্য পুত্র তদানীন্তন রেজিস্ট্রার ও এখন রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ, আর্টস ফ্যাকালটির তদানীন্তন ডিন এখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগের তদানীন্তন প্রধান, এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অম্বিকাপ্রসাদ ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগের শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত ডক্টরেট কমিটির সভায় আমার বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅরবিন্দনাথ বসু ও রেজিস্ট্রার শ্রীঅরুণকুমার গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণা-মূলক কর্মে যে-উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকেন, তার পরিচয় আমরাও পেয়েছি। তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

জিজ্ঞাসা-র সত্বাধিকারী শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগের জন্য বাঙালি পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। এই গ্রন্থের দায়িত্বগ্রহণের জন্য এই সহৃদয় প্রকাশকের কাছে আমি ও গ্রন্থকার কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। তবু এর বৈশিষ্ট্য ও গুণের জন্য পাঠক সমালোচকের সহৃদয় প্রশ্রয় কামনা করছি। জুন : ১৯৭১।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

লেখকের নিবেদন

'বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে' বস্তুত বাংলা 'নভেল'-এরই উৎস সন্ধানের প্রয়াস। বাংলা কথাসাহিত্যে শিথিল অর্থে নানা ধরনের কাহিনী 'উপন্যাস'-নামে চিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু সব কাহিনীই নভেল নয়। আমরা নভেল-এর উৎস সন্ধান করেছি এবং তার শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ নভেল অর্থে 'আখ্যান' শব্দটি বেছে নিয়েছিলেন: এই বইতে ঐ শব্দটির প্রতি আমাদের পক্ষপাতও পরিস্ফুট। কিন্তু পরিচিতির পক্ষে সুবিধাজনক বলে 'উপন্যাস' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।

এই গবেষণাকার্যের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ ও পূর্বতন রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের কাছে আমি চিরঋণী। এঁদের ব্যবহারে ছাত্রদরদী আদর্শ-বাদী ও দৃঢ়চেতা প্রকৃত শিক্ষাবিদের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম। গবেষণা নির্দেশকরূপে ডক্টর ঘোষ অনন্য। তাঁর লিখিত ভূমিকাটি আমার সামান্য প্রয়াসকে তাৎপর্য দান করেছে। তাঁর আগ্রহ, সদাজাগ্রত দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা ও উৎকণ্ঠা, সাহায্য ও স্নেহচ্ছায়া এবং শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা নন্দিতা ঘোষের স্নেহানুকূল্যেই আমার পক্ষে দূরাঞ্চলে থেকেও এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণাকার্যে আর যাঁদের কাছে প্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছি: তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ দত্ত, কণিকা মজুমদার, জয়ন্তী সরকার, সবিতা মজুমদার এবং তপনকুমার ঘোষ, প্রশান্ত সেনগুপ্ত, বিমলকান্তি ঘোষ, শ্যামল সরদার প্রমুখ অধ্যাপকবন্ধুদের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তপন, কল্যাণ ও কৃষ্ণা: এই তিন ভাইবোনের নামও গ্রন্থের নির্ঘণ্ট-রচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

জিজ্ঞাসার শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় গ্রন্থটির দায়িত্ব নিয়ে ও অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য মুদ্রণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ছাপার কাজ দ্রুত শেষ করতে গিয়ে বেশ কিছু ত্রুটি থেকে গেল। সেজন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে

প্রস্তাবনা

আমাদের যাত্রা 'বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে'। কিন্তু বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত রচনাতেই সেই যাত্রার অবসান নয়। প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসে পৌঁছেও আমাদের সন্ধান সমাপ্তি লাভ করে নি। কারণ বাংলা উপন্যাসের রস-রূপ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে [বিষবৃক্ষ (১৮৭২)—কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৬)] নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি (১৯০১) রচনারম্ভ পর্যন্ত আর কোনো ঔপন্যাসিকের কোন উপন্যাসেই যথার্থভাবে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার বহনের সামর্থ্য লক্ষিত হয় নি। ঐতিহ্য আত্মস্থ করতে পারলেই নব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্য আত্মস্থ করতে পারাতেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি। বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তের উইল-এর রস-রূপকে আত্মস্থ করার ফল চোখের বালি।[১] তাই বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে যাত্রা আরম্ভ করলেও আলোচনার সম্পূর্ণতা ও সৌকর্য বিধানের জন্য আলোচনা শেষ হয়েছে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর নভেল-লক্ষণাক্রান্ত রচনাবলীকে স্পর্শ করে। সেই হিসাবে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীকেই এই আলোচনার কালসীমা রূপে নির্দিষ্ট করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য নভেল-এর অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট শিল্পশৈলী গড়ে ওঠে এবং এটি উপন্যাস নামে চিহ্নিত হয়। "য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল।"[২] রবীন্দ্র-নাথের এই উক্তি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। বাংলায় গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যে

১. খসড়া পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি রচনাটির নাম ছিল বিনোদিনী। এই নামকরণ উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনীর নামেই হয়েছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে এই পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ হয়। পরে বঙ্গদর্শন-নবপর্যায়ে (১৯০১) রচনাটি চোখের বালি এই নতুন নামে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণ কৃপালিনী কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত এই উপন্যাস Binodini নামেই প্রকাশিত হয়।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/কালান্তর/রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৪ খণ্ড/বিশ্বভারতী/১৯৫৩/২৪৮ পৃঃ।

উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এবং এই বাংলা গদ্যের বিকাশের পথেই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের উদ্ভব।

"তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।"[৩] জীবন-স্মৃতি গ্রন্থে ভারতী-শীর্ষক অধ্যায়ে নিজের প্রথম জীবনের সাহিত্য রচনা প্রয়াসের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি নির্ধারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকৃত এই মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। দুটি দিক থেকে এর তাৎপর্য ভেবে দেখার যোগ্য। এক. বিচ্ছিন্ন কিছু সার্থক প্রয়াস সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ তখনো গড়ে ওঠে নি যা অবলম্বন করে যুগোপযোগী সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে; দুই. নিজস্ব কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শ না থাকায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সৃজ্যমান অবস্থায় অক্ষমের হাতে পড়ে আবর্জনায় পূর্ণ হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য নভেল-এর অনুকরণে বাংলায় অনুরূপ রচনা প্রবর্তনের উৎসাহ-আতিশয্যের ফলে রচিত উপন্যাস নামে চিহ্নিত গ্রন্থগুলির বহুলাংশ এর ব্যতিক্রম নয়।

কেননা, আমাদের ধারণা, উপন্যাস নামে রচিত তৎকালীন গ্রন্থাবলীর একটি বিরাট অংশই প্রকৃত নভেল নয়। কারণ অধিকাংশ লেখকই ইংরেজি নভেল-এর অনুকরণে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেও নভেল-এর শিল্পগত তাৎপর্য অনুধাবনে দ্বিধা ও সংশয়ের স্তর অতিক্রম করতে পারেন নি। জীবনকে অনুসরণ করে যখন কথাসাহিত্য রচিত হয় এবং পাঠক যখন রচনায় নিজেকে শিল্পশোভন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে; নিছক গল্পরস নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবরসই যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখনই 'নভেল' নামক জীবনানুসারী শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

এক. সুস্পষ্ট জীবনানুসারী সাহিত্যবোধ না থাকায় বাংলায় নভেল রচনা প্রথম দিকে সার্থক হয় নি, যদিও সেগুলো কথামূলক রচনা হয়েছিল; দুই. বাংলায় নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপে 'উপন্যাস' শব্দটি যথার্থ নয়। চলমান জীবনের শিল্পিত বিন্যাস-রূপে নভেল-এর যে-শিল্পবিশেষত্ব, উপন্যাস তুল্য অর্থদ্যোতক নয়, পক্ষান্তরে ভারতীয় সাহিত্যাদর্শে উপন্যাস-অর্থে কথামূলক রচনাকেই বুঝি, নভেল অনুরূপ অর্থদ্যোতক নয়।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/জীবনস্মৃতি/১৯৬৩/৮৪ পৃঃ।

সামগ্রিক ভাবে আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি :

ক. বাংলায় উপন্যাস বেশে নভেল ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ফল, এর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্কই নেই।

খ. সৃজ্যমান কথাসাহিত্যের ধারায় উপন্যাস নামে যে-গল্পসাহিত্য রচিত হয়েছে তার সবগুলিই নির্বিচারে নভেল রূপে গ্রহণযোগ্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলায় নভেল-এর উদ্ভব—বিষবৃক্ষ (১৮৭২)-এ বাংলা নভেল-এর সূচনা, চোখের বালি-তে বাংলায় নভেল রচনায় বঙ্কিম-পর্বের অবসান ও রবীন্দ্র-পর্বের সূচনা।

বাংলা সাহিত্যে নভেল-এর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে যে-সব আলোচনা হয়েছে, যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেগুলির পরিচয় গ্রহণ করেও কোনো কোনো বহু প্রচলিত মত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা একাত্ম হতে পারি নি এবং প্রয়োজনবোধে ভিন্ন মত পোষণে বাধ্য হয়েছি। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের বিভিন্ন স্তরে এই সব কিছুই আলোচিত হয়েছে। উপন্যাস বেশে নভেল-এর উৎস সন্ধানেই আমাদের যাত্রা, কিন্তু কোথায় পাব তারে ? সেই পথের সন্ধানেই আমাদের আলোচনা কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে। আপাত-বিচারে এই বিষয়বিন্যাস কারো কারো কাছে যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একথা স্মর্তব্য যে, আমাদের আলোচনা ততটা রসাস্বাদনমূলক নয়, পরন্তু বিশ্লেষণনির্ভর। প্রকৃতপক্ষে আলোচনাকে প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতে সুবিন্যস্ত ও যুক্তিসঙ্গত করার জন্যই পরবর্তী সমগ্র আলোচনা সাতটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি "উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব ও বাংলা সাহিত্যের রূপভেদ" এই শিরোনামে চিহ্নিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিনব রূপান্তরের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধসঞ্জাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবিক চেতনা বাঙালির জীবনবোধে পরিবর্তন আনে। এই নতুন জীবনবোধ সৃজনে সমকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিবর্তিত সামাজিক অবস্থা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কোম্পানির নগরভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রামীন সাধারণ মানুষের জীবনও বিবর্তিত হতে থাকল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয়-এর বিদেশীর প্রশ্ন ও নগরবাসীর উত্তর তা জানিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে বাঙালি জীবনে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কথা। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাঙালি জীবনে সর্বপ্রকার অভিনবত্বের ভগীরথ ছিল।

লক্ষণীয় যে, নগর জীবনকেন্দ্রিক সংঘাত-দ্বন্দ্ব-জটিলতার মধ্য দিয়ে বাঙালি-জীবন ক্রমেই বাস্তব ভাবাপন্ন ও মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। জীবন-বোধের এই পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যের সংসারে দেবতা মানুষকে জায়গা করে দেয় এবং বাংলা সাহিত্যে মানবস্বীকৃতির নব পর্যায় সূচিত হয়। বাংলা গদ্য ও নভেল রচনার প্রয়াস এর প্রধান পরিচয় স্থল। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্য বিচিত্র শিল্পশৈলীর অধিকারী হয় এবং নভেল এই শিল্পশৈলীর ধারায় বিশেষ অভিনবত্ব আনয়ন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "নভেল ভাবনা : বিদেশে ও এদেশে।" এই অধ্যায়ে প্রথমে নভেল-এর সংজ্ঞার্থ আলোচিত হয়েছে। নভেল হলো পাশ্চাত্ত্য শিল্প-শৈলী এবং ভারতবর্ষে এই শিল্পভাবনা বিদেশাগত। এই কারণে আমাদের কাজের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাস-শিল্পশৈলীর স্বরূপলক্ষণ বিচারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের প্রদত্ত নভেল-এর সংজ্ঞার্থ কালানুক্রম রক্ষা করে গৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। অধিকন্তু এই শিল্পশৈলী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের ভাবনায় কী ভাবে ধরা দিয়েছিল, তার এক কালানুক্রমিক আলোচনা এই পর্যায়ে বিধৃত হয়েছে। এই আলোচনা থেকেই অনুভূত হয় যে, নভেল-জাতীয় রচনা সম্বন্ধে সে-কালের বাঙালি কথা-সাহিত্যিকদের অসংবদ্ধ ধারণাই বাংলা সাহিত্যে নভেল-অর্থে উপন্যাসের আবির্ভাবকে বিলম্বিত করেছে। বস্তুত এই নভেল ভাবনাই আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস-শিল্পশৈলীতে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সংজ্ঞার্থ ও শিল্পসত্তার বিচারে নভেল ও উপন্যাস সমার্থক নয়। অথচ নভেল শেষপর্যন্ত বাংলায় উপন্যাস নামে চিহ্নিত হয়েছে।

নভেল ও উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ ও শিল্পসত্তার গুনগত বিশেষত্বও বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। এতৎ সম্পর্কিত রবীন্দ্রভাবনার বিশেষ দিকটিও 'জীবনানুসারী শিল্প : আখ্যান ও উপন্যাস' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলো-চিত হয়েছে। এদিক থেকে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রসঙ্গে বক্ষমান অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই অধ্যায়টি 'বাংলা সাহিত্যে নভেল' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম "বাঙালি নরনারীর জীবনবোধ।" শিল্প হিসেবে নভেল-এর অন্যতম মুখ্য বিষয় হলো অন্তর্বাস্তবতা পরিস্ফুটন তথা উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর অন্তর্জীবন প্রকটন। বর্তমান পর্যায়ে আমরা বলতে চেয়েছি যে

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবন ধর্ম এই অন্তর্বাস্তবতার পরিস্ফুটনে কতখানি সহায়ক ছিল। নভেল জাতীয় রচনা জীবননিষ্ঠ শিল্প। মানবজীবনের সঙ্গে শিল্প হিসেবে নভেলের যে গভীর যোগ আছে, তা নরনারীর জীবনবোধের সামগ্রিক বিকাশ সাপেক্ষ ছিল এবং এই বিকাশের জন্য বাঙালি নারীর সার্বিক মুক্তি প্রয়োজন ছিল। ভেঙে-পড়া মধ্যযুগীয় অচলায়তন থেকে বন্দিনী নারীর মুক্তির ছাড়পত্র লেখা হয়েছিল মানবিকতার মানপত্রে এবং ব্যক্তি মানুষের জাগরণই নারীকে দেবীতে নয় মানবীতে ভূষিত করে। এবং নারীর অধিকার সচেতনতার ফলে নরনারীর যৌথ-জীবনবোধেও আসে পরিবর্তন।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি নরনারীর দাম্পত্য জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল। এই অন্তরায় আইনানুগ ভাবে বিদূরিত হয়েছে বহু পরবর্তী কালে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে আইনটাই শেষ কথা নয়। আরো বড়ো কথা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিস্থিতির সত্যতা। এই প্রসঙ্গেই মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যালোচনা স্মরণীয়।[৪] ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নরনারীর যৌথ-জীবনবোধ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছিল বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ফলে। এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নরনারীর মধ্যকার সম্পর্কে কিছুটা পরিবর্তন আসে। এই জীবনানুরাগের সম্প্রসারণে নারী ব্যক্তিক মহিমায় মণ্ডিত হয়ে নভেল-রচনার উপযোগী চরিত্রে উন্নীত হয় এবং নায়িকা চরিত্রের বিকাশ ঘটে।

চতুর্থ অধ্যায়টি চিহ্নিত হয়েছে "বাংলা গদ্যে সামাজিক মানুষের ভিড়" রূপে। এই এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় সমসাময়িক মানুষের জীবনধারা এবং সাহিত্যে তার প্রতিসরণ।[৫] এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাত্যহিক বাস্তবতাই গদ্যের মুখ্য

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/বহু বিবাহ/বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড)/সাহিত্য সংসদ/১৩৬৬বঃ/৩১৪ পৃঃ।

৫. সাহিত্যে বিশেষত জীবনানুসারী সাহিত্যের নরনারী-সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা প্রতিফলন (Reflection) শব্দের স্থলে প্রতিসরণ (Refraction) শব্দটি ব্যবহারের অধিক পক্ষপাতী। কারণ রসসাহিত্যে কখনো কোনো বস্তু বা বিষয় প্রতিফলিত হয় না, বিষয় এবং সৃষ্টির মাঝখানে আছে কবি-মন বা লেখক-মন, অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি যখন কল্পনা-সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে, তখনই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়। অর্থাৎ বিষয় বা বস্তুটি লেখক-মন নামক একটি মাধ্যম (medium)-এর মধ্য দিয়ে কল্পনা-সম্পৃক্ত হয়ে সাহিত্য-পদবাচ্য হচ্ছে। ফলে বিষয় বা বস্তুটি বাস্তবের হুবহু পরিচয়টুকু রক্ষা করতে পারে না। প্রতিফলন-এ কিন্তু কোনো বিষয়ের বা বস্তুর পরিবর্তন ঘটে না। প্রতিসরণ কী? "The fact or phenomenon of a ray of light, heat, (the sight) etc., being diverted or deflected from its previous course in passing obliquely out of one medium into another of different density, or in traversing a medium not of uniform density." (The Shorter Oxford English Dictionary, Vol II. 1964. p. 1687)

অবলম্বন। এদিক থেকে গদ্যকে অনেক বেশি জীবননিষ্ঠ বলা যায়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমকালের বাঙালির বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেলেও কথামূলক গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এই সমকালিক মানুষের সামগ্রিক উপস্থিতি বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সূত্রে সমকালের মানুষ বাংলা গদ্যে ভাষা লাভ করেছে। সমসাময়িক মানুষকে নিয়েই গদ্যের পথ চলা এবং বেঁচে থাকা, এবং নভেল-এর বিষয়ও সমসাময়িক মানুষ। যেহেতু গদ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস এবং বাংলায় সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব ক্রমবিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতেই, সেইজন্য বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভূত বাংলা নভেল-এর বিচার বিশ্লেষণে বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধের জীবননিষ্ঠ বাংলা গদ্যসাহিত্যের পর্যালোচনার প্রয়োজন থেকে যায়। প্রসঙ্গত নভেল-এর অন্যান্য অনুষঙ্গের মতো বাস্তবতা ও তার নানাদিক এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বাংলা গদ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক মানুষের উপস্থিতিতে বস্তুরসের সম্প্রসারণ ঘটে, এই পর্যায়ে অবশ্য নরনারীর জীবনের বহিরঙ্গের বিষয় সমূহ তথা বহির্বাস্তবতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। নভেল-এর উৎকর্ষ-সাধনে এই বহির্বাস্তবতার ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। কারণ নভেল-এ অপেক্ষিত নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের কথা বহিরঙ্গ জীবনকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সেকালের মানুষ ও তাদের জীবন যাপনের সংবাদ জ্ঞাপনার্থেই বাংলাগদ্য ধীরে ধীরে জীবনের প্রকাশ-মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালি জীবনের নৈকট্য সাধিত হয়।

বর্তমান পর্যায়ে আহৃত সমস্ত রচনাই রচয়িতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফসল। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে শিল্পিত ভাবে নভেল-এর কথাবস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নরনারীর জীবনাশ্রয়ী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কল্পনা-সম্পৃক্ত হয়েই নভেল-এর যথার্থ বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে। বস্তুত সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে কৌতূহলের সূত্রে বাংলা নভেল-এর উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনায় চতুর্থ অধ্যায়ের গুরুত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়টি "বাংলা কথাগদ্যের বিকাশ" নামে অভিহিত হয়েছে। বাংলা কথামূলক রচনার গদ্যভঙ্গিই এই অধ্যায়ে আলোচ্য। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা নভেল-এর প্রকাশ মাধ্যম রূপে কথাগদ্য একটি শিল্পিত গদ্যভঙ্গি রূপে গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে কথাগদ্যের বিকাশের অন্তরায় সমূহও আলোচিত হয়েছে। সাংবাদিকতার সূত্রেই বাংলা গদ্য প্রথম নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তার-

পর বিভিন্ন অনুবাদ ও মৌলিক কথামূলক রচনার পথেই কথাগদ্য বিকাশ লাভ করে। এই বিচিত্র সৃষ্টি পর্যায়েই বাংলা গদ্য বহুভাবনাক্ষম হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না কোনো গদ্য বহুভাবনাক্ষম হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নভেল-এর যথার্থ প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। কারণ ভাবনাবৈচিত্র্যে মানুষ জীবজগতে অতুলনীয়। অধিকন্তু নরনারীর জীবনের রূপায়ণও নভেল-এর বিশেষত্ব এবং এই রূপায়ণের জন্য চাই উপযুক্ত গদ্যভঙ্গি।

জীবনানুসারী কথাগদ্যের জন্য যে-জীবনবোধ ও দৃষ্টিকোনের প্রয়োজন তা একালের অনেক লেখকেরই ছিল না। বিদ্যাসাগরের হাতে শিল্পিত গদ্যভঙ্গি প্রথম প্রকাশ পায়। তারপর কালক্রমে অনুশীলন ও সৃষ্টিপ্রতিভাবলে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে উপন্যাস (রোমান্স ও নভেল)-এর উপযোগী করে তোলেন। রবীন্দ্র-উপন্যাসের গদ্যও কল্পনা-সম্পৃক্ত ও জীবনানুসারী। পরিণত পর্বে রবীন্দ্র-উপন্যাসের গদ্য অধিকতর ব্যঞ্জনাগাঢ় হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম "বাংলা সাহিত্যে নভেল"। এর প্রধান দুটি ভাগ : প্রথমে নভেল-এর মৌল উপাদান গল্পরসের আলোচনায় বাংলা গল্পপ্রতিম রচনার ধারা এবং তার বিশেষত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলা নভেলের বিষয় ভাবনার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ সূত্রে এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : ক. রোমান্স রস ও বাংলা কথাসাহিত্য, খ. বাংলা নভেল ও বাস্তবতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে নভেল-এর ফর্মের আলোচনায় বিভিন্ন কথামূলক রচনার শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন অংশে আলোচিত হয়েছে। নভেল কথাসাহিত্যের অন্যতম ফর্ম এবং নভেল-এর ফর্ম তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত।

বর্তমান অধ্যায়ের পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে 'নভেল ভাবনা : বিদেশে ও এদেশে' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গঠনশৈলীর প্রেরণা-স্থল ইংরেজি সাহিত্য। প্রধাণত গল্পমূলক পাঠ্যপুস্তক রচনাকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যে শিল্পচেতনার প্রকাশ ঘটে। এই শিল্পচেতনা বিদ্যাসাগরের রচনায় (শকুন্তলা, সীতার বনবাস পাঠ্যপুস্তকদ্বয়) প্রথম পরিস্ফুট হয়। অবশ্য এই প্রয়াস অনুবাদ চর্চার মধ্যেই প্রথম সঞ্জীবিত হলো। কিন্তু এই গল্প রচনার ধারাতেই সমসাময়িক-জীবন-ভিত্তিক গল্পসাহিত্যও রচিত হতে থাকে—যার মূল বিশেষত্বই হলো লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনোপলব্ধি। বস্তুত নভেল এই ধরণের কথাবস্তুকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। জীবনমন্থন-সঞ্জাত অমৃতস্বাদ

দানেই নভেল-এর রসসিদ্ধি। এই চেতনাটি উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম সংখ্যক গল্প-লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। বিভিন্ন ভাবে গল্পরস পরিবেশিত হতে পারে কিন্তু জীবনের শিল্পিত-বিন্যাস হলেই নভেল-এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই দিকটি বর্তমান অধ্যায়ের 'বাংলা নভেল-এর শিল্পশৈলী' পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা নভেল-এর উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১৮৭২)-এ বাংলা নভেল-এর একটি পর্বের সূচনা। আর রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি-তে বাংলা নভেল ঘটনার প্রাধান্য ত্যাগ করে চরিত্রপ্রধান হয়ে ওঠে। বস্তুত নভেল-এ গল্পটাই মুখ্য নয়, ব্যক্তি স্বরূপটাই প্রধান।

সপ্তম অধ্যায়: "নভেল-এর উদ্ভব-তত্ত্ব ও প্রথম বাংলা নভেল" আমাদের গবেষণা নিবন্ধের সর্বশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে প্রথমে আলোচিত হয়েছে বাংলা নভেল-এর উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে আমাদের মধ্যে নভেল রচনার প্রেরণা দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রেরণা আত্মস্থ করা সম্ভব হয় নি বলেই বাংলায় নভেল অর্থে উপন্যাসের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে। উপন্যাস রচনার প্রয়াস দেখা দিয়েছে একের পর এক, কিন্তু যথার্থ উপন্যাস (নভেল) রচিত হয় নি বঙ্কিমচন্দ্রের আগে। তাই বর্তমান অধ্যায়ে 'প্রথম বাংলা নভেল' সম্পর্কিত একটি আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন অভিমত পুনর্বিবেচনায় অগ্রসর হয়েছি। বাংলা নভেল সৃষ্টির পটভূমিতে আছে উনবিংশ শতাব্দীর নতুন সামাজিক মানুষ, নতুন জীবনবোধ ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রেরণা। যে-চেতনা ও সামাজিক প্রতিবেশের প্রভাবে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের জীবনদৃষ্টি গড়ে উঠেছিল, তা মূলত উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত বাঙলার বিবর্তিত জীবনবোধের প্রেরণাসঞ্জাত। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙালি যিনি নভেল এর শিল্পতাৎপর্য অনুধাবনে সমর্থ হয়েছিলেন, যদিও ইতিহাসপ্রীতি, দেশকালের সীমাবদ্ধতা ও ও পথিকৃতের সংশয় তাঁর রচনাবলীকে করে তুলেছিল সাধারণভাবে ইতিহাসাশ্রয়ী কিন্তু যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মতোই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল নরনারীর জীবনরহস্যের বিশ্লেষণ। নরনারীর সামাজিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে দেখা দিল প্রথম বাংলা নভেল—বিষবৃক্ষ।

১. উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব ও বাংলা সাহিত্যের রূপভেদ

—ইংরেজি শিক্ষা ও বাঙলার জাগরণ—

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয় মধ্যযুগেরই পরাজয়, তাঁর বন্দীদশা আধুনিকতার হাতে মধ্যযুগেরই বন্দীদশা, তাঁর মৃত্যু মধ্যযুগেরও মৃত্যু। বস্তুত শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা নয়, বুদ্ধিবাদের পথেই প্রাচীনের বিদায় ও নতুনের আবাহন ঘটে এবং বাঙালি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিনবত্ব প্রকাশ পায়। এই অভিনবত্বের মূলে ছিল পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতা ও জীবনবোধ।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙলাদেশকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে যেমন আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসার, তেমনি বাঙলাদেশকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত উপমহাদেশের নতুন কালের দিকে যাত্রা; এবং এই নতুনত্ব কালের দিক থেকে একটা বিশেষণ জ্ঞাপন মাত্র নয়, রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য—আমাদের জীবনের সর্বস্তরেই এই নতুনের প্রাণধর্ম তখন প্রকাশোন্মুখ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে (১৭৫৭) তৎকালের আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠজাতি ইংরেজদের সঙ্গেই বাঙালির সাক্ষাৎকার ঘটে। বাঙলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তনের সূত্রেই ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি প্রথম আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায় এবং তমসাচ্ছন্ন বাঙালির 'অহল্যা মুক্তি' ঘটে। এই মুক্তিই বাঙলাদেশে **নবজাগরণ** নামে অভিহিত।

অন্ধকার থেকে আলোকতীর্থে আমাদের এই যাত্রা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শন বাঙালির নিকট নতুন আলো বহন করে আনে এবং বাঙালিকে অভিনব জীবন-দৃষ্টি দান করে। এর ফলে অনেকদিনের অন্ধকারের চিত্তাভস্মের উপর নতুন প্রাণের সঞ্চারে নতুন যুগের আবির্ভাব সূচিত হয় এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বস্তুত ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা মুসলিম শাসিত মধ্যযুগের অবসান ঘটাল।[১]

১. Sarkar, Jadunath. The Fall of the Mughal Empire, Vol IV. 1950. p. 348-349.

প্রাকৃতিক জগৎ, সামাজিক পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে নিজেকে বিভিন্ন ভাবে মানিয়ে নেওয়াই মানুষের শিক্ষালাভের প্রকৃত তাৎপর্য। কোম্পানি-পূর্বের বাংলাদেশের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় লোকশিক্ষা, দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী হিসাব-নিকাশ ও ভাষা শিক্ষার সীমিত সুযোগে জীবনের বৃহত্তর দিকগুলির বিকাশ ব্যহত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে জীবনের প্রতি কোনো গভীর মমত্ব ও আকর্ষণ ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় নি। এর প্রমাণ আছে সাহিত্যে, মধ্যযুগে ব্যাপক জীবনানুসারী সাহিত্য রচিত হয়নি বললেই চলে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশাগত শিক্ষায় মর্ত্যপ্রীতি, মানব ও জীবন প্রীতির সবিশেষ প্রাধান্য ছিল। ফলে একদিকে পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের দুর্দমনীয়তা, প্রাণপ্রাচুর্য ও গতিশীলতা এবং নবীন ইউরোপের চমকপ্রদ ঘটনাবলী ; অপরদিকে আমাদের মধ্যযুগীয় অচল অবস্থা—এই দু'য়ের মাঝখানে পড়ে একালের উৎসাহী বাঙালি ইংরেজি শিক্ষা লাভে তৎপর হয়।

স্মরণীয় যে, নতুন জীবনবোধের প্রয়োজনে এবং জ্ঞানান্বেষণের কারণেই ডেভিডহেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), রাধাকান্তদেব (১৭৮৪-১৮৬৭) প্রমুখ শুভা-নুধ্যায়ীগণের প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'হিন্দুকলেজ' [পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ] ও খ্রীষ্টান মিশনারিগণের দ্বারা স্থাপিত 'শ্রীরামপুর কলেজ'-কে কেন্দ্র করে বাঙালাদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৭) কলিকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজে স্থাপিত ত্রয়ী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক অর্থে মননশীলতার বিস্তার ঘটে এবং আধুনিক ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

পাশ্চাত্ত্যের বস্তুতান্ত্রিক ও জীবনধর্মী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের মধ্যে সামাজিক-হিতবোধ গভীরতা লাভ করে এবং তা জীবন চর্যায় দুটি ধারায় প্রকাশ পায় : এক. সামাজিক মানুষ রূপে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায় এবং এই সমাজ সংশক্তি বৃদ্ধি পাবার ফলেই পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন সমূহ দানা বাঁধে। দুই. এই মঙ্গলবোধের ফলেই বহু শতাব্দীর সংস্কারের বেড়াজাল থেকে বাঙালি নারীর[২] মুক্তির সম্ভাবনা

২. **Dutt, Hur Chunder. Bengali Life and Society—A Discourse. Calcutta, 1853. p. 28. ['No nobler object can occupy the heart and energies of youug Bengal than reforms in Bengali life and society and the consequent exaltation and prosperity of his native land.']**

ত্বরান্বিত হয়। অনাধুনিক বাঙালি নারীত্বের প্রতি যথার্থ মর্যাদা দেখাতে পারে নি। এটা কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল না, অনেকটা অজ্ঞানতা জনিত— নারীকে পূর্ণ মানবী রূপে দেখার শক্তি ইংরেজি শিক্ষা লাভের ফল, মানবিক চেতনার বিকাশের স্বাক্ষর। সত্যসন্ধ নব্যবঙ্গীয়েরা বাঙালির এই অনাধুনিক চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে নারীকে পূর্ণ মর্যাদায় ভূষিত করেন।[৩] নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দ্বারা এই মুক্তি ত্বরান্বিত হয়।

—জীবনধর্মী বুদ্ধিবাদ ও পাঠক-সমাজ—

আধুনিক পাশ্চাত্যের ভাবগঙ্গায় অবগাহনের ফলেই জীবনধর্মী বুদ্ধিবাদ বাঙালির সহজাত আবেগ ও কল্পচারিতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং বাঙালি জীবনকে ধীরে ধীরে বুদ্ধিদীপ্ত করে। এই চেতনালোকের পথেই আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎ থেকে মানবতন্ময়তা ও জীবনানুরাগের বীজ বাঙালির জীবনচর্যায় ও সাহিত্যে গৃহীত হয়।

নৈয়ায়িক বাঙলার বুদ্ধিবাদ ছিল জীবনবিমুখ শুষ্ক বুদ্ধির চর্চা মাত্র, মানব-জীবনের অন্তর্লোক প্রকটনে কিম্বা সহজ সৃজনশীলতার মধ্যে এই বুদ্ধিবাদের বিকাশ ঘটেনি। এর ফলে মধ্যযুগের বাঙলায় সহৃদয় পাঠকসম্প্রদায় বলে ব্যাপক কোনো গোষ্ঠী গড়ে ওঠে নি। মধ্যযুগের গ্রাম বাঙলায় পাঠক-সমাজ ছিল না, ছিল শ্রোতৃ-সমাজ। তখনকার কথকঠাকুর ও কীর্তনিয়া সম্প্রদায়ই ছিল যথার্থ পাঠক এবং তাঁদের পাঠের উদ্দেশ্যও সাহিত্যরস আহরণ নয়, ধর্মীয় মাহাত্ম্য কীর্তন। রাজসভায় কবিদের কাব্যপাঠ সভাসদ্‌বর্গ অনুগত ভাবে শুনতো এবং তার দ্বারা নিজের ততটা নয়, যতটা রাজার মনোরঞ্জনে সাহায্য করতো। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি সাফল্যের পক্ষে রসিক পাঠক চিত্তের প্রয়োজন সর্বকালের আলঙ্কারিকগণ অনুভব করেছেন: "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। শিরসি মা লিখ মা লিখ।" অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে

৩. An Address on native female education on the 25th July 1856. Jones "Calcutta Gazette" office. 1856. p. 3-4. ["The education of our Females is a duty which we owe to ourselves, and the more speedily it is fulfilled the better. Our own happiness is involved in it. We know that unless there is some similarity and harmony between our own thoughts and feelings, and the thoughts and feelings of those we love, we cannot taste true happiness."]

হিন্দুকলেজ ও তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৮)কে কেন্দ্র করে বাঙলায় আধুনিক অর্থে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে এবং সীমিত ভাবে ঘটলেও এই পত্রিকাগোষ্ঠীর মননশীলতা বাঙালিকে সূক্ষ্ম রসবোধ ও ব্যাপক ও গভীর জীবনবোধের দিকে উন্নীত করে। জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের নিয়ামক রূপে বিদগ্ধ সমাজের গুরুত্ব এই কালে প্রথম অনুভূত হয়। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি সাহিত্য, পাশ্চাত্ত্য রসবোধ ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ও পঠন-পাঠনে বাঙলাদেশে এক অদৃষ্টপূর্ব পাঠক-সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্তপুরেও সাহিত্য পাঠ আদরনীয় হয়।[8] বাঙলাদেশে এই পাঠক-সমাজের ক্রমবিকাশের পথেই কথা-সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। কেননা কথাসাহিত্যের রসোৎকর্ষ ও বিকাশ এই পাঠক-সমাজের সহৃদয় আনুকূল্য সাপেক্ষ।

জীবনানুসারী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বুদ্ধিবাদের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জটিল গ্রন্থিযুক্ত জীবনের যথার্থ পরিস্ফুটনই এই বুদ্ধিবাদের প্রকৃত লক্ষ্য। নর-নারীর জটিল জীবনরহস্য বিশ্লেষণে, ঘটনাবিন্যাসে ও ভাষার ক্ষেত্রে লেখককে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়, পাঠককেও সেই জীবনরহস্য, ঘটনার তাৎপর্য ও ভাষার চাতুর্য অনুধাবনে বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়; এই উভয়ক্ষেত্রেই বুদ্ধির বিকাশ জীবনধর্মী বিদ্যার চর্চা-সাপেক্ষ। লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যতত্ত্ব বাঙালি চিত্তকে সহৃদয় পাঠকে রূপান্তরিত করতে পারে নি এবং পারেনি গদ্য-ধারণার জন্ম দিতে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালি জীবনচর্যায় যুক্তিবাদকে পাথেয় করলে সাহিত্য সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা যায় পালটে, এবং কবিতা গদ্যকে জায়গা করে দেয়। এই সব কিছুর জন্য সচেতন পাঠক-সমাজের প্রয়োজন ছিল এবং তারা অবশ্যই সহৃদয় পাঠক, কেননা তাদের রসচর্বণার উপরই নির্ভর করেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্থায়িত্ব ও বিকাশ।

৪. উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে সাহিত্যপাঠের প্রাসঙ্গিক তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি আত্মজীবনী থেকে আহৃত হলো—ক. "বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর—বউদিদির আমসত্ত পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'।" [ছেলেবেলা/১৩৫৫ বং/৩৫ পৃঃ।] খ. "বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল-সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজের হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।" [জীবনস্মৃতি/১৯৬৩/৭৩ পৃঃ।]

উপন্যাসের উৎস সন্ধানে আলোচ্য বুদ্ধিবাদের বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে কী না—এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে আপাতত বলা চলে যে উপন্যাস বিশেষত নভেল বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনা—এ সকল রচনায় "বিশ্বাসের অবকাশ থাকলেও বুদ্ধিই সেখানকার প্রভু।"[৫] লেখক ও পাঠক উভয়কেই এক্ষেত্রে বুদ্ধির সুতাতে মাঞ্জা দিতে হয়। নচেৎ জীবনানুসারী সাহিত্যরূপে নভেল এ নরনারীর জীবনের যৌথ সমস্যা সমূহের রহস্য উদ্ঘাটন ও রূপায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং নভেল-এর গল্পরসের যথার্থ তাৎপর্যও পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হবে না, এখানেই শিল্পশৈলী হিসেবে নভেল-এর অভিনবত্ব। এর কারণ নরনারীর জীবনের যৌথ-সমস্যাসমূহই তাদের অন্তর্জীবনের সমস্যা এবং এর রূপায়ন বর্ণনাশ্রয়ী নয়, বিশ্লেষণাত্মক। কেননা অন্তর্জীবনের সমস্যা সমূহ আমাদের অনুভূতি সাপেক্ষ এবং বুদ্ধিযোগে এই অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতে হয়।

—বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ—

মহাকাব্য যেমন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি, নভেল তেমনি আধুনিক যুগের সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্য শিল্প বিপ্লবোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থাই নভেল-এর উদ্ভব ও বিকাশের অনুকূল সামাজিক বাতাবরণ রচনা করে, কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য শিল্প-বিপ্লব-উদ্ভূত ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে[৬] বাংলা নভেল রচনার অনুকূল সামাজিক বাতাবরণ তৈরী হয়। লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্ত্য ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক অভিঘাত ও সম্প্রসারণের মুখেই বাঙালি জীবনে কলকাতা কেন্দ্রিক নগর জীবন বোধের উদ্ভব ও মধ্যবিত্ত জীবনবোধের বিকাশ ঘটে। নভেল জীবনানুসারী সাহিত্য, তাই বাংলা নভেল-এর উৎস সন্ধানে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমির বিশেষত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব প্রসঙ্গে প্রথমে নগর জীবনবোধের কথা, পরে বিত্তাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থার কথা আলোচিত হচ্ছে।

ক. নগর জীবনবোধ

নগরের ধর্ম কী, কী তার বিশেষত্ব—এর উত্তরে সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন : "The unique office of the city is to increase the variety, the

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত/স্বগত/১৩৬৪ বঃ/১০১ পৃঃ।
৬. Sinha, J. C. Economic Annals of Bengal. 1927. p. 275-276.

velocity, the extent and the continuiety of human intercourse."[৭] কিন্তু এই নগর-ধারণা মধ্যযুগের বাঙালির ছিল না। কোম্পানির বাণিজ্য ও শাসনব্যবস্থায় বাঙালি এই ধারণার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়—যখন নতুন বন্দর কলকাতা ধীরে ধীরে নগর কলকাতা হয়ে ওঠে, বিকিকিনির হাট হয় রাজধানী।

কলকাতা বাঙলার অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠলে গ্রাম বাঙলা নগর কলকাতার দিকে যাত্রা আরম্ভ করে এবং গ্রাম বাঙলার মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি এই অর্থনৈতিক টানাপড়েনে বিপন্ন হয়ে পড়ে। চির পরিচিত আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত মানুষের ভিড় নয়, অজ্ঞাতকুলশীল বিভিন্ন ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় গ্রামীন মানুষের ভিড়েই প্রথম প্রথম কলকাতার শহুরে সমাজ গড়ে ওঠে। বস্তুত এই শহুরে বাতাসে গ্রামীন সংস্কার ও শাসনের বেড়াজালে বন্দী বাঙালি মুক্তির স্বাদ পায় এবং কলকাতায় প্রথম নগরোচিত এক বহুজাতি-সমন্বিত (cosmopolitan) সমাজ ব্যবস্থার বীজ উপ্ত হয়। এই অদৃষ্টপূর্ব কসমোপলিটন সমাজ-সংস্থিতি বাঙলাদেশের নতুন সমাজ-বিন্যাসের ও নতুন সংস্কৃতির ভীত তৈরী করে।

বস্তুত কলকাতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাঙালির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। কলকাতা বাঙালিকে দেয় নতুন জীবনবোধ, রূপ তার মায়াবন বিহারিণী হরিণী—রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মতো সমগ্র বাঙলাদেশটাই ছুটতে আরম্ভ করেছে ঐ কলকাতার দিকে, মুক্তিকামী মানুষের দল গঙ্গাস্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করবে। পাশ্চাত্ত্যের সান্নিধ্যে নতুন বঙ্গে নতুন সংস্কৃতির বীজ উপ্ত হলো, এই নতুন বঙ্গ কলকাতা এবং এই নতুন সংস্কৃতি নগর-সংস্কৃতি। কলকাতা হলো নতুন যুগের নতুন নগর—নতুন জীবনবোধের তীর্থস্থল।

নতুন যুগের নতুন সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে কলকাতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও পীঠস্থান হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে সাহিত্যের লালনক্ষেত্র ছিল রাজদরবার বড়জোর পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপ, নগরজীবনের বিকাশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণে এবং মুদ্রাযন্ত্রের দাক্ষিণ্যে রাজদরবার নয় কলকাতার বড়ো-মানুষের বৈঠকখানা[৮] হলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লালনস্থল। বস্তুত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ও গণতান্ত্রিক চেতনার স্ফুরণে সাহিত্য রাজসভা থেকে জনসভায়

৭. International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol 2. 1968. p. 451.
৮. Calcutta Review, Vol L VII, Calcutta 1873.

স্থানান্তরিত হলো এবং সাহিত্যচর্চার যথার্থ দায়িত্ব এসে পড়ল নগরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে, ফলে সাহিত্য রাজসভার নটিনীবেশ ত্যাগ করে জনগনমনের মানসী হলো।

খ. বিত্তাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা দেশে বাণিজ্যের কায়েমী অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং জয়ী হয়। বণিকের এই দণ্ডাঘাতেই গ্রাম বাঙলার আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। পক্ষান্তরে কলকাতা ও তাৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নতুন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে শ্রমের বিনিময়ে দুটো পয়সা উপায়ের ব্যবস্থা হয়। গ্রামের মানুষও বেঁচে থাকার তাগিদে ও নতুন জীবিকার সন্ধানে বাণিজ্য নগরী কলকাতার দিকে ভিড় করতে আরম্ভ করে। তখন কিছু ইংরেজি জানা থাকলে "সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে অনায়াসে কর্ম হইত"[৯]। একই কালে কোম্পানির শাসকবর্গ ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করে।[১০] এই জমিদারতন্ত্রের মাধ্যমেই বাঙলাদেশ এক সামন্ত ব্যবস্থা থেকে আরেক সামন্ত অবস্থায় প্রবেশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ভৌমসত্তার অন্তরালে কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্তের আবির্ভাব ঘটে এবং সৃজ্যমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ পল্লবিত হয়ে ওঠে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বিশ্বব্যাপী বানিজ্যিক জাগরণের কালে ইংরেজ পুঁজিপতিদের কল্যাণে ভারতবর্ষে উৎপাদনের সহায়ক কিছু সংখ্যক যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটে, এর ফলে বাঙলাদেশে নতুন সামন্ত-অবস্থার পাশাপাশি বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ প্রসার লাভ করে।[১১] সমকালীন জীবনবোধ এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং বাঙালি সমাজে চাকুরীজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রসার ঘটে এবং ধীরে ধীরে প্রাচীন বৃত্তিকেন্দ্রিক বর্ণব্যবস্থা ও পুরুষানুক্রমিক শ্রমব্যবস্থা (heriditary divisions of labour)-র প্রাধান্য ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে।[১২]

৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর/বিদ্যাসাগর চরিত/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড/১৯৭২/৪১২ পৃঃ।
১০. Jha, Shiva Chandra. Studies in the development of Capitalism in, India. 1963.p.144.
১১. Ibid p. 216.
১২. কার্ল মার্ক্স/ভারতে ব্রিটিশ শাসন/মস্কো/১৯৭০।

এই পরিবর্তনের মুখে নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে অর্থের ভিত্তিতেই বাঙালি সমাজ নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত হতে থাকে এবং অর্থই মানুষের সামাজিক পদমর্যাদার মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এর ফলে অর্থ-ভিত্তিক উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বস্তুত আলোচ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উচ্চ ও নিম্নবিত্তের মধ্যে সেতু রচনা করেছে। এই সম্প্রদায় ধনসম্পদের অধিকারী ছিল না, কিন্তু নতুন শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল।

বাঙলা দেশে নগর জীবন-বোধের বিকাশ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব—এ দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একদিকে কলকাতার নগর-জীবন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবকে সম্ভব করেছে,[১৩] অন্যদিকে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই নগরজীবন-বোধকে গ্রাম বাঙলায় পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙলাদেশে এরূপ কোনো ব্যাপক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না।[১৪] লক্ষণীয় যে, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই সক্রিয়ভাবে নতুন যুগভাবনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং এদের বিশিষ্ট জীবনবোধের ফলেই আধুনিক জীবনবোধের বিশেষত্ব ও নভেল জাতীয় রচনার অন্যতম মৌল বিষয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানব-মুখীনতা ধীরে ধীরে বাঙালি জীবনে দানা বাঁধে। এই সকল কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই কালান্তরের পথে সমগ্র সমাজ-শক্তির উৎস ও সমাজের নিয়ামক শক্তি হলো।[১৫] বাঙলাদেশে এরাই হলো নতুন জীবন-বোধের উদ্গাতা—নতুন সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। এটি প্রধাণত নাগরিক এবং মূলত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনবৈশিষ্ট্য—নতুন সমাজবোধের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত।

বস্তুত নগর কলকাতার অগ্রগতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে থাকল সৃজ্যমান বাংলা কথাসাহিত্য। পল্লীপ্রকৃতিকে যদি কাব্যের ভাবময় জগৎ বলা যায়, তবে নগরের বৈচিত্র্য ও আবহাওয়া অবশ্যই জীবনানুসারী কথাসাহিত্যের ভাবভূমি বলে পরিগণিত হবে।

—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতন্ময়তা—

স্বাধিকার চেতনা তথা ব্যক্তির জাগরণ রেনেসাঁসের অন্যতম ধর্ম, আর ব্যক্তির

১৩ Sinha, Narendra Krishna. Economic History of Bengal, Vol II. 1962.p.220.

১৪. Bhattacharya, Sukumar. The East India Company & the Economy of Bengal—from 1704 to 1940. 1954. p. 224.

১৫. পূর্বোক্ত ১৩ সংখ্যকের অনুরূপ।

স্বাতন্ত্র্য ঘোষণাই ছিল ডিরোজিওগোষ্ঠী তথা নব্যবঙ্গীয়দের মূল লক্ষ্য। মধ্যযুগের বাঙালি গোষ্ঠী-চিন্তার দ্বারা আবিষ্ট ছিল। এর ফলে মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্যক্তির আত্মস্ফূর্তি ঘটে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে ডিরোজিওগোষ্ঠীর অভিনব জীবন-ভাবনার ফলেই বাঙালি জীবনে ব্যক্তি-মানুষের বিকাশ ঘটে। আর ব্যক্তি বোধের স্ফুরণের ফলে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-মনের সংঘর্ষে অবরুদ্ধ মনুষ্যত্বের মুক্তিলাভ ঘটে। পাশ্চাত্ত্যের জীবন সান্নিধ্যেই বাঙালির এই বোধিসত্ত্ব লাভ।

পাশ্চাত্ত্যের ধর্মনিরপেক্ষ জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এবং ব্যক্তিক চেতনার প্রকাশ ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিষ্ঠায় দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের প্রাধান্য কমে আসে এবং অবরুদ্ধ মনুষ্যত্বের মুক্তিতে মধ্যযুগের দেববাদের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং মানুষ এই যুগে দেবতার স্থান গ্রহণ করে। এই পরিবর্তনের পথেই বাঙালি জীবনে আধুনিক মানবতন্ময়তার প্রকাশ ঘটে। রাজা রামমোহন রায়ের সতাতন ধর্মের সংস্কার সাধনের পশ্চাতেও এই কালোচিত মানবিক প্রেরণা কাজ করে। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন [আত্মীয় সভা (১৮১৫) ব্রাহ্মসভা (১৮২৮) ব্রাহ্মসমাজ (১৮৩০)] ও তাঁর প্রচেষ্টায় সতীদাহপ্রথা রদ (১৮২৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইনপাশ (১৮৫৬, এক্ট ১৫) ও 'বহুবিবাহ রদ' বিল রচনা প্রভৃতি ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে নতুন মানবানুরাগের চিহ্নবহ। এই সকল সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি নারীর জাগরণ এবং পুরুষের পক্ষে নারীর অধিকার সমূহ স্বীকার করে নেওয়া।

এই বক্তব্যের সমর্থনে একালের একটি পত্রের অংশবিশেষ উদাহৃত হলো।[১৬]—"রামমোহন রায় সতীগমন নিষেধ করাইয়া শারীরিক দাহ নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শারীরিক ও মানসিক দাহ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিলেন", এর ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হইয়াছে "ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বিং প্রসব বেদনাং" অর্থাৎ "বন্ধ্যা যদ্রূপ পুত্রবতী কামিনীর প্রসব বেদনা জানে না সেই রূপ পুরুষ অথবা সধবা স্ত্রী বিধবাদিগের ক্লেশ জানিতে পারিবেন না"—এই পত্রটির রচয়িতা শ্রীবিদ্যাদেবী নামে এক বালবিধবা। হিন্দু বিধবা-বিবাহ

১৬. সম্বাদ ভাস্কর (২১ আগষ্ট ১৮৫৬)/বিনয় ঘোষ (সম্পাঃ)/সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩য় খণ্ড/১৯৬৪/৪৮৪ পৃঃ।

আইন পাশ হলে তা একালের বিধবাদের মনে কীরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তারই এক সুন্দর পরিচয় আলোচ্য পত্রটিতে আছে। পত্রটি বস্তুত মানবতন্ময়তার পরিচয় জ্ঞাপক।

কুল কৌলীন্য কিংবা বর্ণগরিমা নয়, শিক্ষা এবং বিত্তই আধুনিক কালের জীবন যাপনের এবং সমাজ সংগঠনের মৌল উপাদান হয়। কেননা কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় স্মার্ত জীবনরীতির পুনপ্র'তিষ্ঠার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে ব্যক্তি নির্বিশেষে মানুষের স্বীকৃতি লাভের পথ খুলে যায় এবং অব্রাহ্মণেরাও সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। এত আর কিছুই না, ব্যক্তি-মানুষের স্বীকৃতিতে মানুষকেই মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। বস্তুত বিত্তকেন্দ্রিক নতুন জীবন চর্যার সূচনা, ব্যক্তির জাগরণ এবং সংস্কার আন্দোলনের ফলে বাঙালি জীবনে নতুন ভাবে মানবানুরাগ প্রতিষ্ঠা পায়। বস্তুত "মানবীয় সম্পর্কের অতীত হয়ে আধুনিক মানুষ সত্য নয়, মানবীয় সম্পর্কের জন্যই বরং মানুষ সত্য।"[১৭]

বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়েছে। প্রথমত জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় বাংলাসাহিত্যে ইহচেতনার স্ফুরণ ঘটে এবং মানুষই সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। এবং বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে মানবীরূপ ধারণ করে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ইহজগতের নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা সাহিত্য সৃষ্টির অবলম্বন হয়। এর ফলে, যে-সাহিত্যে এতদিন কল্পনা, দেবতা ও রোমান্টিক রসচেতনার প্রাধান্য ছিল, সেই সাহিত্যের খাতে বস্তুরসের জোয়ার গেল খেলে, এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নভেল জাতীয় রচনার উদ্ভব আলোচ্য বাস্তবতার রসাবেদন সৃষ্টির পথ ধরেই।

—বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা—

১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ হিন্দুকলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী কালটুকুই বাঙলার জাগরণের পূর্বকল্প এবং প্রস্তুতিপর্ব, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জাগরণের প্রতিষ্ঠাপর্ব। লক্ষণীয় যে, এই জাগরণ বাঙালি

১৭. গোপাল হালদার/বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি/১৯৫৬/২২ পৃঃ।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেই অধিক ক্রিয়াশীল ছিল এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রাচুর্য ও শতদল রূপটি প্রকাশ পায়। এই জাগরণপর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশ-পাতাল পার্থক্য ঘটে যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করলেই আধুনিক যুগের সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। এই পার্থক্য সমূহ নিম্নরূপ [১৮] :—

ক. মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল পল্লীকেন্দ্রিক, আধুনিককালে সাহিত্য হলো কলকাতা তথা নগরকেন্দ্রিক।

খ. মধ্যযুগে সাহিত্যের কোনো ব্যাপক পাঠক-সমাজ ছিল না, ছিল শ্রোতৃসমাজ। কিন্তু আধুনিক পর্যায়ে সাহিত্যের পঠন-পাঠনে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক পাঠক-সমাজের উদ্ভব ঘটে।

গ. অনাধুনিক সাহিত্যে পত্র-পত্রিকার বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঘ. সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষা, ছন্দ ও মাত্রার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন চলতে থাকে, এবং গদ্য নতুন প্রকাশ মধ্যম রূপে উনবিংশ শতাব্দীতে কবিতার পাশাপাশি আপনার জায়গা করে নেয় এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে কবিতার একচ্ছত্র আধিপত্য নষ্ট হয়।

ঙ. সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়, আর ধর্মের সাধনা কিম্বা রাজার মনোরঞ্জন নয়, আধুনিক পর্যায়ে সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য রচিত হতে থাকে।

চ. অনুকরণ বা গতানুগতিকতার পরিবর্তে মৌলিকতা প্রদর্শনই সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য হয়, মধুসূদনে তার সোচ্চার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ছ. মধ্যযুগীয় ধর্মসর্বস্ব সাহিত্য রচনার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমকালাশ্রয়ী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলে, কারণ আধুনিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজাসভা-ধর্মসভা নয়, সাধারণ শিক্ষিত মানুষ।

জ. মধ্যযুগের সাহিত্যের শিল্পশৈলী অনেকাংশে সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ সঞ্জাত,

১৮. Dusan Zbavitel. The Rise of Modern Literature in Asia, with special Reference to Bengal. Jadavpur Journal of Comparative Literature, Vol 6. Calcutta, Jadavpur University. 1966. P. 4.

কিন্তু আধুনিক কালে কী গদ্যে কী কবিতায় পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে বিভিন্ন আঙ্গিকের ও প্রকাশ ঘটে।

খ. আর লৌকিক কিম্বা পৌরাণিক দেবতা নয়, মানুষই সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে।

গ. লোকসাহিত্যের ধারাটি নগর জীবনবোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে আসে। এবং আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের পার্থক্য ক্রমেই গভীর হতে থাকে।

বাঙালির অন্তর্মুখীন জীবনবোধ, বহির্বিশ্বথেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্করহিত বর্ণপ্রধান সমাজব্যবস্থা, বহির্সংঘাত থেকে দূরে নিস্তরঙ্গ গ্রামকেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহ, সংহত রাষ্ট্রীয় জীবনবোধের অভাব এবং সর্বশেষে নাগরিক জীবনের অনুপস্থিতি—এই সব কিছু মিলে মধ্যযুগের বাঙালির জীবন স্থাবর অবস্থা লাভ করে।[১৯] জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধের অভাবে সাহিত্যেও গতানুগতিক জীবনের পরিচয় থেকে যায়। মনসামঙ্গল কাব্যকে বাদ দিলে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যসমূহের বিষয়বস্তু ও জীবনধর্ম বাঙলার হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের জীবনাশ্রয়ী। এই সমাজের লোকায়ত ধর্মবোধকে আশ্রয় করেই লোকায়ত বাঙলার পুরাণকথা—মঙ্গলকাব্যসমূহের জন্ম হলো। ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে নতুন ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্টি হলো বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী। বর্ণ হিন্দুরা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ও তার চর্চায় সন্তুষ্ট থাকলো। আর ভোগাসক্ত রাজদরবারে রচিত হলো অনুবাদাশ্রিত রোমান্টিক প্রণয় কাব্যাদি। এর কারণ মধ্যযুগের সংস্কৃতিবান মানুষ খুব কম সময় জীবন-চর্চার অঙ্গরূপে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করেছে। বস্তুত আবেগোচ্ছলতা, অদৃষ্টবাদ, জীবন সম্পর্কে অসচেতনতা, সংহত সমাজ-জীবনের অনুপস্থিতি, সর্বোপরি সাহিত্যস্পৃহার অভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি জীবনের নিকট সম্পর্ক স্থাপনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল অতর্কিত ও বহিরাগত কোন সংঘাত, যার ফলে বাঙালির সামাজিক জীবন হবে আবর্তিত ও সাহিত্য হবে দ্রুত জীবননিষ্ঠ।

বাংলা সাহিত্যের এই মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিক অবস্থায় উত্তরণের মূলে পাঁচটি মৌল বিষয় কাজ করে—এক. বাঙালির জীবনবোধে যুক্তিবাদী জীবন—

১৯. Bhattacharya, Sukumar. op. cit. p. 223.

দর্শনের প্রভাব, দুই. ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, তিন. মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ও ব্যাপক প্রকাশন ব্যবস্থা, চার. সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও ব্যাপক পাঠক-সমাজ, এবং পাঁচ. স্বদেশবোধ ও স্বভাষাপ্রীতি। 'নভেল' রচনার পক্ষে শেষ তিনটি বিষয় সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে সাময়িকপত্রের অন্তত ভূমিকা ছিল। একই সময়ে সাময়িকপত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় বিতর্ক ও বিবর্তনের ফলে সৃজ্যমান বাংলা গদ্যের জড়তামুক্তি ঘটে এবং গদ্যভাষা প্রতিদিনের কাজ-কর্মের উপযোগী ও রস-সৃষ্টির প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাময়িকপত্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তিনটি কাজ করেছে—এক. বাঙালিকে মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রেরণা দান; দুই. পত্রিকার পাঠকগোষ্ঠীর মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল সচেতন পাঠক-সমাজ সৃষ্টি, তিন. পত্রিকার সাহায্যে পাঠকগোষ্ঠীর মনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাহিত্যে গোষ্ঠীবাদের[২০] পথ রচনা। বস্তুতঃ পত্রিকা মারফত সাধারণ পাঠক-সমাজ সৃষ্টি হবার ফলে বাংলা গদ্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ ঘটে।

'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'—এই উক্তি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই উচ্চারিত হয়। এই স্বভাষাপ্রীতিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অন্যতম কারণ ছিল। পঞ্চাশের দশকে শিক্ষিত বাঙালির মাতৃভাষায় ব্যাপক সাহিত্য রচনার আগ্রহের মূলে স্বদেশপ্রীতি ও স্বভাষাপ্রীতি কাজ করে, সাহেব মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)-এর মধ্যেও স্বভাষাপ্রীতির প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote hsmielf to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element."[২১]

এই স্বভাষাপ্রীতিই বস্তুত বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। নব-জাগৃতির মূল লক্ষ্য ব্যষ্টি নয়, সমষ্টি—জনগণ এবং জনগণমন কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারাই এই জনগনমনের সাহিত্যায়ন সম্ভব এবং তা সম্ভব যখন জনগণের মুখের ভাষা সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে। শিক্ষিত বাঙালির এই মাতৃ-

২০. সুকুমার সেন/বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/১৩৭০ বঃ/১২০ পৃঃ।

২১. ক্ষেত্র গুপ্ত/কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী/১৩৭০ বঃ/২৩২ পৃঃ।

ভাষাপ্রীতির ফলে বাংলা গদ্যেরই অভাবিত উন্নয়ন ঘটে এবং গদ্য বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী প্রকাশ-মাধ্যম হয়ে ওঠে।

—বাঙালির সৃজন প্রতিভার একটি দিক—

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আয়োজন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই সূচিত হয়। এই সময়ে বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিকে ঝড় উঠলেও বাঙালির সৃষ্টি-উন্মুখ প্রাণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল না।[২২] ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)-র শিষ্যরা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষায়। নতুন শিক্ষালব্ধ ইংরেজি ভাষা এই সৃষ্টি ব্যাকুল মনের প্রকাশ মাধ্যম ছিল, কেননা তখনো বাংলা গদ্যের ভাষা এবং কিয়দংশে বাংলা কবিতার ভাষা মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। একালের ইংরেজি লিখিয়েদের অন্যতম পথিকৃৎ কাশীপ্রসাদ ঘোষের দ্বিধাহীন কণ্ঠের স্বীকারোক্তিতেই এর প্রমাণ মেলে: "I have composed songs in Bengali, but the greatest portion of my writings in verse is in English, I have always found it easier to express my sentiments in that language than in Bengali,……"[২৩]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিই ইংরেজিতে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। এঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রজন্মের ছাত্র।[২৪] কিয়দংশে এঁরাও বাংলা সাহিত্যের জাগরণের পথিকৃৎ। কারণ এঁরাই প্রথম পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য রসের রসিক হয়েছিলেন এবং অন্যান্য বাঙালিকেও এই সাহিত্য রসের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। এঁদের মধ্যমণি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই ডিরোজিয়ানের মধ্যেই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবগঙ্গার মিলন ঘটেছিল। তিনিই স্ব-কৃতির দ্বারা শতাব্দীর পূর্বার্ধের ইংরেজি সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে শতাব্দীর উত্তরার্ধের বাংলা সাহিত্যের সেতু রচনা করতে পেরেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির যে-নতুন প্রাণস্পন্দন একদিন ইংরেজি রচনার মধ্যে

২২. De, Susil Kumar. Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857), Rev. Ed. 1962. p. 3.

২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)/সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড/১৩৫৬ বঃ/ ৪৪২ পৃঃ।

২৪. প্রমথনাথ বিশী/বঙ্কিম সরণী/১৩৭৩ বঃ/১৬০ পৃঃ।

ধ্বনিত হয়েছিল, তা শতাব্দীর উত্তরপক্ষের বাংলা রচনার মধ্যে সঞ্চারিত হলো। এর ফলেই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পথে আত্মমুক্তি সম্ভব হয় এবং বাঙালির ইংরেজি রচনার চমক ও ঠমক অনেকাংশে হ্রাস পায়, শতাব্দীর এই উত্তরপক্ষে যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিলেন তাঁরা হলেন ইংরেজি শিক্ষার দ্বিতীয় প্রজন্মের ছাত্র।[২৫] এঁদের মধ্যমণি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। কিন্তু ইনিও পূর্ববর্তী নব্যবঙ্গীয়দের মতো ইংরেজিতে গল্প রচনা করে সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস একটি উপন্যাস রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।[২৬]

বস্তুত ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৈন্য ও দেশীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করলেও এই পর্বে শিক্ষিত বাঙালি নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় রাখে নি। মধ্যযুগের শেষে আধুনিক যুগের আরম্ভে (১৭৫৭-১৮৩০) বাঙালির সাহিত্য সৃষ্টির প্রবহমানতা বিনষ্ট হয় নি, বরং তা নতুন গতিবেগ লাভের জন্য ভিতরে ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। এই যুগের কবিওয়ালাদের কবিকৃতিকে একমাত্র প্রধান সাহিত্যকর্ম রূপে বিচার করলে বাঙালির যথার্থ সাহিত্য ভাবনার প্রতিই অশ্রদ্ধা দেখান হবে। কেননা বাঙালির অন্তরের সৌন্দর্যানুভূতি ও সূক্ষ্মজীবনবোধ একালের ইংরেজি রচনার মধ্যেই যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে যে-পাশ্চাত্যভাবনা বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পায়, তার প্রাথমিক প্রস্তুতি ঘটে শিক্ষিত বাঙালি কর্তৃক ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার পর্যায়ে।

—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব—

পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন শিল্পশৈলীর অনুকরণ এবং তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নবীকরণ ঘটে এবং জীবনবোধের অভিনবত্ব ও সাহিত্যের বিষয়গত বিশিষ্টতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা

২৫. পূর্ববৎ/ ১৬১ পৃঃ।

২৬. 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার আগে বঙ্কিমচন্দ্র Rajmohan's Wife রচনা করেন। ইংরেজি রচনাটি The Indian field পত্রিকায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনাটি গ্রন্থাকারে কখনো প্রকাশ করেন নি। বাংলায় 'রাজমোহনের স্ত্রী' (অসম্পূর্ণ) নামে উক্ত ইংরেজি রচনাটির সমান্তরাল একটি রচনা পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত অবস্থায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নি।

দান করে। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যাদি নতুন বাংলা সাহিত্যের সৃজ্যমান অবস্থায় প্রকাশ পায়—এক. সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে দেবতার স্থলে মানুষের জয়-জয়কার ; দুই. ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সাহিত্যের মূলধন হওয়ায় বিষয়বস্তুতে গতানুগতিকতা ও পুনরাবৃত্তির প্রায় অবসান ; তিন. আবেগপ্রবণতা ও কল্পচারিতার পাশাপাশি সাহিত্যে যুক্তিবাদী জীবনবোধের অনুসরণ ; চার. বিশ্ব সাহিত্যের সান্নিধ্যে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যলাভ।

অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে বাংলা সাহিত্য বৈচিত্র্য-মণ্ডিত হয়। প্রহসন-নাটক, ব্যঙ্গকবিতা-গীতিকবিতা-সনেট, পত্রকাব্য-আখ্যায়িকাকাব্য-মহাকাব্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-আলোচনা, নক্সা-কাহিনী আখ্যান-উপাখ্যান-উপন্যাস-ছোটগল্প প্রভৃতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নতা ও অভিনবত্বের নিদর্শন। এই পর্যায়েই গদ্য সমকালীন জীবনের বাঙ্ময় প্রকাশভূমি হয়ে ওঠে এবং বাংলায় জীবনানুসারী কথাসাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয়। বাংলার নভেল এই কথাসাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট শিল্পশৈলী।

নাটক রচনার দ্বারাই বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্য ভাবনার বীজ রোপিত হয়। পরবর্তীকালে প্রথমে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের গৃহাঙ্গনে অভিনয়ের জন্য এবং পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত (১৮৭২) হওয়ার ফলে বাংলায় নাটক রচনার উৎসাহ ক্রমবর্ধিত হয়। বাংলা নাটক রচনার মূলে আছে ইংরেজি নাটকের শিল্পরীতির প্রভাব। প্রথম দিকে বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা বহির্শক্তি কেন্দ্রিক ছিল, কিন্তু পরে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনে চলমান জীবনের বিভিন্ন দিক নাটক ও প্রহসনের বিষয় হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে কলিকাতা কমলালয়, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কুলীন কুল সর্বস্ব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা, বিধবা বিবাহ নাটক, বেশ্যাশক্তি নিবর্তক নাটক প্রভৃতি রচনাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাটকের এই বিষয় বিস্তার বাংলা কথাসাহিত্যের কথাবস্তুর বিস্তারে ও বৈচিত্র্য সাধনের অনুকূল ছিল। কেননা এই সমকালীনতার উপরই নভেল-এর কথাবস্তুর বিস্তার নির্ভরশীল। এই পর্যায়ের শক্তিশালী নাট্যকার হলেন মধুসূদন-দীনবন্ধু (১৮৩০-১৮৭৩) গিরীশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১২)।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যথার্থ প্রতিষ্ঠা ঘটে কাব্যকলার ক্ষেত্রে। ইংরেজি বিদ্যার বলে কাব্যে রোমান্স রসের যোগান দিয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যো-

পাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) নবযুগের দিকে বাংলা সাহিত্যের মুখ ফেরালেন[২৭] এবং গুরু ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)-এর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু তিনি কাব্যে আধুনিকতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। বাংলা কাব্য সাহিত্য তখন যে-নতুন আগমনী গান শোনার অপেক্ষায়, মধুসূদন দত্ত সেই নতুনের পৌরহিত্য করেন। তাঁর তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য-মেঘনাদবধকাব্য বীরাঙ্গনাকাব্য-ব্রজাঙ্গনাকাব্য-চতুর্দশপদী কবিতাবলী—প্রত্যেকটিই বাংলা কাব্যের শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে নব নব আন্দোলনের স্মরণিকা। ডিরোজিও-চেতনা প্রসূত মানবিক কৌতূহলের বশবর্তীতেই মধুসূদন মানুষকে দেবতা করার পরিবর্তে রাক্ষসদেরকে মনুষ্যপদে উন্নীত করেন; নতুন জীবনবোধ-সঞ্জাত চেতনার রঙে কবি বাঙালির চিরন্তন রাধাচেতনাকে ব্যক্তিক রাধায় রূপায়িত করলেন। অধিকন্তু বন্দিনী সীতার মুক্তির মতো তিনি বিভিন্ন নারী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে শৃঙ্খলিত বাঙালির নারীর নারীত্বকে মুক্তি দিলেন।

আধুনিক বাংলা কাব্য যখন শতদল হয়ে উঠেছে, তখন বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশ লাভ করছে। গদ্যে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে প্রবন্ধ ছিল অগ্রবর্তী। সাময়িকপত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায়, সংস্কার আন্দোলনের পরিমণ্ডলে ও বুদ্ধিজীবীদের কলম আন্দোলনে চিন্তামূলক রচনার ধারা বাংলা গদ্যের প্রথম পর্যায়ে সর্বাধিক বিকাশ লাভ করে। বস্তুত প্রবন্ধের হীরক কাঠিন্যের মাধ্যমেই বাংলা গদ্যের সচেতন আত্মপ্রকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্যে এই প্রবন্ধ ধারারই প্রাধান্য ছিল। এই পর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গোষ্ঠীর অক্ষয় কুমার দত্তই প্রধান গদ্য লেখক ছিলেন। এঁদের সঙ্গে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কল্পনার প্রসারণ উপযোগী বাংলা কথাগদ্য তিনিই প্রথম রচনা করে দেখালেন। বস্তুত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগোষ্ঠীর ত্রয়ী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন প্রখ্যাত মানববাদী বুদ্ধিজীবীর হাতেই সর্বার্থসাধক বাংলা গদ্যের মুক্তি ঘটল।

গল্পরস রসসাহিত্যের অন্যতম বিষয়, নভেল নামক শিল্পশৈলীর মৌল বিষয়ও গল্পরস।[২৮] শতাব্দীর প্রথম পর্বের গল্পসাহিত্য মূলত অনুবাদধর্মী ছিল।

২৭. সুকুমার সেন/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/১২৬ পৃঃ।
২৮. Collins, Wilkie. The Women in White নভেল-এর Preface (1861) দ্রষ্টব্য।

সমসাময়িক জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা গল্পসাহিত্যের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠতে পারে—এই চিন্তা এই পর্বের কম গদ্যলেখকের কল্পনাকেই নাড়া দিতে পেরেছিল। ফলে প্রথম পর্যায়ে বাংলা গল্পসাহিত্যকে অনুবাদের মুখাপেক্ষী হতে হয়. এই অনুবাদ পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
পরিবর্তিত যুগপরিবেশে জীবনের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবের ফলেই বাংলা কথাসাহিত্যে অনুবাদাশ্রয়ী গল্প রচনা ও মৌলিক রোমান্সধর্মী গল্প রচনার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নভেল নামক শিল্পশৈলীর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নভেল হলো নির্বিশেষ সামাজিক মানুষের সাহিত্যায়ন। গল্পরস চিরাচরিত বিষয়কে ছেড়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করলে বাংলা কথাসাহিত্যে নভেল-এর উদ্ভব সম্ভব হয়। গল্পসাহিত্যে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতটা ছিল মাটি ও মানুষ এবং সম্ভতন হওয়াটাই এর বড়ো পরিচয়। পরবর্তী আলোচনার প্রবেশমুখে আমরা এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিম্নরূপ সংজ্ঞার্থ[২৯] এখানে গ্রহণ করছি : "উপন্যাস রচনার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা জিনিষটা সীমাহীন। এর সুরুও নেই, শেষও নেই। এ-এক আদি-অন্তহীন প্রবাহ। সে-প্রবাহ কল্পনা সমৃদ্ধ মানস-বৃত্তির, সে প্রবাহ চেতনার। এই অভিজ্ঞতা যখন কল্পনা-সম্পৃক্ত হয়ে উঠে তখনই প্রাণবায়ুর মত তা উপন্যাসের জীবনসঞ্চারী হয়ে উঠে।" বাংলা কথাসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই প্রথম জীবনানুসারী শিল্পপ্রয়াস হয়ে ওঠে। বিষবৃক্ষ (১৮৭২) থেকে বিনোদিনী (১৯০০) (চোখের বালি-র পাণ্ডুলিপি) বাংলা উপন্যাসের জীবনানুসারী শিল্পশৈলী রূপে উত্তরনের পর্ব।

২৯. শিশির চট্টোপাধ্যায়/উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা/১৯৬২/৪০ পৃঃ।

২. নভেল ভাবনা : বিদেশে ও এদেশে

বর্তমান পর্যায়ে 'নভেল' বিষয়ক বিদেশী ভাবনা, বাঙালির 'নভেল' ভাবনা এবং বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শিল্পশৈলী রূপে 'উপন্যাস' শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্য আলোচিত হচ্ছে। এই আলোচনা মূলত উনবিংশ শতাব্দীর সময় রেখার মধ্যেই, কারণ এই কালের মধ্যেই বাংলা নভেল-এর উদ্ভব ঘটে গিয়েছে। নভেল বিষয়ক চিন্তাভাবনার বর্তমান আলোচনাটি চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হলো : ক. ইংরেজি নভেল-ভাবনা : নভেল-এর শব্দার্থ ও তার শিল্পসত্তা, ফিকসন ও নভেল, রোমান্স ও নভেল ; খ. বাঙালির নভেল-চিন্তা ; গ. উপন্যাস-এর শব্দার্থ ও তার শিল্পসত্তা ; ঘ. জীবনানুসারী শিল্প : আখ্যান ও উপন্যাস।

—ইংরেজি নভেল-ভাবনা—

নভেল কী, নভেল-এর সংজ্ঞার্থই [১] বা কী, কীই বা তার শিল্পতাৎপর্য— বাংলা নভেল-এর উৎস সন্ধানে এই সব কিছুর আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় নভেল-সম্পর্কিত ইংরেজি ভাবনা উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তালোক থেকেই গৃহীত হয়েছে। এই নভেল-ভাবনার সঠিক আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই নভেল-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উদাহৃত হলো।

নভেল-এর শব্দার্থ

ক. Novel—"adj new : new and strange : of a new kind : felt to be new.—n. that which is new : a piece of news.........."[২]

খ. Novel—"1. something new ; a novelty. 2. News, tidings, A piece of news." [৩]

গ. Novel—"..........it is more typically concerned with the contemporary. The word novel itself is ultimately derived from the Latin *novus* meaning 'new', via the Italian word for a

১. Shipley, Joseph T. (Ed.). Dictionary of World Literary Terms, (Rev. ed.) 1970, p. 215. ["The most protean of literary forms, the novel is the least amenable to formal definition."]

২. Chambers's Twentieth Century Dictionary. 1956. p, 732,

৩. Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed. Vol. II. 1964. p. 1341.

short story, *novella*, which tended to mean not only an original as opposed to a traditional story, but also one that was, pretendedly at least, of recent occurence."[৪]

—সুতরাং নভেল-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়াচ্ছে সংবাদ যা সবসময়েই নতুন বা অভিনব অর্থাৎ যা পুরাতন বা গতানুগতিক নয়। পরবর্তীকালে এই সংবাদ বিশেষত্বই ব্যাপক অর্থে নরনারীর জীবনের বিশেষত অন্তর্জীবনের সংবাদ হয়ে উঠেছে এবং নভেল হয়েছে সমকালের নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের কথা।

নভেল-এর শিল্পসত্তা

এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণের নভেল সংক্রান্ত বিশিষ্ট অভিমত সমূহ গৃহীত হলো—

ক. আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের অভিমত[৫] (১৮১৫) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তিনি বলেছেন—

"Accordingly a style of of novel has arisen, within the last fifteen or twenty years, differing from the former in the points upon which the interest hings, neither alarming our credulity nor amusing our imagination by wild variety of incident, or by those pictures of romantic affection and sensibility,.........The substitute for these excitements........, was the art of copying from nature as she really exists in the common walks of life and presenting to the reader, instead of the splandid scenes of an imaginary world, a correct and striking representation of that which is daily taking place around him."

—লক্ষণীয় যে, তাঁর জীবৎকালেই নভেল সম্পর্কিত ধারণায় বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। পরিবর্তন এসেছে কথাবস্তুর মধ্যে। জেন অষ্টিন-এর লেখা এমা নভেল-এর আলোচনায় তিনি পূর্বোক্ত অভিমত জ্ঞাপন করেন। এই বক্তব্য মূলতঃ রোমান্স ও নভেল-এর কথাবস্তু সম্পর্কিত এবং এই উক্তির মাধ্যমে স্কট উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যও নির্দেশ করেছেন। স্মরণীয় যে, বাঙালি

৪. Encyclopaedia Britanica, Vol 16. 1968. p. 674.
৫. Lodge, David [Ed]. Jane Austen's Emma : A Case Book. 1968. p. 39.

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র স্কটের রোমান্স রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

খ. জেন অষ্টিন-এর অভিমতটিও৬ গুরুত্বপূর্ণ। স্ব-রচিত এমা-র আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন—

"I am fully sensible that an historical romance, founded on the House of Saxe Cobourg, might be much more to the purpose of profit or popularity than such pictures of domestic life in country villages as I deal in. But I could no more write a romance than an epic poem. I could not sit seriously down to write a serious romance under any other motive than to save my life ; .. — ...I must keep to my own style and go on in my own way : and though I may never succeded again in that, I am convinced that I should totatly fail in any other."

—উক্তিটি James Stanier Clarke-এর নিকট এমা প্রসঙ্গে জেন অষ্টিন-এর লিখিত (১৮১৬) একটি পত্রের অংশ বিশেষ। জেন অষ্টিন রোমান্সের পথ না মাড়িয়ে সাধারণ জনজীবন অবলম্বনে নভেল রচনায় ব্রতী হন এবং এতদ্প্রসঙ্গে তাঁর অক্ষমতা ও ক্ষমতার কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি পারিবারিক জীবনবৃত্ত অবলম্বনে নভেল রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

গ. চার্লস ডিকেন্স ছিলেন স্ব-কালের লণ্ডনের জনজীবনের ঔপন্যাসিক। BARNABY RVDGE নভেল-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (১৮৪১)—

"No account of the Gordon Riots have been to my knowledge introduced into any work of Fiction, and, the subject presenting very extraordinary and remarkable features, I was led to project this Tale."

—এই স্বীকারোক্তিই তাঁর ঔপন্যাসিক চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি স্ব-কালের জীবনধারা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিলেন। লণ্ডনের জনজীবনের যে-সকল ঘটনা পূর্বে নভেল-এর কথাবস্তু রূপে বিবেচিত হয়নি তিনি সে সকল ঘটনা বা বিষয় অবলম্বনে নভেল রচনায় অগ্রসর হন।

৬ Ibid. p. 12

প্রসঙ্গত আমরা তাঁর আর একটি অভিমত (১৮৪৭-৪৮) গ্রহণ করছি। অভিমতটি তাঁর DOMBEY AND SON-এর ভূমিকা থেকে গৃহীত হলো—

"I make so bold as to believe that the Faculty (or the habit) of correctly observing the characters of men, is a rare one. I have not even found, within my experience, that the faculty (or the habit) of correctly observing so much as the faces of men, is a general one by any means."

—সমসাময়িক নরনারীকে নিয়ে নভেল রচনা করলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের বাইরের চেহারা দেখে মানুষের সবটা বুঝতে পারা যায় না এবং সেক্ষেত্রে কথাবস্তুও বিশেষত্ব বর্জিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষের চরিত্রকে যথাযথ ভাবে বুঝতে পারা এবং তার রূপায়ণ অপেক্ষাকৃত কঠিন, কিন্তু নভেল-এ এই চরিত্রের রূপায়ণই অধিক কাম্য।

ঘ. জর্জ ইলিয়ট তাঁর "Silly Novels by Lady Novelists" (১৮৫৬) নামক প্রবন্ধে[৭] নভেল-এর শিল্পশৈলী সম্পর্কে লিখেছেন :

"Every art which has its absolute tecknique is, to a certain extent, guarded from the intrusions of mere left handed imbecility. But in novel writing there are no barriers for incapacity to stumble against, no external criteria to prevent a writer from mistaking foolish facility for mastery."

—জর্জ ইলিয়ট মনে করেন যে নভেল-এর নির্দিষ্ট কোনো বহিরঙ্গ রূপাবয়ব বা নির্দিষ্ট কোনো শিল্পশৈলী নেই। ফলে অক্ষম অনুকারীদের হাত থেকে নভেল-কে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য সাহিত্যাদর্শের নির্দিষ্ট রূপাবয়ব থাকায় সেই সকল সাহিত্যাদর্শকে অক্ষম রচয়িতাদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

ঙ. উইলকি কলিনস নভেল-এর কথাবস্তু পরিবেশনের কৌশল সম্পর্কে বলেছেন :

"When the writer of these introductory lines happens to be more closely connected than others with the incidents to be recorded, he will describe them in his own person. When his

৭. Pinney, Thomas (Ed). Essays of George Eliot. 1963. p. 324.

experience fails, he will retire from the position of narrator; and his task will be continued, from the point at which he has left it off, by other persons who can speak to the circumstances under notice from their own knowledge, just as clearly and positively as he has spoken before them."

Thus, the story here presented will be told by more than one pen,.........."

—The Women in White (১৮৬০) নামক নভেল-এর প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়ায় কলিনস গল্পবলার উপরোক্ত টেকনিকের কথা বলেছেন। কথাবস্তু পরিবেশনের এই আঙ্গিক নভেল-এর শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য শিল্পভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রজনী (১৮৭৭) নভেলটি রচনা করেন এবং একথা তিনি রজনী-র ভূমিকায় জানিয়েছেন।

The Women in White-এর ভূমিকা (১৮৬১)-তেই নভেল-এর কথাবস্তু কী ধরণের হবে, তৎসম্পর্কে কলিনস বলেছেন :

"I have always held the old fashioned opinion that the primary object of a work of fiction should be to tell a story and I have never believed that the novelist who properly performed this first condition of his art was in danger, on that account, of neglecting the delineation of character—for this plain reason, that the effect produced by any narrative of events is essentially depended, not on the events themselves, but on the human interest which is directly connected with them. It may be possible in novel writing to present characters successfully without telling a story; but it is not possible to tell a story successfully without presenting characters: their existence as recognisable realities being the sole condition on which the story can be effectively told. The only narrative which can hope to lay a strong hold on the attention of readers is a narrative which interest them about men and women—for the perfectly obvious reason that they are men and women themselves",

—লক্ষণীয় যে, নভেল-এ গল্প থাকবেই, কিন্তু সে গল্পকে হতে হবে জীবনরস সমৃদ্ধ, কথাবস্তু নরনারীর জীবন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে যদি ব্যর্থ হয়, তবে নভেল হিসেবে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কলিনস মনে করেন যে নভেলকে এই বিপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করা সম্ভব যদি কথাবস্তুর উপস্থাপনায় নরনারীর চরিত্রায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বস্তুত চরিত্রসৃষ্টিই নভেল-এর শিল্পশৈলীর প্রধান বিশেষত্ব।

চ. ঔপন্যাসিক এণ্টনি ট্রলপে-এর নভেল-ভাবনা (১৮৭৬)[৮] সমূহ নিম্নরূপ :

(a) "The writer of stories must please, or he will be nothing. And he must teach whether he wish to teach or no. How shall he teach lessons of virtue and at the same time make himself a delight to his readers ? ....But the novelist, if he have a conscience, must preach his sermons with the same purpose as the clergyman, and must have his own system of ethics." (p.201)

(b) "It is admitted that a novel can hardly be made interesting or successful without love. Some few might be named, but even in those the attempt breaks down, and the softness of love is found to be necessary to complete the story". (p 203)

(c) "No novel is anything, for the purposes either of comedy or tragedy, unless the reader can spmpathise with the characters whose names he finds upon the pages. Let an author so tell his tale as to touch his readers heart and draw in tears, and he has, so far, done his work well. Truth let there be,—truth of description, truth of characters, hnman truth as to men and women. If there be such truth, I do not know that a novel can be too sensatlonal." (p. 208)

(d) "I have from the first felt sure that the writer, when he sits

৮. Trollope, Anthony. An Autobiography. 1947. ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রলপে তাঁর আত্মজীবনীটি রচনা করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রচনাটি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

down to commence his novel, should do so, not because he has to tell a story, but because he has a story to tell." (p. 208)
—প্রথমত ট্রলপে নভেল-এর কথাবস্তুকেও নীতি শিক্ষাদানের মাধ্যম মনে করেছেন, কিন্তু এই শিক্ষাদানের কৌশল হবে ভিন্ন, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব 'system of ethics' থাকবে, এখানেই তিনি একজন যাজকের সঙ্গে একজন ঔপন্যাসিকের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুরূপ ভাবনার অধিকারী ছিলেন।
দ্বিতীয়ত তিনি মনে করেন যে নভেল-এর কথাবস্তু হবে নরনারীর প্রণয়-সম্পর্কিত, প্রণয়াদিকে বাদ দিয়ে নরনারীর পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও আবেগপূর্ণ মনের পরিচয় পরিস্ফুটন সম্ভব নয়।
তৃতীয়ত সত্যকল্পতাই হবে নভেল-এর কথাবস্তুর বিশেষত্ব এবং চরিত্রসমূহকে অবশ্যই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হতে হবে। পাঠক-সাধারণ যেন নভেল-এর নরনারীর সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন মনে করতে পারে। এবং তা বাস্তবতা-সম্পাদনের দ্বারাই সম্ভব। ট্রলপে sensational অর্থে অ-বাস্তব এবং anti-sensational অর্থে বাস্তব-কে বুঝিয়েছেন।[৯]
চতুর্থত নভেল-রচয়িতা গতানুগতিক কোনো গল্প বলবেন না (not to tell a story), পক্ষান্তরে নভেল-রচয়িতার একটি গল্প (বিষয়) বলার আছে (he has a story to tell)। এক্ষেত্রে ট্রলপে নভেল-এর কথাবস্তুর জন্য নভেল-রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
ছ. হেনরী জেমস-এর অভিমত (১৮৮৪)[১০] উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গের শেষ টানছি :
(a) "The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life." (p. 25)
(b) "A novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life : that, to begin with, constitutes its value, which is greater or less according to the intensity of the impression." (p. 29)

৯. Ibid. p. 206.
১০. James, Henry. The House of Fiction. 1957.

(c) "The story and novel, the idea and the from, are the needle and the thread, and I never heard of a guild of tailors who recommended the use of the thread without the needle, or the needle without the thread." (p. 40)

—নভেল-রচয়িতা হিসেবে হেনরী জেমস মনে করতেন যে নভেল-এর অস্তিত্ব জীবনের রূপায়ন সাপেক্ষ। অবশ্যই এই জীবন-রূপায়ন নরনারীর অন্তর্জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। তাঁর মতে নভেল হলো জীবনের ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এ উপলব্ধি অবশ্যই নভেল-রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। তিনিই নভেল-কে গল্পসাহিত্যের একটি বিশেষ শিল্পশৈলী বলে অভিহিত করেন। এবং তিনি মনে করতেন যে গল্প এবং নভেল-ফর্মটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত এবং অবিচ্ছেদ্য, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, যেমনটি দর্জি স্চ ও সুতোকে পরস্পর থেকে ভিন্ন কল্পনা করতে পারে না। নভেল জাতীয় রচনা সম্পূর্ণত বাস্তবতা-সম্পাদনের উপর নির্ভর করে আছে। এবং নরনারীর জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সত্যকল্পতাই নভেল জাতীয় রচনার প্রধান কাজ। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ হেনরী জেমসের নভেল ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনাবলীতে গ্রথিত চোখের বালি-র সূচনায় আমাদের এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

এবারে আমরা 'নভেল' জাতীয় রচনার সামগ্রিক বিশেষত্ব নির্দেশ করতে পারি—

এক. নভেল গল্পের একটা ফর্ম বিশেষ এবং নভেল-কে প্রাথমিক ভাবে গল্প রসই পরিবেশন করতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পশৈলীর মতো নভেল-এর কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর শিল্পসত্তা কতকগুলি আন্তর বিশেষত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

ক. নভেল বর্ণনাত্মক গদ্য রচনা এবং বিশেষ একটি থীম-এর রূপায়ণ।

খ. গতানুগতিকভাবে গল্প বলা নয়, চরিত্রসৃষ্টিই এই জাতীয় রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

দুই. নভেল-এর কথাবস্তু হবে নভেল-রচয়িতার সমসাময়িক জীবনভিত্তিক এবং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নির্ভর, অর্থাৎ গতানুগতিক কোনো বিষয় বা পূর্বতন কোনো বিষয় নভেল-এর প্লট হবে না। বস্তুত সন্ততন হওয়াটাই নভেল-এর অন্যতম বিশেষত্ব।

তিন. নরনারীর জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণই নভেল-এর উপজীব্য বিষয়। জীবনরস সমৃদ্ধ গল্পরচনাই হবে নভেল-এর প্রথম ও শেষ কথা।

চার. নভেল চিরকালীন গল্পপ্রবাহের একটি ধারাবিশেষ।

'নভেল' সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় ফিকসন (fiction) এবং রোমান্স (Romance) এর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়। শিল্পশৈলীর বিচারে নভেল-ফিকসন-রোমান্স পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও শিল্প-প্রকরণের দিক থেকে নভেল কী-ফিকসন কী-রোমান্স দুয়েরই কাছাকাছি এবং গল্পসাহিত্যের আধুনিক শিল্পশৈলী রূপে 'নভেল' একটি স্ব-তন্ত্র। এই সূত্রেই নভেল-এর আলোচনায় রোমান্স ও ফিকসন-এর প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান প্রসঙ্গে এক. ফিকসন ও নভেল, দুই. রোমান্স ও নভেল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

ফিকসন ও নভেল :

ইংরেজিতে নভেলের আলোচনায় 'ফিকসন' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় এবং অনেকেই মনে করেন যে নভেল ও ফিকসন সমার্থক। এর কারণ উভয়ের সাধারণ ধর্ম : গল্পরস[১১]। অবশ্য এই গল্পরস কবিতাতেও পরিবেশিত হতে পারে। তাই আবহমান কাল ধরে রচিত গল্প মাত্রই ফিকসন বলে কথিত হয়ে এসেছে। ফিকসন-এর অর্থ কল্পনা—যা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় এবং ফিকসন হলো সেই গল্পরস যা গদ্যে ও পদ্যে উভয় ভাষায় রচিত হতে পারে। কিন্তু নভেল গদ্যবাহী শিল্পশৈলী। গল্পরস পরিবেশনের দিক থেকে নভেল ও ফিকসনের মধ্যে মিল থাকলেও উভয়েই উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক নয়। নভেল আধুনিক কালের আধুনিক সাহিত্য প্রকরণ, সে শুধু গল্প বলেই ক্ষান্ত নয়, সে পাঠকমনে গল্পাতিরিক্ত আবেদনও রাখে এবং এই আবেদন সহৃদয় পাঠকের জীবনবোধকে নাড়া দিয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণ গল্প মনের মধ্যে একটা আবেশ সৃষ্টি করে, যেমনটি জলসার আসরে যন্ত্রসঙ্গীত শ্রোতার মনে আবেশ সৃষ্টি করে ; কিন্তু একটি ভাল নভেল পাঠের শেষে সহৃদয় পাঠকের মনে অনুরূপ অনুভূতি সৃষ্টির পরিবর্তে তার জীবনবোধে কোথাও কোথাও জিজ্ঞাসার চিহ্ন মুখ তুলে দাঁড়ায়। এবং এই গল্পরসের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য পাঠককে ভাবতে

১১. Allen, Walter. The English Novel. 1967. p. 13.

হয় কারণ নভেল-এর গল্পরস যুক্তিপরম্পরায় তথা কার্যকারণ সূত্রে বিন্যস্ত, কিন্তু নভেল-পূর্ব গল্পরস ঘটনাপরম্পরায় বিন্যস্ত।[১২]

সুতরাং নভেল সম্পর্কিত আলোচনায় এই গল্পরসের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই ফিকসন এবং নভেল-এর মধ্যকার নিম্নরূপ পার্থক্য নির্দেশ করা যায়—ফিকসন হলো জাতি (genous) বিশেষ এবং নভেল হলো সেই জাতির প্রজাতি (species)। জীবজগতের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, ফিকসনের সঙ্গে নভেলের সেই সম্পর্ক। বাংলায় 'কথাসাহিত্য' বলতে ফিকসনকে বুঝানো যেতে পারে, গল্পমূলক গদ্যরচনা নিয়েই বাংলা কথাসাহিত্যের কারবার, বাংলায় কথাসাহিত্য হলো জাতি বিশেষ এবং নভেল জাতীয় রচনাসমূহ হলো প্রজাতি।

রোমান্স ও নভেল :

কথাসাহিত্যের আলোচনায় রোমান্স বলতে বুঝায় অতীতাশ্রয়ী কল্পনানির্ভর আদর্শায়িত বীররসাত্মক এবং একটি বিশিষ্ট শ্রেণীচরিত্রের পরিচয় জ্ঞাপক গল্প-সাহিত্য। এই শ্রেণীর গল্পসাহিত্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচয়িতার সমকালীন জীবনধারার নাড়ীর যোগ নেই এবং এই সকল গল্পে নেই মাটির সন্তানদের কথা।

আর্ণল্ড কেটল রোমান্স-এর বিশেষত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে রোমান্স হলো সামন্ত-জীবনবোধ সম্ভূত এক অবাস্তব ও অভিজাত সাহিত্য। রোমান্স অবাস্তব—এই অর্থে যে এই সকল রচনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের জীবনবোধের সহায়ক নয়।[১৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনবোধে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের পথ ধরে জীবনানুসারী গদ্যনির্ভর গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভিন্নতর বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। নতুন জীবনবোধ গল্পসাহিত্যের রসসৃষ্টিতে ও উপস্থাপনায় যে নতুনত্ব নিয়ে এলো সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন তার

১২. Forster. E. M. Aspects of the Novel. 1968. p. 93-94.

১৩. Kettle, Arnold. An Introduction to the English Novel, Vol. I. 1969. p. 29.

একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন[১৪]—বাস্তবধর্মী ও প্রাকৃত সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিকাশ হলো সাহিত্যের একটি নবতর অবস্থান্তর পর্যায় : সাহিত্যের বিষয়রূপে বীর-বীরত্ব-আদর্শবাদ ও মহনীয়-উন্নত-রোমান্টিক-অসাধারণ ও অপ্রাকৃত বিষয়াদি ছেড়ে সাধারণ ও অতিসাধারণ মানুষ ও তাদের আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অবলম্বনই হলো এর বিশেষত্ব। এক কথায় নতুন কাল স্বকালের জীবন-নির্ভর সাহিত্য রচনার দ্বার খুলে দিল এবং সাহিত্য হলো জীবনানুসারী।

এর ফলে গল্পরসের প্রবাহটা হলো পরিবর্তিত। আর কল্পনার জগৎ নয়, দৃশ্যমান জগৎ এই গল্পরসের উৎস হলো। কথামূলক গদ্যরচনার এই বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন 'নভেল' নামক নতুন একটি শিল্পপ্রকরণের সূচনা করে। সাহিত্যের নিত্য নতুন সৃষ্টিতে গতানুগতিক ও চিরন্তন বিষয়াদির পরিবর্তে জীবননিষ্ঠ বিষয়াদি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্রমিক প্রাধান্যলাভের ফলে নভেল-এর উদ্ভব ও বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্ট হয়।[১৫] বিষয়বস্তুর বিচারে রোমান্স ও নভেল-এর মধ্যকার সম্পর্কের এ হলো একদিক।

দ্বিতীয় দিকটি হলো চরিত্রায়নের বিশেষত্ব। রোমান্সের চরিত্রসমূহের বিচরণ কালের উর্দ্ধায়ত লোকে এবং মহাকাব্যের চরিত্রসমূহের মতো এ সকল চরিত্র বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী। আর নভেল-এর চরিত্র তথা নরনারীর বিচরণ লেখকের দৃশ্যমান জগতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে রচিত নভেল-এর চরিত্র রচয়িতার জীবনবোধ এবং স্ব-কালের নরনারীর পরিচয়বহ, অধিকন্তু চরিত্রসমূহ ব্যক্তিত্বোজ্জ্বল ও ঘটনার নিয়ামক। আর রোমান্স হলো ঘটনাপ্রধান গল্পরস এবং যথার্থ নভেল-এর ঘটনা হলো চরিত্রোৎসারিত। চরিত্রসৃষ্টির এই বিশেষত্বের মধ্যেই রোমান্স ও নভেল-এর অন্তর্নিহিত পার্থক্য নিহিত।

এখানেই নভেল-সংক্রান্ত বিদেশী ভাবনার বিভিন্ন দিকের প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষ এবং এই সব কিছুই পাশ্চাত্যের আলোকে আলোচিত। পরবর্তী পর্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির নভেল চিন্তা গৃহীত হলো।

১৪. Sorokin, Pitirim A. Social and Cultural Dynamics, Vol I. (Fluctuation of forms of Arts). 1937. p. 645.

১৫. Watt, Ian. The Rise of Novel. 1964. p. 14.

—বাঙালির নভেল-চিন্তা—

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাংলা সাহিত্যে নভেল জাতীয় কোনো শিল্পশৈলী ছিল না, কারণ তখন বাংলা সাহিত্যে ছিল না গদ্য—যে-খাতে নভেল বহমান থাকবে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রাণিত জীবনবোধের পটভূমিতে আমাদের সাহিত্যও জীবননিষ্ঠ হয়ে ওঠে. এর ফলে গদ্য সাহিত্যের শিল্পপ্রকরণে অভিনবত্ব দেখা দেয় এবং বাংলায় নভেল জাতীয় রচনা এরই অন্যতম ফলশ্রুতি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে নভেল-রচনার প্রয়াস যখন ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তখন এই সম্পর্কে যে-সকল ভাবনা আমাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, আলোচ্য পর্যায়ে সেই সকল চিন্তা কালানুক্রমিকভাবে গৃহীত হলো। কারণ এই ভাবনাসমূহই একালের বাঙালির নভেল-সংক্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কে যথার্থ আলো দিতে পারবে, বলে দিতে পারবে একালের বাঙালি নভেল বলতে কী বুঝেছে। আলোচ্য পর্যায়ে আমরা প্রথমেই প্যারীচাঁদ মিত্রকে স্মরণ করছি।

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভূমিকা (১৮৫৮)য় লিখেছেন : "The above original Novel in Bengali being the first work of the kind,... chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up ... and is illustrative of the condition of the Hindu society, manners customs; &c, and partly of the state of things in the Moffussil." এই অংশ থেকে প্যারীচাঁদ সম্পর্কে চারটি প্রধান সিদ্ধান্তে আসা যায়—এক. বাংলায় মৌলিক 'নভেল' লেখা সম্পর্কে তার সচেতনতা, দুই. এইরূপ রচনার ক্ষেত্রে আদিকর্ম্মিকের গৌরব দাবী, তিন. নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এই শিল্প-শৈলীর ব্যবহার, চার. গল্পের বিষয়রূপে স্বকালের ব্যবহার।

খ. হরিনাথ মজুমদার বিজয়-বসন্ত (১৮৫৯)-এর ভূমিকায় লিখেছেন: "বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভুগোলাদি সর্বদা অধ্যায়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। এজন্য Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষনে কামিনী কুমার, রসিকরঞ্জন, চাহার দরবেশ, বাহার দানেশ প্রভৃতি যে সমুদয় ব্যাপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদায়ই অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। .. এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি 'বিজয়-বসন্ত' নামে এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই।" লক্ষণীয় যে,

লেখক বালকদিগের জন্যই বিজয়-বসন্ত রচনায় উদ্যোগী হন এবং রচনার বিষয়বস্তু রূপে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার না করে একটি মনঃকল্পিত বিষয়কে রূপকথার ঢংএ ব্যবহার করেন। উদ্ধৃতিটি নভেল-সম্পর্কিত এক উদ্ভট ধারণার পরিচয়বহ।

গ. গোপীমোহন ঘোষ তাঁর বিজয়বল্লভ-এর বিজ্ঞাপনে (১৮৬২) জানিয়েছেন : "ইউরোপীয় লোকদিগের কার্যকলাপ যেরূপ অদ্ভুত ও চমৎকারজনক, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এতদ্দেশীয় লোকের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজি নভেলের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন।" বিজ্ঞাপন তথা ভূমিকা দৃষ্টে মনে হয় যে, গোপীমোহন পাশ্চাত্য নভেল-এর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার মূলে যে-জীবনবোধ ও জীবনবীক্ষা কাজ করে সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সমকালীন বাঙালি নরনারীর জীবনবোধ ও আচরণকে তিনি বাংলায় নভেল রচনার অনুকূল মনে করেন নি।

ঘ সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'মৃণালিনী' সম্পর্কিত আলোচনায় (১৮৬৯) লিখেছেন : "বহু কালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতার মনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশ সিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কয়েক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত-প্রেতের পরিবর্তে মানুষিক ঘটনার উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন; এবং কয়েকখানি সুচারু পুস্তকও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইংরাজীর প্রকৃত নভেলের পারিপাট্য লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবুও সেই অনুরাগের অনুরাগী ;......এবং পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহাতে তিনি সর্বতোভাবে সিদ্ধসংকল্প হইয়াছেন ;......।"[১৬] অর্থাৎ বাঙালির নভেল তথা উপন্যাস ভাবনায় বিষয়গত ও শিল্পগত পরিবর্তন এনেছে ইংরেজি শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রেরণা, দ্বিতীয়ত বাংলায় "ইংরাজীর প্রকৃত নভেলের পারিপাট্য" আনয়নের সংকল্পে বঙ্কিমচন্দ্রই সিদ্ধ হন।

ঙ. এক্ষণে কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নভেল-ভাবনার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখছি :

এক. Bengali Literature নামক ইংরেজি প্রবন্ধে (১৮৭১) বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করেও মন্তব্য[১৭] করেছেন যে

১৬. রহস্য-সন্দর্ভ/৫৭ খণ্ড, ১৯২৭ সংবৎ/কলিকাতা/১৪২ পৃঃ।

১৭. Chattopadhyaya, Bankimchandra. Bankim Rachanavali (English works). Sahitya Samsad, 1969. p. 110.

গ্রন্থখানি "may be said to be the first Novel in the Bengali language." লক্ষণীয় যে, একই আলোচনায় দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)-কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)—মৃণালিনী (১৮৬৯) গ্রন্থত্রয়কে তিনি নভেল বলে চিহ্নিত করেন নি, কিন্তু গ্রন্থত্রয় প্রসঙ্গে নিজেকে 'romance-writer' রূপে অভিহিত করেছেন[১৮] এবং বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯)-এর লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষকেও রোমান্স-লেখক বলে চিহ্নিত করেছেন। একই প্রবন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭)-কে Historical Tales[১৯] বলেই অভিহিত করেছেন, Historical Novels রূপে নয়।

লক্ষণীয় যে, আলালের ঘরের দুলাল-এর বিষয়বস্তু সমসাময়িক কলিকাতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনী ও বঙ্গাধিপ পরাজয়-এর বিষয়বস্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আহৃত এবং এই স্থান-কাল-পাত্রগত পার্থক্যই নভেল ও রোমান্স-এর আন্তর বিশেষত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র সে-সম্পর্কে সম্ভবত সচেতন ছিলেন। প্রসঙ্গত আমরা বঙ্গদর্শন (এপ্রিল ১৮৭২)-এর প্রকাশের পূর্বে ২১ মার্চ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রটির[২০] সাহায্য নিতে পারি। তিনি লিখেছিলেন : "For the English Megazine, I can undertake to supply you novels, tales, sketches and squibes." লক্ষণীয় novels এবং tales-এর উল্লেখ এবং সম্ভবত romance অর্থেই এখানে বঙ্কিমচন্দ্র tale শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা রোমান্স জাতীয় রচনা ঐতিহাসিক উপন্যাস-কে তিনি Historical tales বলেছেন।

দুই. প্রাগুক্ত পত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র নভেল-এর শিল্পশৈলী তথা প্লটভাবনা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত নভেল রচনা যথার্থই একটি শিল্পকর্ম ও সাধনার বিষয়, দ্বিতীয়ত নভেল-এর ঘটনা ও চরিত্র সমূহ একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার অধীনস্থ হবে।[২১] তাঁর অধিকাংশ রচনাই এই শিল্পভাবনাশ্রিত। অবশ্য রজনী (১৮৭৭) বঙ্কিমচন্দ্রের এক সচেতন ও ভিন্ন শিল্পভাবনার পরিচয় বহ। উইলকি কলিনস কৃত The Women in White-এর আঙ্গিক

১৮. Ibid. p. 120.

১৯. Ibid. p. 114.

২০. Ibid. p. 171.

২১. Ibid. ["The Novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the corception and to subordinate the incidents and characters to the central idea."]

অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র রজনী উপন্যাসটি রচনা করেন। তাঁর ইন্দিরা (১৮৭৩ ও ১৮৯৩)ও নতুন ভঙ্গির রচনা।

তিন. সীতারাম (১৮৮৭)-এর তৃতীয় খণ্ডের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন : "ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাস লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন – ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন।" প্রকৃতপক্ষে নরনারীর জীবনের যথাযথ পরিস্ফুটন নভেল-এর প্রধান শিল্প বিশেষত্ব এবং তা নরনারীর অন্তর্জীবনের সুপরিস্ফুটনের দ্বারাই সম্ভব হয়। সম্ভবত এই অন্তর্জীবন অর্থেই বঙ্কিমচন্দ্র অন্তর্বিষয়ের কথা বলেছেন।

চার. কৃষ্ণকান্তের উইল-এর রোহিনীর মৃত্যু সম্পর্কিত সমালোচনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন : "কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র। এ কথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এসকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"[২২] অর্থাৎ নভেল নিছক গল্প নয়, পাঠকের কৌতুহলের চরিতার্থতায় এই গল্পের রসপরিনতি লাভ ঘটে না, বরং এই গল্প মানবজীবনের কোনো কোনো কঠিন সমস্যার রূপায়ন, সমস্যার গভীরে এই ধরণের গল্পের রস নিহিত। তাই সমস্যার উপলব্ধি ব্যতীত এই সকল গল্পের তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব নয়।

চ. রেভা. লাল বিহারী দে সমসাময়িক নভেল-ভাবুকদের অন্যতম। তিনি সমসাময়িক বাঙলার পটভূমিতে চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান এবং ইংরেজিতে Govinda Samanta (১৮৭৪) রচনা করেন। Govinda samanta কে তিনি নভেল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং নভেল-এর বিষয়বস্তুগত তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। "You are not to expect love-scenes. The English reader will be surprised to hear this. In his opinion there can be no novel without love-scenes. A novel without love is to him the play of Hamlet, with Hamlet's part left out. But I cannot help it." অর্থাৎ প্রণয় ব্যাপারটাই নভেল-এর প্রধান সুর। কিন্তু বাঙালি নরনারীর জীবনে যা নেই তাকে তিনি নভেল-

২২. বঙ্গদর্শন/মাঘ ১২৮৪ বং/কাঁটালপাড়া (নৈহাটি)/৪৬৬ পৃঃ।

এর বিষয়বস্তুরূপে কী করে আনবেন। লক্ষণীয় যে, রেভা. দে নভেল-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কেই বক্তব্য রেখেছেন, তিনি আঙ্গিক সম্পর্কে কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি। Trollope-এর নভেল সম্পর্কিত আলোচনায় রেভা দের নভেল-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়।[২৩]

ছ. বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) স্বর্ণলতা (১৮৭৪)র আখ্যানপত্রে রচনাদর্শ সম্পর্কে গ্রীকপণ্ডিত Horace-এর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন: "Fictions to please should wear the face of truth." এই উক্তির তাৎপর্য হলো গল্পের একটি সত্যের আবরণ থাকতে হবে। তারকনাথ এই উক্তিকে আদর্শ মেনে তাঁর রচনায় সমসাময়িক বাঙালির জীবন যাত্রাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন।

জ. ঐতিহাসিক উপন্যাস-এর রচয়িতা ভূদেব মুখোপাধ্যায় পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬)র সূচনায় লিখেছেন: "প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরানিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ।" লক্ষনীয় যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় গল্পরসের ধারায় নভেল-এর উপাদানগত ভিন্নতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

ঝ. চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)ও নভেল-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন: "প্রণয় লইয়াই নভেল লেখকদের কারবার।"[২৪] 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নভেল সংক্রান্ত আলোচনায় চন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ নভেল এর কথাবস্তু সংক্রান্ত এই অভিমতের সঙ্গে রেভা লালবিহারীর অভিমতের কোনো পার্থক্য নেই।

ঞ. রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এদেশীয় নভেল-ভাবনার প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষ টানছি। কারণ তাঁরই হাতে বাংলা নভেল-এর নব পর্যায় সূচিত হয়। ১৮৭৭এ করুণা প্রকাশিত হলেও ১৮৮৫-র পরবর্তীকালেই রবীন্দ্রনাথের নভেল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রকাশ পায়।

২৩. Trollope, Anthony. op. cit. p. 203. পরবর্তী কালে E.M. Forsterও একথা বলেছেন (Forster, E.M. op. cit,p. 61)

২৪. চন্দ্রনাথ বসু/নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য/সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন, ৭ম বর্ষ, ১২৮৭ বঃ/কাঁটালপাড়া/৩০ পৃঃ।

এক. শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তাঁর 'ফুলজানি' সম্পর্কে লিখিত পত্রটি[২৫(ক)] (১৮৮৬খ্রীঃ ৩০ এপ্রিল) রবীন্দ্রনাথের নভেল ভাবনার প্রাথমিক পরিচয় বহন করে। পত্রটি থেকে এতদ্‌সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা হলো—ক. গল্পে "আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত করে" তুলতে হবে, খ. এই লেখা "ভারতবর্ষের পূর্ব বিভাগের জিয়োগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস" জন্মাবে, গ. রচনায় বাঙালি নরনারী "প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যেরকম কথা কয় ও যে রকম কাজ করে" তারই পরিচয় থাকবে। এক কথায় নভেল-এর বিষয় বস্তুর মধ্যে একটি দেশের সমসাময়িক পরিচয় সামগ্রিভাবে প্রকাশ পাবে। এই মনোভাবের পিছনে রবীন্দ্রনাথের একটি সচেতন পাঠকমন কাজ করেছিল, এই পত্রেই তিনি লিখছেন : "এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কিনা ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।"

শ্রীশচন্দ্রকে 'ফুলজানি' সম্পর্কে লেখা পরবর্তী (১৮৮৬) পত্রে[২৫(খ)] রবীন্দ্রনাথের নভেল ভাবনার আরো স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—ক. নভেল জাতীয় রচনায় "কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া" থাকবে না, 'নভেলি মিথ্যা ছায়া' বলতে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত রোমান্সের আতিশয্যকেই বুঝিয়ে থাকবেন, খ. বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও উপস্থাপনায় "কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায়" যাওয়ার তিনি পক্ষপাতি নন, বরং 'সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস", তারই পরিচয় দানের তিনি পক্ষপাতি, গ. "বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখদুঃখের কথা" বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে।

দুই. নভেল-এর আকার বা আয়তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন[২৬] (১২৯৮-৯৯বঃ) "আমার তো মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যতবড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। .. এক একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রাগান করার মতো।"

তিন. রবীন্দ্রনাথ নভেল-এর বিষয়বস্তুর চিরন্তনতা সম্পর্কে খুব বেশি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি লিখছেন[২৭] : "একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক

২৫. (ক) + (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ছিন্নপত্র/১৯৫৫/যথাক্রমে ১৩ ও ১৫ পৃঃ।
২৬ ও ২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সাহিত্য/১৩৬৮ বঃ/যথাক্রমে ১৮০ ও ১৯৮ পৃঃ।

কথাবার্তা এবং খুচরো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা সেকস্পীয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে শেকস্পীয়র কখনো মিথ্যা হবে না।"

চার. নভেল-রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের রূপায়ণকেই নভেল-এর কাম্য বিষয় মনে করেছেন। একালের নভেল-এর অতি নাটকীয় প্রেম মাত্রই যেন নভেলি ব্যাপার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের বিষয় রূপে মধ্যযুগের সম্ভব অসম্ভব বহু ঘটনারই প্রাধান্য লাভ রবীন্দ্রনাথের নিকট কৌতুককর মনে হয়েছিল। 'রীতিমতো নভেল' ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও তার প্রচ্ছন্ন-বিদ্রুপাত্মক নামকরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নভেল-ভাবনার প্রতিই কটাক্ষপাত করেন।[২৮] যদিও রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেন, কিন্তু তিনি সেই সকল রচনায় ঘটনার প্রাধান্যকে স্বীকার না করে ইতিহাসের নরনারীর মনের গভীর তলদেশকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। এর পরিচয় আছে বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, ডালিয়া প্রভৃতি রচনায়।

পাঁচ. রবীন্দ্রনাথ নভেল-এ সত্যচরিত্র সৃজনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই মনোভাব শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত যুগান্তর (১৮৯৫) উপন্যাসের 'পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত' বিশ্বনাথ তর্কভূষণ চরিত্রটি প্রসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।[২৯] "এমন সত্যচরিত্র বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্জ্বল্যমান দেখিয়াছেন।" সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসের চরিত্র সমূহকে মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন।

ছয়. পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনাবলীতে গ্রথিত চোখের বালি-র সূচনা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত ভাবেই দাবি করেছেন: "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।" রবীন্দ্রনাথ বাংলা নভেল তথা উপন্যাসের প্লট রচনায় ঘটনাপরম্পরার বিবরণের প্রাধান্য

২৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা/১৩৭২ বং/৩৩৯ পৃঃ।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/আধুনিক সাহিত্য/১৩৬২ বং/১০৯ পৃঃ।

সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং এই সচেতনতা নিয়েই তিনি নভেলের প্লটগত বিশেষত্বের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন। এ মনোভাবের পরিচয় আছে চোখের বালির প্লটরচনার পদ্ধতিতে। নতুন পদ্ধতির বিশেষত্বটি হলো অন্তর্জীবনভাবনার বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ নভেল রচনার ক্ষেত্রে নীতিগত ভাবে অন্তর্জীবন প্রকটনে বিশ্বাসী ছিলেন।

সুতরাং বাঙালির নভেল রচনা সম্পর্কে যে-সচেতনতা তার প্রথম প্রকাশ বিগত শতকের মাঝামাঝি। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা এবং সমালোচকগণের দৃষ্টিতেই সেকালের নভেল-ভাবনার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হলো।

প্যারীচাঁদে যার সূত্রপাত, বঙ্কিমচন্দ্রে যার বিকাশ ও বিস্তার, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি-তে পৌঁছে সেই বাংলা নভেল-এর একটি নতুনতর পর্যায় সূচিত হলো। এই নবপর্যায়ের সূচনামূলে প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রস্তুতি কাজ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অন্তর্জীবনের বিশদ পরিচয় ও বিশ্লেষণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথে এসে আমরা পেয়েছি অন্তর্জীবনের পরিচয়বহ উপন্যাসের সিদ্ধরস : মানবজীবনের অন্তরের আলোকে তা আলোকিত।

—উপন্যাস-এর শব্দার্থ ও তার শিল্পসত্তা—

যখন বাংলায় কথাসাহিত্য গড়ে উঠছে তখন একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতির পরিচয় দানের জন্য 'উপন্যাস' শব্দটি গৃহীত হয়েছিল, অথবা গতানুগতিকভাবে এসে গিয়েছে, কিংবা নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপেই এর ব্যবহার ঘটেছে—এই সবকিছুই বর্তমান পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। 'শব্দ' একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা ভাবের দ্যোতক, বিশেষত শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে। আলোচ্য পর্যায়ে নভেল-এর মতো উপন্যাস-এরও অনুরূপ পর্যালোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

উপন্যাস-এর শব্দার্থ

'উপন্যাস' শব্দটির (ক) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ [উপ(সম্মুখে)-নি-√অস্ (স্থাপন করা) —অ,ঘঞ্) ভাঃ] হলো 'সম্মুখে স্থাপন' বা 'সমীপে স্থাপন'। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ একটি উদাহরণ আছে—'পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ' (বিশ্বাস পূর্বক অন্যের নিকট স্বদ্রব্যস্থাপন); (খ) ভাবের দিক থেকে সম্প্রসারিত অর্থ হলো 'বচনের উপক্রম' বা 'বচনারম্ভ' ('উপন্যাসস্ত বাঙ্মুখম্'— অ.কোষ)

পরে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'উল্লেখ-উদাহরণ-প্রস্তাব' (ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্ত বাক্যমীমাংসা'—শারীরক ভাষ্য)[৩০]।

প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত তথ্যসমূহও উদাহৃত হচ্ছে—

এক. উপন্যাস—"বাক্যোপক্রমঃ। তাৎপর্য্যায়ঃ। বাঙ্মুখং। ইত্যমরঃ॥"[৩১]

দুই. উপন্যাস—"উপন্যাস ও বাঙ্মুখ শব্দে বচনোপক্রম (বাক্যারম্ভ) বুঝায়। ১। উপন্যাস—পুং (উপ-নি- √অস্+ঘঞ্, করণ) বাক্যের প্রথম স্থাপন হয় ইহা দ্বারা। ২। বাঙ্মুখ—ক্লীং বাক্যের মুখ (প্রথম)।"[৩২]

তিন. উপন্যাস—"উল্লেখ, দান, প্রস্তাব, বাক্যের আরম্ভ। Reference, gift, proposal."[৩৩]

লক্ষনীয় যে, গত দেড় শতাব্দীতে বাংলায় 'উপন্যাস' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং 'উপন্যাস' নতুন অর্থ গৌরব লাভ করেছে। এ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোষকার যোগেশচন্দ্র রায়ই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে বাংলাতে উপন্যাস-এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বসেছে।[৩৪]

সুতরাং এরপর আর বলার প্রয়োজন থাকে না যে উপন্যাস-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী, কীই বা তার শাব্দিক পরিচয় এবং কীই বা তার শিল্পসত্তা।

শিল্পশৈলী রূপে 'উপন্যাস'

বাংলা কথা সাহিত্যের গোড়া থেকেই গল্পমূলক রচনাসমূহ উপন্যাস নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। এবারে বাংলায় উপন্যাস শব্দের কালানুক্রমিক ব্যবহারিক তাৎপর্য খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের রচনা থেকে উদাহৃত হলো—

ক. বাংলা কথাসাহিত্যে রচনার নামকরণ রূপে উপন্যাস শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১৮১০এ। নীলমনি বসাক Arabian Nights Tales-এর গদ্যানুবাদের নামকরণ করেন আরব্য উপন্যাস এবং পরবর্তী Peraian

৩০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়/বঙ্গীয় শব্দকোষ—১ম খণ্ড/সাহিত্য আকাডেমী সংস্করণ, ১৯৬৬/ ৪২৫ পৃঃ।

৩১. শব্দকল্পদ্রুম—১ম খণ্ড/১৯৩১ সংবৎ/৬৬৮ পৃঃ।

৩২. অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য (সম্পা)/অমরকোষঃ (অনুবাদ সটীক) ১৮০২/১০২-১০৩ পৃঃ।

৩৩. A Tri-Lingual Dictionary, Calcutta Sanskrit College. 1966. p. 80.

৩৪. যোগেশ চন্দ্র রায়/বাঙ্গালা শব্দকোষ—বাঙ্গলা ভাষা,২য় ভাগ/১৩২০.বঃ/৭৫ পৃঃ।

Tales-এর অনুবাদের নামকরণ করেন পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬) ; এই দুই ক্ষেত্রে আরব্য ও পারস্য দেশের কাহিনী বা উপাখ্যান অর্থে 'উপন্যাস' শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। এই পারস্য উপন্যাস-এর ভূমিকায় উপন্যাস শব্দটি গল্পরস অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে : "এই সকল উপন্যাস 'পারস্য ইতিহাস' সংজ্ঞায় পূর্ব্বে পদ্যছন্দে প্রকাশ হইয়াছিল এবং যদিও তাহাতে পাঠকগণের অনাদর দেখা যায় নাই, কিন্তু এই প্রকার উপন্যাস গদ্যেই ভাল হয়।"

খ. আলালের ঘরের দুলাল-এর ভূমিকা(১৮৫৮)-য় প্যারীচাঁদ মিত্র সম্ভবত গল্পরস অর্থে এবং নভেল-এর প্রতিশব্দরূপে 'উপন্যাস' শব্দটি ব্যবহার করেন। "অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে সম্ভবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশলোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপন করিতে রত নহে সে স্থলে উক্তপ্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।"

গ. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৪০-১৯২৬) ও স্বপ্নপ্রয়াণ(১৮৭২-৭৩)-এ গল্প অর্থেই উপন্যাস শব্দটি ব্যবহার করেন : "কত তিনি শুনাতেন উপন্যাস।" (স্বপ্নপ্রয়াণ-৩২)

ঘ. বঙ্কিমচন্দ্রও কী এর ব্যতিক্রম ? দেখা যাক। এক. ১৮৭৭এ ইন্দিরা-যুগলাঙ্গুরীয় -রাধারানী—এই তিনের সঙ্কলন "উপকথা। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ" নামে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে উপন্যাস ও উপকথাকে সমার্থক মনে করেছেন। দুই. কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী সমূহকে উপন্যাস বলেছেন: "কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জন সমাজে প্রচলিত আছে তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা অতি বিশুদ্ধ পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, হইাও জানিতে পারিয়াছি।" বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় নভেল অর্থে এখানে উপন্যাস শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তিন. সীতারাম (১৮৯৪)এর শেষ পরিচ্ছেদের শেষে রাম ও শ্যাম-এর কথোপকথনের অংশে উপন্যাস শব্দটি কল্পিত ঘটনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : "রাম ! তুমিও যেমন ! ওসব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।" বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় নভেল অর্থে এখানে উপন্যাস শব্দটি ব্যবহার করেন নি।

ঙ. এবারে রবীন্দ্রনাথ। লক্ষণীয় যে, তিনি চোখেরবালি ও নৌকাডুবি-র 'সূচনা'য় উপন্যাস কিংবা নভেল শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তাঁর রচনায়

নভেল অর্থে উপন্যাস শব্দের ব্যবহার খুব কম দৃষ্ট হয়। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন: "আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে।" তখন উপন্যাস-এর অর্থ কাল্পনিক উপাখ্যান ভিন্ন আর কী? সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপে উপন্যাস শব্দের ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরবর্তী কালে 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে মূল্যায়ন কালে তিনি উপন্যাস শব্দটির পরিবর্তে Romance ও Novel শব্দ দুটি ব্যবহার করেন এবং Romance ও Novel-এর প্রতিশব্দ রূপে যথাক্রমে কাহিনী ও আখ্যান শব্দ দুটি ব্যবহার করেন।[৩৫]

চ. চন্দ্রনাথ বসু ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্য সমালোচক। তিনি নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপে 'কথাগ্রন্থ' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।[৩৬] তাঁর 'নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' নামক প্রবন্ধটি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য এবং প্রবন্ধের নামকরণই তার প্রমাণ এবং তিনিই সম্ভবত প্রথম সাহিত্য সমালোচক, যিনি নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপে উপন্যাস শব্দটির পরিবর্তে কথাগ্রন্থ শব্দটি ব্যবহারে প্রয়াসী হন।

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ ভাবে গল্পরস অর্থেই উপন্যাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গল্পরস আকারে ক্ষুদ্র বা বড়ো, এবং বিষয়ের দিক থেকে কল্পনীয়, অপ্রাকৃত বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত হতে পারে। সাহিত্যের ফর্ম-গত শিল্পসত্তা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, উপন্যাস অনুরূপ কোনো শিল্পসত্তার অধিকারী ছিল না। বরং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শব্দটি ধীরে ধীরে একটি শিল্পগৌরব লাভ করে এবং 'উপন্যাস' শব্দটি 'নভেল' অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে।

—জীবনানুসারী শিল্প: আখ্যান ও উপন্যাস—

রসিকজন সাহিত্যে রসেরই সন্ধান করেন। সৃজ্যমান অবস্থায় বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একদিকে যেমন রোমান্স রসের প্রাধান্য ঘটেছে, অন্যদিকে বস্তুরস ধীরে ধীরে স্বপ্রাধান্য বিস্তার করে রোমান্স রসের একাধিপত্য খর্ব করতে

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শরৎচন্দ্র/প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ বঃ/ কলিকাতা/৮০৬-৮০৮ পৃঃ।

৩৬. চন্দ্রনাথ বসু/পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

সচেষ্ট হয়েছে। যথার্থ সাহিত্যরসিকের নিকট নভেল জাতীয় রচনায় জীবনের বস্তুরসই কাম্য, রোমান্স রস নয়। কারণ প্রকৃত নভেল জীবনানুসারী শিল্প।

কাহিনী ও আখ্যান

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আকারে বড়ো যে-কোনো গল্পই প্রধানত উপন্যাস বলে চিহ্নিত। কিন্তু সব বড়ো গল্পই নভেল নয়। এখন গল্পসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রসবিচারে কাহিনী ও আখ্যান শব্দ দুটির মানকমূল্য ও ব্যবহারিক তাৎপর্য আলোচিত হলো।

রবীন্দ্রনাথই পরিণত বয়সে (১৩৩৮ বঃ) গল্পসাহিত্যের আলোচনায় কাহিনী ও আখ্যান শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। এই শব্দ দুটির ব্যবহারে সম্ভবত তিনি ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। রোমান্স রস যে-গল্পসাহিত্যের প্রাণধর্ম তাকেই তিনি কাহিনী বলেছেন : "আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্যছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তার রেখার সুষমা, অন্তু পরিচয় নয়, কেবল তার সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা।"[৩৭] ইংরেজিতে এই জাতীয় রসকে বলা হয়েছে রোমান্স। আর পরিচিত জীবনের অভিজ্ঞান রচনা বা স্পষ্টতর জগতের পরিচয় দান তথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই যে-গল্পসাহিত্যের প্রাণধর্ম রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন আখ্যান। এই আখ্যানের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলছেন : "নদীগ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি এক দামের জিনিষ নয়। সৌন্দর্যলোক থেকে এদের কাউকেই বর্জন করা চলে না, তবুও বলতে হবে ঐ জনপদের চেহারায় আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে কাহিনী ও কথা উভয়ের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো— নাও যদি থাকে তবে বস্তুপদার্থের অভাব ঘটলে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছ্বাসটা চোখে দেখতে মানায়, কিন্তু সেটা ভোগে লাগে না।"[৩৮]

এবারে আমরা শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচারে আসছি : এক. কাহিনী [সং কথানক,-নিকা>প্রা. কহাণঅ,-ণিআ>বা (কহানি>কহিনি) কাহিনী ; হি

৩৭ ও ৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

কহানী]-বাংলায় শব্দটি এসেছে হিন্দী কহানী শব্দ থেকে, স্রেফ গাল-গল্প অর্থে[৩৯] —যার বাস্তবধর্মিতা বলতে কিছু নেই বা যার সত্যতা যাচাই করা যায় না, ইংরেজিতে রোমান্স বলতে যা বুঝায়, সেই রোমান্সের কল্পরসই এর প্রাণ। যেমন—'ওমা ঠিক এ যে শুনায় কাহিনী/কাল ছিল রানী, আজ ভিখারিনী'—(কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ)। দুই. আখ্যান[৪০]—বাংলায় শব্দটি অবিকৃত ভাবেই সংস্কৃত থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থ বিচারে শব্দটির দুটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করা যায় : ক. [আ-√খ্যা+অন (লুট্)-ভা] পূর্ব সংঘটিত বিষয়ের উক্তি বা বর্ণন [আখ্যানং পূর্ববৃত্তোক্তি (সা. দ. ৬. ২১১)], স্বয়ং দৃষ্ট বিষয়ের কথন [স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধা (বিষ্ণু পুরাণটীকা)] ; খ. [আ-√খ্যা+অন-র্ম] উপাখ্যান, ইতিহাস, বৃত্তান্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'স্বয়ংদৃষ্ট বিষয়ের কথন'—এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই 'আখ্যান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'খ্যা'-ধাতুর অর্থ বিবৃতি দান, এবং যা আমাদের অভিজ্ঞতা বা পরিচিতির পরিধির মধ্যে আছে।

নভেল : উপন্যাস ও আখ্যান

প্রসঙ্গত সমালোচ্য বিষয়টি দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হলো—এক. নভেল ও উপন্যাস, দুই. নভেল ও আখ্যান।

নভেল ও উপন্যাস : যে-অর্থে ইংরেজি সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পশৈলী বুঝাতে 'নভেল' শব্দের ব্যবহার, বাংলায় 'উপন্যাস' শব্দটি তুল্য অর্থবাচক নয়। বরং পাশ্চাত্ত্যের Prose Fiction-এর অর্থে বাংলায় গল্পরসবাহী যে-কোনো গদ্য রচনাকেই উপন্যাস বলে অভিহিত করা চলে। তা ছাড়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও শিল্পগত দিক সমূহ বিবেচনা না করেই নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপে উপন্যাস শব্দটি সাহিত্যের আসরে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এর দুটি কারণ : ক. আমাদের সাহিত্যে 'নভেল' ব্যাপারটি ছিল না এবং প্রথম প্রথম বাঙালিদের মধ্যে নভেল-এর শিল্পশৈলী সম্পর্কে সচেতনতার অভাবও ছিল। খ. সাহিত্য ও সমাজের যে-বিবর্তিত অবস্থায় ইংরেজি নভেল-এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, আমাদের মধ্যে তদনুরূপ কিছু ঘটে নি। ফলে বাংলা গদ্যের নতুন শিল্পশৈলীটির কোনো যথার্থ নামকরণের গুরুত্ব ও প্রাণের তাগিদ তখনো অনুভূত হয় নি।

৩৯ ও ৪০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/যথাক্রমে ৬২৩ ও ২৩৯ পৃঃ।

নভেল ও আখ্যান : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইংরেজি নভেল-এর রস পরিণতি 'স্বয়ংদৃষ্ট বিষয়ের কথন' ভিত্তিক আখ্যান-এর রস-পরিণতির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু উপন্যাস-এর এই অর্থগৌরব নেই। যে-আখ্যানে মানবজীবনের স্পষ্টতর পরিচয় ও শিল্পিত-বিন্যাস এবং অখণ্ড রূপটি পাওয়া যায়, সেরূপ রচনাই নভেল বলে অভিহিত হতে পারে। এই রূপ আখ্যানমূলক রচনাকে কেন্দ্র করেই নভেল জাতীয় রচনার যথার্থ যাত্রা। এখানেই নভেল-এর সঙ্গে আখ্যান-এর আত্মিক যোগ। বাংলায় নভেল জাতীয় রচনার প্রথম রসপরিণতি লাভ ঘটে আখ্যানমূলক রচনা বিষবৃক্ষ (১৮৭২)এ।

বস্তুত এতদ্‌সম্পর্কে আমরা তিনটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি :
ক. 'উপন্যাস' ও 'নভেল' সমার্থক নয়, খ. বাংলা সাহিত্যে নভেল-এর প্রতিশব্দ রূপে বা পরিপূরক মানক শব্দরূপে উপন্যাস শব্দটি গৃহীত হয়নি, গ. দৃশ্যমান জীবনের শিল্পিত-বিন্যাস অর্থে নভেল-এর প্রতিশব্দরূপে 'আখ্যান' শব্দটির ব্যবহার অনেকাংশে যুক্তি সঙ্গত।

নভেল কী, নভেল-এর শিল্পতাৎপর্যই বা কী—এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনার শেষে আমরা নভেল-এর অপেক্ষিত কথাবস্তু তথা নরনারীর জীবনরহস্য সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করছি। কারণ বাংলা সাহিত্যে নভেল জাতীয় শিল্পচেতনার বিকাশের অনুকূল জীবনধারা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে বর্তমান ছিল কী না, তা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের গবেষণার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে।

৩. বাঙালি নরনারীর জীবনবোধ

নরনারীর পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক, তাদের যৌথ জীবন তথা দাম্পত্য সম্পর্ক সামগ্রিক ভাবে নরনারীর জীবনবোধ রূপে অভিহিত হতে পারে। নরনারীর মিলিত জীবনবৃত্ত, তাদের গভীর জীবনস্পৃহা ও মানবিক চেতনাই এই জীবনবোধের বিভিন্ন দিক। এই জীবনবোধ প্রধানত জীবনের কোনো বহিরঙ্গ বিষয় নয়, বরং একে মানব জীবনের অন্তরঙ্গ বিষয় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে 'বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে'র ক্ষেত্রে আলোচ্য অধ্যায়ের গুরুত্ব কোথায়? গুরুত্ব নভেল তথা উপন্যাসের বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রে। জীবনানুসারী সাহিত্যরূপে নভেল-এর একমাত্র লক্ষ্য হলো জীবনের যথাযথ রূপায়ণ[১], নভেল জাতীয় রচনার এই জীবনায়ন নরনারীর অন্তর্জীবনের সার্থক প্রকটনের দ্বারাই সম্ভব। নরনারীর যৌথ জীবনের বিভিন্ন আবেগ, উচ্ছলতা, সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হলো নরনারীর অন্তর্জীবনের বিষয়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর নরনারীর অন্তর্জীবনের কথাই বর্তমান অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় রূপে পরিগণিত হয়েছে।

নিছক ঘটনার বিবৃতি নভেল-এ থাকবে না। এই কারণেই নরনারীর জীবনের বহিরঙ্গ বিষয় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ বিষয় সমূহ নভেল-এ অধিক প্রাধান্য লাভ করে, বিশেষত প্রণয়। সার্থক প্লট সৃষ্টির মাধ্যমে এই অন্তর্জীবনের যথার্থ পরিস্ফুটনই হলো নভেল জাতীয় রচনার বিশেষত্ব। এই সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি লেখকগণও সচেতন ছিলেন।[২] বস্তুত নরনারীর মন নামক অপ্রত্যক্ষ বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ রূপদানই হলো নভেল-এর গল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এর জন্য নভেল রচয়িতাকে গভীর জীবন বীক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টি শক্তির অধিকারী হতে হয়।

বস্তুত সমসাময়িক জীবনবোধ নিয়েই নভেল জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এই নভেল জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠার পথে আমাদের সমসাময়িক জীবনবোধ কোন পর্যায়ে ছিল এবং এই জীবনবোধ নভেল রচনার পক্ষে কতখানি অনুকূল ছিল, তা ভেবে দেখতে হবে এবং এই ভাবনা অবশ্যই উনবিংশ

১. James, Henry. op. cit. দ্রঃ বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধের ৩০পৃষ্ঠায় হেনরী জেমস-এর উদ্ধৃতি।

২. চন্দ্রনাথ বসু/দ্রঃ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ বসুর উদ্ধৃতিটি। প্রসঙ্গত বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধের ৩২ পৃষ্ঠার এন্টনি ট্রলপ-এর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিও অনুধাবনীয়।

শতাব্দীর পটভূমিতে। আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান বিষয়টি কয়েকটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদে বিভক্ত হলো।

—দাম্পত্য জীবনবোধ : যুগে যুগে—

দাম্পত্য সম্পর্কের বিশেষত্ব কী এবং নরনারীর প্রণয়ের সঙ্গে এই দাম্পত্য সম্পর্কের কী সম্পর্ক এই সম্বন্ধে সমাজ বিজ্ঞানীরা কী ভেবেছেন তা বর্তমান প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত আমরা হেভলক এলিস-এর স্মরণ নিতে পারি : "The recognition of individual freedom, the allowance for difference of tastes and of disposition even when there is a fundamental unity of ideals, the perpetual call for mutual consideration, the acceptance of other's faults and weaknesses with the acknowledgement of one's own, and the problem of overcoming that jealousy which because it is rooted in Nature everyone has in some form and at some time to meet—all these difficulties and the like exist even apart from sex in the narrow sense. Yet they are a large part, even the largest part, of the art of love."[৩] বস্তুত নরনারীর প্রণয়ই এই দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি। এই প্রেম বা প্রণয়কে বাদ দিয়ে নরনারীর সুস্থ দাম্পত্য জীবন কল্পনা করা যায় না। প্রেম চেতনা দুটি নরনারীর মধ্যকার একটি আনন্দময় সত্তা এবং তা তৃতীয়জনের অনুভবের বিষয় নয়। এই প্রেমের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সুস্থ যৌনবোধের পাশাপাশি রোমান্টিক জীবনবোধ, সৌন্দর্যচেতনা এবং আনন্দবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে। লক্ষণীয় যে, এ সবকিছু মধ্যযুগের বাঙালির জীবন ভাবনায় বিশেষ ভাবে দানা বাঁধে নি।

মধ্যযুগে

মধ্যযুগের বাঙালির জীবন আজকের মতো ছিল না। গৌরীদান প্রথা তথা বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা তথা বহুবিবাহ, বিভিন্ন সংস্কার ও অনুশাসনের বন্ধন, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক কাজকর্মে নরনারীর সীমিত যুগ্ম উপস্থিতি, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, জীবনানুরাগ কেন্দ্রিক শিক্ষার অভাব ও

৩ Ellis, Havelock. Psychology of Sex. (Eleventh Printing), N. Y. The New American Library. [Dt. N. F.]. p. 253.

বর্ণশাসিত জীবনবোধ মধ্যযুগের বাঙালি নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থ বিকাশকে কম বেশি প্রভাবিত করেছে। এই সামাজিক পরিবেশে নরনারীর মধ্যে রোমান্টিক জীবনবোধ ও প্রণয়চেতনা সুস্থ প্রকাশপথ পায় নি। বরং তাদের জীবনবোধে কাম(lust)-চেতনাই কাজ করেছে এবং এই কামচেতনা অনেকাংশেই যৌবনের তাড়নাজাত।

মধ্যযুগের দাম্পত্য জীবনে পুত্রসন্তান লাভ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পুৎ নামক নরক থেকে পতিকে উদ্ধারের জন্য পত্নী পতির জন্য পুত্রবতী হতে না পারলে পত্নীর নারীজীবন ব্যর্থ হতো। বস্তুত 'যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব' উচ্চারিত মন্ত্র বাঙালির জীবনে মিথ্যাই ছিল, কারণ হৃদয়ের কোনো যোগ এই মিলনে প্রথমেও ছিল না, পরেও পারিবারিক প্রতিবেশে বিকশিত হয়নি, কেননা একজন পুরুষ বিবাহিত জীবনে ক'জনকেই বা হৃদয় দান করতে পারে এবং এই রূপ সামাজিক প্রতিবেশে কয়জন নারীর হৃদয়মুকুলই বা প্রস্ফুটিত হতে পারে ; মোটের উপর নরনারীর সম্পর্কটা ছিল বহিরঙ্গ নির্ভর এবং বিবাহটা অনেকাংশে দাম্পত্য জীবন (individual partnership)-নির্ভর না হয়ে পারিবারিক মেলবেন্ধনে রূপান্তরিত হয়। মধ্যযুগের সাহিত্য থেকেই এই জীবনালোকের সন্ধান পেতে পারি।

রোমান্টিক জীবনবোধ ও প্রেমচেতনার জন্য যে-অনুকূল কন্যাজীবনের প্রয়োজন, মধ্যযুগের বাঙালি জীবনে সেই কন্যাজীবনের অবস্থাটি কিরূপ ছিল তা ভেবে দেখা যেতে পারে। বাঙালি জীবনে রমনীও ছিল, কামকলাও ছিল। কামকলা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না, তার প্রমাণ বাঙালি কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলী, সমধিক বিস্ময়কর বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন সূক্ষ্ম রসপর্যায় ও শ্রীরাধার প্রেমের ক্রমবিকাশ। আর পূর্বরাগ—এতো নরনারীর মন দেয়ানেয়ার প্রথম পালা, পদকর্তারা এই রসপর্যায়ে ডুব দিতে পেরেছেন, হৃদয় দিয়ে একে অনুভব করতে পেরেছেন তাইতো প্রেমের পূর্ণতায় ও বিকাশ-স্তরে পূর্বরাগের পরপর এসেছে অনুরাগ-মিলন-বিরহ, কিন্তু পাশ্চাত্যের অভিধানে নেই প্রেমের এই রসবৈচিত্র্য, নেই পূর্বরাগ বা অনুরাগের যথার্থ কোনো প্রতিশব্দ। এই জীবন সম্পর্কিত সূক্ষ্মরসবোধের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য যে মধ্যযুগের বাঙালি জীবনে নরনারীর প্রেমচেতনার কোন ব্যাপক ও গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পায় নি। সেকালের বাঙালি সাহিত্য থেকে রূপজ ও কামজ প্রেমের কথা পাঠ করেই তৃপ্ত

হয়েছে, কিন্তু নিজের জীবনের সঙ্গে তার কোনো সাঙ্গীকরণ হয়ে ওঠে নি এবং সাধারণ ভাবে বাঙালির জীবনচর্যায় তার কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি। মধ্যযুগের বাঙালি জীবনে পূর্বরাগ ছিল না, হয়তো ছিল উত্তররাগ। বাল্যবিবাহ এর প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু তাই বলে বিবাহ-উত্তর প্রেম তথা উত্তররাগও স্বাভাবিক ভাবে প্রস্ফুটিত হয় নি, কারণ বহুবিবাহ। কৌলীন্যপ্রথা এই বহুবিবাহকে আরো খারাপ অবস্থায় নিয়ে যায়। কৌলীন্যপ্রথায় বিবাহটা একটা অসুস্থ ও ভয়ঙ্করজনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা একটি বৃদ্ধের সঙ্গে তার বালিকা কন্যাকে বিবাহ দিতে দ্বিধাবোধ করে নি। পরবর্তীকালে হয়তো এই সকল ঘটনাদৃষ্টে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' প্রবাদটি রচিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কুলীনদের পত্নীর সংখ্যা ছিল অগুনতি। ফলে কুলীন সমাজে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কচিৎ দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অধিকন্তু বাঙালি জীবনে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাৎ দিনের আলোতে নয় রাত্রির অন্ধকারে। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে একরাত্রেই একাধিক পত্নীর শয্যাসঙ্গী হতে হতো। আজকের দিনে এই সকল অবিশ্বাস্য মনে হলেও মধ্যযুগের সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০)-এর অন্নদামঙ্গল কাব্যে এইরূপ একটি ঘটনার কথা আছে।

ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী, চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। ভবানন্দ দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম রাত্রেই দাম্পত্য সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। কারণ দীর্ঘদিন পরের এই মিলন রজনীতে দুই পত্নীই সমান দাবীদার—

'শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইল।
কার ঘরে আগে যাবে ভাবিতে লাগিল॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥
একচক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আরচক্ষু রাঙা হয়ে বড়জনে চায়॥'

শেষ পর্যন্ত ভবানন্দ বড়র মন রক্ষা করেন—

'ছেলেপিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমর্পিলা বড়র বাসর॥'

এরপর আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে মধ্যযুগে দেহজকাম কামোত্তীর্ণ প্রেমে উন্নীত হতে পেরেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতে নারীহৃদয়ের যন্ত্রণা রূপসী চণ্ডীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে দেখা দিলেও তা মূলত প্রেমজ নয়—সতীনের সঙ্গে ঘর করার দুঃসহ জ্বালার আশঙ্কা থেকেই ফুল্লরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল—

'পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥'

সুতরাং প্রেমত দূরের কথা, কামও অপূর্ণ থাকে।

মধ্যযুগের বাঙালি জীবনের এই দাম্পত্য অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীতে মোটামুটি অপরিবর্তিত অবস্থায় এসেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের একটি দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরে বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। রাত্রে স্বামীস্ত্রীর একান্তে কথোপকথন প্রসঙ্গে রেভা লালবিহারী দে লিখেছেন[৪]: "এই প্রকার কথোপকথন করিতে২ উভয়েই নিদ্রিত হইলেন, কেননা এতদ্দেশীয় রামাগণ রজনী ব্যতীত ভর্ত্তার সহিত নিশ্চিন্তে কথা কহিবার আর সুযোগ পান না। দিবসে পাকাদি ও গৃহকার্য্যে নিযুক্তা থাকেন আর অবসর পাইলেও লজ্জাপ্রযুক্তা স্বামীর সহিত একত্রে বসেন না ও অধিক কথাও কহেন না। যে-তরুণী দিবাভাগে পতির সহিত কথোপকথন করেন তাহাকে প্রতিবাসিরা বিশেষতঃ স্থবিরাগণ শিথিলা কহেন।" এই ছিল সাধারণ বাঙালি ঘরে দাম্পত্য জীবনের বিশেষত্ব।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আমাদের সমাজে পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগে। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের দ্বারা চালিত হয়েই নব্যবঙ্গীয়েরা এই পরিবর্তন আনয়নে উদ্যোগী হন। বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার প্রচলনে শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালির দাম্পত্য জীবনের অবস্থাটা সুস্থ ছিল না।[৫] বহু সতীনের ঘরে

৪. লালবিহারী দে/চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান—দেবীপদ ভট্টাচার্য্য (সম্পাঃ)/রেভারেণ্ড লালবিহারী দেও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান/১৯৬৮/৫ পৃঃ।

৫. বর্তমান প্রসঙ্গে কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কিত একটি তথ্য তত্ত্বোধিনী পত্রিকা থেকে উদাহৃত হলো: "এখনকার ভঙ্গ কুলীনেরা বিবাহকে যেমন জীবিকা লাভের উপায়মাত্র মনে করিয়া এক এক ব্যক্তি শতাধিক নারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং হয়তো তাহার মধ্যে কস্মিনকালেও ঊনশত নারীর মুখাবলোকন করেন না. . ।" [দ্রঃ তত্ত্বোধিনী পত্রিকা (ভাদ্র ১৭৭৮ শক/১৫৭ সংখ্যা)—বিনয় ঘোষ (সম্পাঃ)/সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য় খণ্ড/১৯৬৩/১৯২ পৃঃ।]
শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) দাম্পত্য কলহ এড়াবার জন্য দুই পত্নীকে গৃহে রেখে রাত্রে অন্যত্র শয়ন করতেন। [দ্রঃ শিবনাথ শাস্ত্রী/আত্মচরিত/১৩৫৯ বঃ/১১৩ পৃঃ।]

অনেক প্রতীক্ষার পর কোনো এক রাত্রে ভোগোন্মত্ত স্বামীর দ্বারা স্ত্রী তার নারীত্ব লুণ্ঠিত হতে দেখেছে মাত্র বা কুলীনের ঘরে নারী লজ্জার মাথা খেয়ে হয়তো নিবেদন করেছে : আমার এই দেহখানি তুলে ধর। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, প্রসঙ্গত পূর্ববর্ণিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঘটনাটি স্মরণ করতে পারি। এমতাবস্থায় দাম্পত্য প্রণয়ের কোনো বস্তুমূল্য থাকতে পারে না। একই কারণে সহমরণ-প্রথা স্বামীস্ত্রীর প্রেমভালবাসার প্রতীক ছিল না, কিংবা পত্নীর নৈতিক পতিপ্রেম বা পাতিব্রত্যের দ্যোতকও ছিল না।

এই জীবনবোধে পরিবর্তন আনয়নে একালের বুদ্ধিজীবী মহল সক্রিয়ভূমিকা পালন করে। এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নীরব ছিলেন না[৬] : "এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়। যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।" এইরূপ সম্পর্কের ফলে "অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।"

এই দাম্পত্য জীবনবোধকে সুখকর করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তার মধ্যে অন্যতম। দাম্পত্য জীবনের সুখ ও স্ত্রীশিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—এই সম্পর্কে একালের নব্যবঙ্গীয়েরা বিশেষ ভাবে সজাগ ছিলেন। সুখী জীবনযাপনের জন্য পুরুষের শিক্ষিত রমণীর সাহচর্যের প্রয়োজন ছিল : নারী তাদের কাছে শুধু শয্যাসঙ্গিনী নয়, নর্মসহচরীও। এই কালের নারীমনের ভাবনা দিয়েই আলোচ্য প্রসঙ্গের শেষ টানছি[৭] : "আমাদিগের দেশ হইতে দাম্পত্য প্রণয় প্রায় তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহেই দম্পতি কলহরূপ বিষম বিষ প্রবেশ করিয়াছে। দম্পতির মধ্যে যথার্থ প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, দম্পতি পরস্পরের

৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর/বাল্যবিবাহের দোষ—বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড/১৯৭২/৫ পৃঃ।

৭. কৈলাসবাসিনী দেবী/হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা/১৮৬৩/৬২-৬৩ পৃঃ।

বাহ্যিক আড়ম্বর ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদির প্রতি তুষ্টিরুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকে, কেহ কাহার আন্তরিক ভাব গ্রহণ করিতে যত্ন করে না, এবং কাহার কি প্রকার অভিপ্রায় তাহা কোনরূপেই ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। হায়! যেখানে উভয়ে অভেদাত্মা ও এক ব্যবসায়ী হইয়া যাবজ্জীবন একত্রে সহবাস করিতে হয়, সেখানে উভয়ে লুকচুরি খেলিলে কি প্রকারে যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাব হইতে পারে, এবং কি প্রকারেই বা নারীগণ পাতিব্রত্য ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে।" —শতাব্দীর মধ্যাহ্নে একথা লিখেছেন একজন বাঙালি রমণী। স্বীয়জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখিকা তৎকালের নরনারীর বিবাহিত জীবনের করুণ পরিণতির কথা বিবৃত করেছেন। আমাদের ধারণার সঙ্গে লেখিকার বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই।

বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে স্বামীস্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। প্রচ্ছন্ন জবরদস্তির মনোভাব এই সম্পর্কের মধ্যে কাজ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর উপর পুরুষের অধিকারটা ছিল যেন জন্মগত। বিজিত যেরূপ বিজেতার প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়, সেরূপ বিবাহিত জীবনে নারী পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। নরনারীর এই দাম্পত্য সম্পর্কের ঐতিহ্য বহন করেই বাংলা নভেল-এর যাত্রা—নগেন্দ্র-সূর্যমুখী গোবিন্দলাল-ভ্রমর এই দাম্পত্য সম্বন্ধের চিত্ররূপ, এখানে নারী পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, নারীর অধিকার বিষয়ে তারা সোচ্চার নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ (১৯২৯) উপন্যাসের মধুসূদন-কুমুদিনীর সম্পর্ক তদনুরূপ হলেও কুমুদিনী তার জাগ্রত নারীসত্তা নিয়েই এবং নারীর অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছিল।

—প্রেমচেতনা : জীবনে ও সাহিত্যে—

মধ্যযুগে

জীবনানুসারী সাহিত্যে জনজীবনের প্রতিসরণ ঘটে এবং অতীতের সাহিত্য থেকে আমরা অতীত জীবনলোকের আলোক পেতে পারি। বাঙালি জীবনে রোমান্টিক প্রণয়ের অস্তিত্ব ছিল কী না বা এই রোমান্টিক প্রণয়ের স্বরূপ কিরূপ ছিল, মধ্যযুগের বাঙালির লোকজীবনের সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা না থাকায় এই রোমান্টিক প্রেমের কোন সঠিক পরিচয় এক সাহিত্য ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভারতীয় ঐতিহ্যে রোমান্টিক জীবনবোধের পরিচয়

থাকলেও অনাধুনিক বাঙালির জীবনচর্যায় এই রোমান্টিক জীবনবোধের বিশেষ কোন অভিপ্রকাশ ঘটেনি। তবে কী সেকালের বাঙালি এই জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত ছিল না? বাঙালি রমণী কী শুনতে পায়নি বৈষ্ণবের রাধা কি বলেছে? কৃষ্ণানুরাগিণী রাধা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে উচ্চকিত ভাবে বলতে পেরেছিল—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

কারণ—রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

এবং এই রাধাই মিলনান্তে বলিষ্ঠভাবে বলতে পেরেছে—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

গভীর জীবনবোধে উচ্চকিত রাধার বাঙ্‌ময় রূপ আমরা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে দেখেছি। শুনেছি তার জীবনের গভীর ক্রন্দন। কিন্তু এই রাধাকে আমরা আপনজন করে নিতে পারি নি এবং বাঙালি নারীর জীবনবোধও রাধাময় হয়ে উঠতে পারে নি। এর কারণ বৈষ্ণবের রাধা এবং বাঙালি রমণীর মাঝখানে ছিল একটি ধর্মীয় চেতনার অনতিক্রম্য আড়াল। বাঙালি নারী-পুরুষ রাধাকে ধর্মীয় প্রতীক রূপে ধারণা করেই আনন্দ পেয়েছে।

তবে কি মেনে নিতে হবে যে বাঙালি জীবনে আদৌ প্রেমের অস্তিত্ব ছিল না, ছিল না নরনারীর কোনো হৃদয়-সম্পর্ক? ছিল সুপ্ত অবস্থায়, জাগর অবস্থায় নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা বহিঃপ্রকাশে সচেষ্টও ছিল। এর মধ্যযুগীয় প্রমাণ আছে বিভিন্ন লোক-গীতিকায়, লোকজীবনের প্রণয়কাব্য রূপে এই সকল লোক-গীতিকা রচিত হয়। আজকের মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা এই সকল

লোক-গীতিকার প্রামাণিক রূপ। মহুয়া মলুয়া ভেলুয়া কাজলরেখা কমলার কাহিনী আজো আমরা আগ্রহ ভরে শুনি ; কেন শুনি, নিশ্চয় এর এমন কোনো জীবনরস আছে যা শাশ্বত এবং অভিনবও। কিন্তু এর অভিনবত্ব কোথায় ? অভিনবত্ব এদের বিষয়বস্তুতে। "প্রায় সব কাহিনীর কথাবস্তু প্রেম, প্রেমের বেদনা, দুটি একটি কাহিনীতে অতি প্রত্যাশিত মিলন। এই কাহিনীগুলি কোন পুরাণ, কোন ধর্মশাস্ত্রের থেকে নেওয়া নয়। হয়ত তাই এক উদ্দাম যৌবনরসে দীপ্ত এর চরিত্রগুলি। ...এক নিগূঢ় মর্ত্যপ্রীতি কাহিনীগুলিকে এ যুগের মনের অতি কাছে এনেছে। কামনাগুলি সুস্থ ও প্রবল, আসক্তি তীব্র এবং প্রচণ্ড, বেদনা বড় নিদারুণ ও দার্শনিক বোধে নিষ্পিষ্ট নয়—অর্থাৎ মানবিকতার স্পন্দন এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকট।"[৮] অনৃ-আর্য জীবনে রোমান্টিক প্রেম সম্ভব হয়েছিল একটি কারণেই, এদের সমাজ-জীবন বর্ণপ্রধান হিন্দু সমাজ-জীবনের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল, বর্ণশাসিত সমাজের অনুশাসন এদের সাবলীল জীবনবোধকে প্রভাবিত করতে পারেনি। বাঙলাদেশে মুসলমান আগমনের পর ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্ণ হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল জীবননীতি অনুসরণ করে এবং স্মার্ত সংস্কারের দ্বারা রক্ষা পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু বন্ধন-হীন অনৃ-আর্য জীবন উক্ত সংস্কারের অনুপস্থিতিতে মানুষকে বলিষ্ঠ জীবননীতির অধিকারী করেছে। এই সকল কারণে মধ্যযুগে রচিত হলো না বর্ণ হিন্দুদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে কোন মহান কাব্য, সংস্কারের বাঁধনে জীবন যেখানে স্থির, মনের দুয়ার যেখানে বন্ধ, সেক্ষেত্রে সাহিত্যে তার অবশ্য-ম্ভাবী বহিঃপ্রকাশও ব্যহত হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষে আধুনিক যুগের প্রস্তুতি পর্বেও বর্ণশাসিত হিন্দুসমাজ রোমান্টিক প্রণয়চেতনাকে জীবনচর্যার মধ্যে গ্রহণ করতে পারে নি। বরং যা পেল তা সমাজকে তলিয়ে দেবার মতো। বাল্যবিবাহের ফলে বিবাহিত জীবনে প্রেম বা প্রণয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং ব্যক্তি-জীবনে রোমান্টিক জীবনবোধের অভাবে ও বহু সতীনের ঘরে নরনারীর জীবনে উত্তররাগের অবকাশ ছিল কম এবং সামাজিক অনুশাসন মতো স্ত্রীও একজনকেই জীবন ও মন উৎসর্গ করতে বাধ্য ছিল, নয়তো সমাজে কলঙ্কিনী হবার ভয় আছে। ফলে স্বামীর পক্ষে সম্ভব হলেও স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীর জীবিতাবস্থায় নতুন করে প্রেম বা প্রণয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৮. শিশির কুমার দাস/বাংলা ছোট গল্প (১৮৭৩—১৯২৩)/১৯৬৩/৩ পৃঃ।

আধুনিক যুগে

এবারে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনের প্রেম-প্রণয়াদির স্বরূপ বিচার করা যেতে পারে। এতদ্‌সম্পর্কে প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হলো। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি সমসাময়িক বাঙালির জীবনে প্রেম প্রণয়াদির বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন[৯]: "লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেননা কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজিকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ কন্যাজীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও এই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন।" অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির কন্যাজীবন রোমান্টিক প্রেমের অনুকূল ছিলনা এবং সেই কালের বাঙালি জীবনে তা বিকশিত হয় নি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং ইংরেজদের জীবন সান্নিধ্যে দু' একটি প্রণয়ের ব্যাপার এই শতকের বাঙালি জীবনে প্রকাশ পেলেও তাকে স্বাভাবিক জীবন সত্য ও সমাজ সত্য রূপে গ্রহণ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই অভিমত প্রকাশ করেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় (১৮৮৬)। এতদ্‌সংক্রান্ত দ্বিতীয় অভিমতটি হলো বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু চন্দ্রনাথ বসুর। তিনি বলেন[১০]: "প্রণয়ের ভাব ইংলণ্ডে একরূপ ও আমাদের দেশে অন্যরূপ। ইংলণ্ডীয়দের মতে প্রণয় হৃদয়ের কার্য। ইংরেজের দেশে ইহা সম্ভব। কারণ বালিকাকাল হইতে যুবতী প্রণয় সম্বন্ধে আপনাকে স্বাধীন দেখিতে পায়। ইহাতে তাহার সমাজে নিন্দা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহের পর হইতে প্রণয়ের অঙ্কুর আরম্ভ হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র কন্যা কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। আমাদের দেশে প্রণয় সমাজ প্রথার অধীন মাত্র। তোমার হৃদয়কে ইহাতে সমাজের বশে চলিতে হইবে।"

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা—বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড/সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১ বঃ/৮৩৭ পৃঃ।

১০ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠায় গৃহীত ২৪ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

লক্ষণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের প্রভাবে বর্ণশাসিত হিন্দু সমাজের একাংশ আধুনিক হয়ে ওঠে। জীবনবোধের দিক থেকে ইংরেজি চশমায় একালের ইংরেজি শিক্ষিতদের নিকট বাঙালি জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার দিকগুলি ধরা পড়ে। এই জীবনবোধের বাস্তবায়নের জন্য বাঙালি নারীর জাগরণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হয় পড়ে এবং বাঙালি নারীকে কেন্দ্র করে একালের শিক্ষিত বাঙালির বিভিন্ন কার্যক্রম ও চিন্তাধারা চালিত হয়, কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালি রমণীর সুখেই বাঙালি পুরুষের যথার্থ সুখ।[১১] এই কারণে তারা রোমান্টিক জীবনবোধের অনুকূলে ও দাম্পত্য জীবন গঠনে নর ও নারীর স্বেচ্ছা মিলনের জন্য প্রয়াসী ছিলেন।

বিভিন্ন বিদেশী পণ্যের মতো নরনারীর প্রণয়ভাবনাও পাশ্চাত্ত্য থেকে ইংরেজদের জীবনচর্যা ও ইংরেজি সাহিত্য মারফত বাঙলা দেশে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর জলবাতাসে বাঙালি জীবনের বীজাকার প্রেম বিদেশাগত জীবন ভাবনার প্রভাবে বাঙালি জীবনে অঙ্কুরিত হয়, একে অবশ্যই বাঙালি নরনারীর রূপান্তরিত জীবনবোধ বলে চিহ্নিত করা যায়। পাশ্চাত্ত্য নরনারীর প্রেমচেতনা হাত বদল হয়ে বাঙালি জীবনে তখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। সদ্য গড়ে ওঠা নগর-জীবন-বৃত্তের এখানে-সেখানে ও স্থূলজীবনবোধের মধ্যে নরনারীর এই প্রেম-চেতনার কুণ্ঠিত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও তা তখনো বাঙালির জীবনচর্যায় সমাজসভ্য হয়ে ওঠে নি।

পাশ্চাত্ত্যাগত রোমান্টিক জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নব্যবঙ্গীয়েরা রোমান্টিক প্রেমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। নব্যবঙ্গীয়দের অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)-এর বিবাহও পূর্ব প্রণয় সঞ্জাত।[১২] খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরপর কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় প্রণয়ে রূপান্তরিত হয় এবং প্রণয়িনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই ঘটনাটি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকের। নব্যবঙ্গীয়দের শ্রেষ্ঠ কৃতী মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)ও চিরাচরিত বিবাহপ্রথায় আস্থাশীল ছিলেন না, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কিছু আগে তাঁর জনকজননী একটি আট বছরের বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করলে, মধুসূদন যাকে

১১. বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের ১১ পৃষ্ঠায় গৃহীত ৩নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১২. শিবনাথ শাস্ত্রী/রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ. ৩য় সংস্করণ/১৩৬২ বঙ্গ/১১৯ পৃঃ।

চেনেন না জানেন না তাকে বিবাহ করতে হবে—এই চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হন।[১৩] পরবর্তীকালে মধুসূদনের অতৃপ্ত রোমান্টিক প্রেমচেতনা পথ পেয়েছিল প্রথমে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে এক ইংরেজ রমণীর মধ্যে, তারপরে তিনি হেনরিয়েটা সোফিয়া নামে এক ফরাসী রমণীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। অবশ্য বলার অবকাশ রাখে না যে মধুসূদনের এই জীবনবোধ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

বাঙালি জীবনের বীজাকার প্রেমবোধ-এর সাক্ষ্য মেলে মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে: বাল্যকালে "একটি সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে তাহার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্কা। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলাধূলা লেখাপড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তাহার পায়ে পায়ে বেড়াইতাম। খেলার ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমার অসুখের সীমা থাকিত না। ঐ বালিকার বাড়ি আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম। ইহার পর আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম..., তখন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গেল।.. এই পাঠদ্দশার স্মৃতি হৃদয়ে বড় মিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।"[১৪] এই ঘটনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের।

আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)-এর প্রেমবিষয়ক 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতাটি স্মরণ করতে পারি। কবিতাটির বক্তব্য বিষয় অচরিতার্থ প্রণয় এবং প্রণয়িনীর বৈধব্য জীবন। 'দুষ্ট দেশাচার'-এর জন্য কবির সঙ্গে তাঁর বাল্য প্রণয়িনীর বিবাহ হতে পারে নি, কিন্তু কবি তাঁর মানসীকে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিকৃত হতে দেখেছেন, নিকট থেকে দেখেছেন তাঁর প্রণয়িনীর বৈধব্য রূপ। কবিতাটির অংশ বিশেষ এখানে গৃহীত হলো।

"অই শশী অইখানে, এইস্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি!
কত বার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি!
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি!

১৩. তদেব/২১০ পৃঃ।
১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী/আত্মচরিত/ ১৩৫২ বং/২৯ পৃঃ। [এই ঘটনাকালে শিবনাথ শাস্ত্রীর বয়স দশ, তাঁর জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, তিনি কলকাতায় আসেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে।]

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবো না।
আরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।
লোক-লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্ধকারে সঁপিল,
অভাগার যত আশা জন্ম-শোধ ঘুচিল।"

—একদিকে ব্যর্থপ্রেমের বেদনা, অপরদিকে একটি ব্যর্থ নারী জীবনের জন্য সমবেদনা ও আক্ষেপ, এ দু'য়ে মিলে কবির জীবনবোধ যন্ত্রণাবিদ্ধ।

সুতরাং বাঙালির জীবনে বীজাকার প্রেমের পূর্ণতা ও প্রকাশ যে রূপান্তরিত জীবনবোধ সাপেক্ষ ছিল তা বলাই বাহুল্য। রূপান্তরিত জীবনবোধে উদ্দীপ্ত মধুসূদনের ক্ষেত্রে রোমান্টিক প্রণয়ের প্রকাশ স্পষ্ট। তাঁর জীবনচর্যায় ও সাহিত্যকর্মে এই রোমান্টিক প্রেমচেতনা অনুস্যূত হয়ে ছিল। আমাদের এই সকল সন্ধান অবশ্যই আমাদের তৎকালীন সাহিত্যভাবনার পটভূমির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই খবর তৎকালীন সাহিত্যভাবনা থেকেও পাওয়া যায়।

নরনারীর হৃদয়রহস্যের উন্মোচনই নভেলের লক্ষ্য। জীবনানুসারী সাহিত্যরূপে নভেলকে সমসাময়িক নরনারীর জীবনবোধকেই অনুসরণ করতে হয়। ফলে নভেল-এর বিষয়ভাবনার সঙ্গে নরনারীর প্রণয়াদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[১৫] নভেল ছাড়া জীবনানুসারী সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও এই প্রেমভাবনার প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রণয়াদিকে বাদ দিয়ে নভেল রচনা যে সঙ্গত নয় তা বিজয়বল্লভ (১৮৬২) উপাখ্যানের রচয়িতা গোপীমোহন ঘোষও জ্ঞাত ছিলেন।[১৬] প্রসঙ্গত 'ইউরোপীয় লোকদিগের কার্যসকল' বলতে তিনি ইউরোপীয়দের কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা, রোমান্টিক জীবনবোধ ও হৃদয়াবেগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিস্তরঙ্গ বাঙালি জীবনে তিনি সে সব কোথায় পাবেন। তাই রূপকথাধর্মী কাহিনী রচনা করেই লেখক সন্তুষ্ট রয়েছেন।

এই ঘটনার ঠিক বারো বৎসর পর Govinda Samanta (১৮৭৪)-এর রচয়িতা লালবিহারী দে নভেল-এর বিষয়বস্তু গ্রহণে রোমান্টিক প্রণয়াদির গুরুত্ব

১৫. প্রসঙ্গত বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের ৩২ পৃষ্ঠায় এন্টনি ট্রলপ-এর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি স্মরণীয়।
১৬. বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বীকার করেও নরনারীর প্রণয়কে আলোচ্য আখ্যানের বিষয় করতে পারেন নি,[১৭] কারণ, এক. বাঙালি জীবনে রোমান্টিক প্রণয়াদির অবকাশ নেই, দুই. individual partnership-এর বিশেষ কোনো অবকাশ সাধারণ বাঙালি জীবনে ছিল না, বিশেষত সন্তানের বিবাহ মাতাপিতারই দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তিন. বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকায় বাঙালি জীবনে বিবাহপূর্ব প্রণয়ের অবকাশ ছিল না বললেই চলে।

অনুরূপ ভাবনার সুস্পষ্ট পরিচয় চন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্যেও পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় বাঙালি জীবনে রোমান্টিক প্রেম সম্ভব হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা বিশেষ কোনো সামাজিক বিশেষত্ব রূপে দেখা দেয় নি। আশ্চর্যের বিষয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যই প্রথম প্রণয় ব্যাপারটিকে সাদরে লালন করে, বাঙালি নরনারী নয়। মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রই পাশ্চাত্ত্যের রোমান্টিক প্রণয়কে তাঁর উপন্যাস রচনার মাধ্যমে বাঙালি জীবনের সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবাহিত ক'রে দিলেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর অনুধাবনকে মনে রেখেই আমরা বলতে পারি যে শতাব্দীর শেষার্ধেও এই প্রেমবোধ তথা প্রণয়চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। কিন্তু এর অনুপ্রবেশ বাঙালি নরনারীর জীবনবোধকে পূর্ণায়ত করতে সাহায্য করেছে। এর জন্য সমাজ-মানসেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর নায়ক-নায়িকার প্রণয়চিত্রের মধ্যে যে-অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর নভেল-এর নায়ক-নায়িকার প্রণয়চিত্র অঙ্কন কালে সেই অসঙ্গতির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি নরনারীর বিবাহপূর্ব জীবনে যে-রোমান্টিক প্রণয়াদি নেই, সমাজে যে-রোমান্টিক প্রণয়াদির আদর্শ নেই, বাঙালি নরনারীর জীবন সম্পর্কিত এই সত্যকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নভেল সমূহে অনুসরণ করেছেন।

—সামাজিক জীবনে নারী—

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালির জীবন-বৃত্ত সংস্কারবন্দী ছিল, নারী ছিল গৃহবন্দী, বিশেষত উচ্চবর্ণে ও বনেদী পরিবারে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গৃহের ভিতরে ও বাইরে গৃহবধূর যে-সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল,,

১৭. বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মুসলিম শাসনকালে নারীর সেই মর্যাদা বিনষ্ট হয়[১৮] এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিতে বাঁধা অভিজাত ও ধনী পরিবারে মুসলমান নবাবদের দৃষ্টান্তে বহুবিবাহপ্রথা, নারীকেন্দ্রিক দুশ্চরিত্রতা এবং রমণীদের মধ্যে অবরোধ প্রথা দেখা দেয়।

অজ্ঞানতা, সংস্কারের বেড়াজাল, বাল্যবিবাহ এবং স্ত্রীজাতি সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'স্ত্রীপুরুষের সত্যকার সামাজিক মেলামেশা' ভদ্র বাঙালি সমাজে চালু ছিল না এবং তা সম্ভবও ছিল না। আলোচ্য প্রসঙ্গে হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্সের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)-এর অংশবিশেষ গৃহীত হলো। বাঙালি স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলামেশা প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন : অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে আলাপাদিতে "বাঙালী স্ত্রীলোকেরা যে একেবারে ইংরাজ বিবির ন্যায় হয় আমার তো এমত বাঞ্ছা নাই; কেননা তাহারা পুরুষদের সহিত হিতজনক আলাপ করিতে চাহিলে এক প্রকার লজ্জার আবশ্যক আছে, কিন্তু সেই লজ্জা ঘোমটা দ্বারা নয়, বরং মনের শুদ্ধতা দ্বারা প্রকাশ পায়। যে স্ত্রীর এমত লজ্জা থাকে, সে কখন কোন পুরুষের সাক্ষাতে অপবিত্র বাক্য ও মন্দ কৌতুকের কথা কহিবেন না,...। ক্রমে তাহারা (নারী) যখন ইংরাজদের বিদ্যাদি শিক্ষা করিবে, তখন তাহারাও আমাদের মতো হইয়া উঠিবে; কিন্তু বোধ হয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে আর একশত বৎসর লাগিবে।"[১৯] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সামাজিক পটভূমির বিচারে শ্রীমতী ম্যলেন্সের অনুধাবন যথার্থ।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও অপরিচিত স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা খুব স্বাভাবিক ছিল না। ছয়ের দশকের কলকাতায় "মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজা বন্ধ পাল্কির হাঁপ ধরানো অন্ধকারে।......কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে।"[২০] এবারে খোদ ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলের কথা বিবৃত হচ্ছে।[২১] বিলেত যাবার প্রাক্কালে (১৮৬২ এর

১৮. Chaudhuri, Nirad Chandra. Social life and our women—The Sunday Statesman, Magazine Section, Calcutta, May 25, 1969. p. 1.

১৯. হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স/ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৩৬৫ বঃ/২৮-২৯ পৃঃ।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ছেলেবেলা/১৩৫৫ বঃ/৭ পৃঃ।

২১. Majumdar, Biman Bihari. Heroines of Tagore. 1968. p. 205.

মার্চ) বন্ধু মনমোহন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্ত এসেছিলেন। এই পরিচয় ঘটেছিল পরিবার-পরিজনদের অজ্ঞাতে এবং রাত্রির অন্ধকারে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শয়নকক্ষে মশারির ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু এই দুই অপরিচিতের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় নি, বরং মনমোহনকে দেখে জ্ঞানদানন্দিনী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। যখন উদারপন্থী ব্রাহ্ম-পরিবারেই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মানসিক অবস্থা, তখন রক্ষণশীল ও সাধারণ পরিবারের নরনারীর সম্পর্কে আর অধিক কী আশা করা যায়।

বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল ভূমিকার ফলে বাঙলা দেশের সমাজের উচ্চস্তরে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলামেশা আরম্ভ হলেও তা ছিল সীমিত। শতাব্দীর শেষপর্যায়ে বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি স্ত্রীপুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে দেয়। এই বাড়ীর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী স্বাধীনতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রায় তাঁরই উৎসাহে পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী সঙ্গে যান এবং পর্দা প্রথা ভাঙেন। এই বাড়ির সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই পরিবারের কন্যা ও বধূরাই ঘরের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীদের প্রতিষ্ঠা লাভে নেতৃত্ব দান করেন। তাঁদের উদ্‌যোগে বাঙালির জীবনচর্যায় ভারতীয় জীবনবোধ সমাদৃত হয়।

বাঙালি নারীর সামাজিক জীবনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ার ফলেই নারীসত্তার জাগরণ ঘটে। ঘর থেকে বাইরে যেদিন নারী পদার্পণ করলো, সেদিন নারীর স্বচ্ছন্দ বিহারিণী শক্তি প্রকাশ পেল। রোমান্টিক জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলেই তাদের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। একদিন পুরুষ যাকে ভোগের বস্তুরূপে ব্যবহার করেছে, এখন স্বাধিকার অর্জনের পর, সেই নারী তার বিজয়িনী রূপ প্রকাশে উন্মুখ হয়েছে। অবশ্য বাঙালি নারীর এই বিজয়িনী রূপ উনবিংশ শতাব্দীতে নয়, বিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়।

—সত্তার জাগরণ—

নরনারীর জীবনবোধের রূপায়ণে নারীসত্তার ভূমিকা কতখানি তা ভেবে দেখা যেতে পারে। সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক নরনারীর পারস্পরিক জীবনানুভূতির উপর নির্ভরশীল। উনবিংশ শতাব্দীতে গতানুগতিক বাঙালি জীবনে নারীর নারীত্ব আজকের মতো নিশ্চয় শ্রদ্ধার বিষয় ছিল না।

পরবর্তী স্তরে বিবর্তিত সমাজ-পরিবেশে বাঙালি নারীকে এই শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়।

আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে কি নারীর এই স্বকীয় জীবনবোধের পরিচয় নেই? আছে। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছিলেন যে নরনারীর মিলনে কে অধিক সুখী। তখন ভীষ্ম একটি কাহিনী বলেন। রাজা ভঙ্গাস্বন পুত্রকামনায় অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে একশত পুত্র লাভ করেন, এর ফলে ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হন এবং ভঙ্গাস্বন রমণীরূপ লাভ করেন। দুঃখে রাজা বনবাসী হন এবং সেখানে এক ঋষির ঔরসে স্ত্রীরূপী রাজা একশত পুত্রের জন্ম দেন। তখন ভঙ্গাস্বন এই একশত পুত্রকে পূর্বের একশত পুত্রের নিকট নিয়ে দু'শত পুত্রকে মিলিত ভাবে রাজ্যভোগের পরামর্শ দেন। কিন্তু এবারেও ইন্দ্র পুত্রদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে দুইশত পুত্রকেই ধ্বংস করেন। তখন ভঙ্গাস্বন পুত্রশোকে কাতর হয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন এবং পূর্বকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হলে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হন এবং রাজার ঔরসজাত বা রাজার গর্ভজাত যে-কোন এক অবস্থার একশত পুত্রের জীবন দানে সম্মত হন। সন্তানের প্রতি পিতার চেয়ে মাতা অধিক সংবেদনশীল এবং এই মাতৃত্বের দাবীতেই তখন ভঙ্গাস্বন গর্ভজাত সন্তানদের জীবন কামনা করেন। অন্তবরে ইন্দ্র ভঙ্গাস্বনকে পুরুষরূপ ফিরিয়ে দিতে চাইলে রাজা স্ত্রীরূপই কামনা করেন, কারণ নরনারীর মিলনে নারীই অধিক সুখী। যেমন পাথরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাবার কালে পাথরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জলধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং এই কড়ি-কোমলের মিলনে কোমল স্বভাবা জলধারাই বেশি পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি নরনারীর জীবনে নারীই হলো স্রোতস্বিনী এবং নারীত্বের এই তৃপ্তি মাতৃত্বের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে। কারণ নারীর যৌন জীবনের মূলীভূত বিষয় মাতৃত্ব—নতুন সৃষ্টির প্রেরণা।

স্ত্রীরূপী ভঙ্গাস্বনের মাধ্যমে নারীর স্বকীয় জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এই চেতনার পিছনে পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুরূপ কোনো 'ইজম' (ism) কাজ করে নি, কিন্তু মহাভারতের এই কাহিনীর মাধ্যমে নারীর স্বকীয় রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এই নারীসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি পুরুষের রূপান্তরিত জীবন-বোধের মাধ্যমে। মন্দিরময় ভারতে এই প্রাচীন ভারতীয় জীবনানুরাগের শিল্প নিদর্শন থাকলেও বাঙালির জীবনচর্যায় তার কোনো অভিপ্রকাশ ঘটে নি। কালিদাসের রঘুবংশম্-এও বিবাহিত জীবনে নারীর ভূমিকার কথা নায়িকা ইন্দুমতীর উক্তিতে জেনেছি—

"গৃহিনীসচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অবশ্যই এই উক্তিতে নারীর বৃহত্তর পরিচয় বিবৃত হয়েছে।

পারস্পরিক সুখ ও সহমর্মিতাবোধ নরনারীর রোমান্টিক জীবনবোধের বিশেষত্ব। সমগ্র মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম দিকে বাঙালি নারী এই সচেতনজীবন-বোধ রহিত। কেন না বহু সতীনের ঘরে ও কুলীনের ঘরে বাঙালি নারী একটি ভোগাসক্ত পুরুষের নিকট তার জীবন ও যৌবন বলি হতে দেখেছে মাত্র।

ভারতীয় দাম্পত্যজীবনে নারীর আদর্শ ভূমিকার কথা থাকলেও, কার্যতঃ মধ্য-যুগের বাঙালি জীবনে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক বিকাশ লাভ করতে পারে নি বরং দাম্পত্য জীবনবোধ সীমিত হয়ে আসে এবং বাঙালি জীবনে প্রাগুক্ত ভারতীয় জীবনাদর্শের আর বিশেষ কোনো অস্তিত্ব থাকে না, সতীত্বের সংস্কারটুকুই অবশিষ্ট থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মেয়েরা বলেছে "মেয়েছেলে হওয়া মিছা।"[২২] এবং এই মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনী নতুন যুগের জাগ্রত নারীসত্তার প্রতীক। কুমুদিনী স্বামীর অন্ধ অধিকারবোধের বিরুদ্ধে যে-নীতিগত প্রশ্ন তুলে ধরে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। কুমুদিনী ব্যক্তিত্বের আভায় আলোকিত। স্ত্রীকে 'দাসী' ভাবে দেখার পরিপ্রেক্ষিতে কুমুদিনী নারীর স্বাধিকারের যে-প্রশ্ন তুলেছিল তা কিন্তু পাশ্চাত্যের নজীর দেখিয়ে নয়, বরং প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর যেটুকু সামাজিক মর্যাদা ছিল তাকেই কুমুদিনী তার জাগ্রত চেতনার আলোকে প্রমাণ স্বরূপ তুলে ধরেছিল। মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক?" অর্থাৎ এ মেয়ে স্বামীর অসঙ্গত ব্যবহার ও তার অন্ধ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কেননা সে দেখেছিল রঘুবংশম্-এর ইন্দুমতীর উক্তিতে স্ত্রীর যে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে "দাসী তো কোথাও নেই।"

বস্তুতঃ সত্তার এই জাগরণ নারীর আত্মসচেতনতা ও অধিকারবোধ অর্জনের দ্বারাই সম্ভব হলো। সূর্যমুখী-ভ্রমরের সঙ্গে কুমুদিনীর পার্থক্য গভীর জীবনবোধে

২২. শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসী/আমার জীবন/১৩৬৩ বঃ সংস্করণ/ ৭ পৃঃ। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় 'আমার জীবন' পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা।"—'ভূমিকা'/৮৮ বৎসর বয়সে রাসসুন্দরী দেবী আমার জীবন রচনা করেন (১৩০৫ বঃ)।

এবং কুমুদিনী সূর্যমুখী-ভ্রমরের অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্কের শিকার হয়েও বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর স্বাধিকারের প্রশ্ন তুলেছিল। এই হলো কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এবং এই চরিত্র ও জীবনবোধ কালের চিহ্নবহ। আলোচ্য পর্যায়ে উনবিংশ শতব্দীর মধ্যাহ্নের পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক একটি আদালতীয় ঘটনা উল্লিখিত হলো। সম্বাদ ভাস্কর-এর পাতায় মন্তব্য সহযোগে ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল২৩ এবং তা হলো এই—"কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু স্বীয় রমণীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ স্ত্রীর আবেদন মতে অত্যাচারের প্রমাণ লইয়া দুর্জন স্বামীহস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন কি না? মাজিষ্ট্রেট্ কহিয়াছিলেন তিনি ঐ প্রকার রমণীকে স্বামীহস্ত হইতে মুক্তি দিতে পারেন,..... অবশেষে এই প্রশ্ন সদর দেওয়ানি আদালতে আইসে, সদরীয় জজেরা মাজিষ্ট্রেটের মতেই মত দিয়াছেন।
এইক্ষণে...কুলবালারা অনেকে স্বামীর অত্যাচার অসদ্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেটী আজ্ঞায় স্বতন্ত্র হইবেন, আমরা এই নূতন বিধি শ্রবণে দুঃখিত নহি কেন না এ দেশীয় অনেক লোকে স্ত্রীদিগকে দাসীজ্ঞানে তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার ও অত্যাচার করেন, এই বিধানে তাঁহারা নম্র হইবেন আর মহিলাদিগের উপর অকারণ কণ্ঠ গর্জ্জন করিতে পারিবেন না।"

—অর্থাৎ এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণী তার দুর্জন স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল। যদিও এটি ব্যক্তিবিশেষের কথা, নির্বিশেষ মানুষের নয়, তবুও তার গুরুত্ব প্রবহমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা মধ্যযুগের হিন্দুনারীর পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল, কারণ ইহকাল-পরকালের প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালি নারী প্রয়োজনবোধে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করতে পেরেছিল। এই সম্ভ্রান্ত রমণীর চেতনাকে আমরা যুগের প্রতীক রূপেই গ্রহণ করতে পারি।

এই কালের মানুষ ইহ-সচেতন, আত্ম-সচেতন ও জীবননিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং জীবনকে ভালবাসতে গিয়ে বাঙালি নরনারী সামাজিক জীবনে কোথাও একটা অপূর্ণতা বোধ করে। এই অভাববোধের প্রশ্নেই পুরুষেরা নারীকে মর্যাদা দিতে শেখে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশের ফলে মানুষের মধ্যকার

২৩. সম্বাদ ভাস্কর (২০ মার্চ ১৮৫০/১৪৪ সংখ্যা)—বিনয় ঘোষ (সম্পাঃ)/সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড/১৯৬৪/৪৭১ পৃঃ।

সুপ্ত কামনা বাসনা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। এই অভিপ্রকাশ মানবিক জীবনবোধকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হলেও প্রথম প্রথম তার অভিব্যক্তি ছিল স্থূল। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন নারীর এই ব্যক্তিমনের প্রাথমিক পরিচয় আছে নাটুকে রামনারায়ণের চক্ষুদান প্রহসন (১৮৬৯)-এ। যদিও এই প্রকাশ অনেকাংশে স্থূল, কিন্তু তা জীবন্ত এবং তা আমাদেরকেও বিস্মিত করে। প্রহসনটির দুটি চরিত্র নিকুঞ্জ ও তার স্ত্রী বসুমতী, নিকুঞ্জ রাতের বেশির ভাগ পতিতালয়ে কাটিয়ে বাড়ী ফেরে। কিন্তু বসুমতীর এতে ঘোরতর আপত্তি, কেননা এতে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হচ্ছে না। এবং বাধ্য হয়ে স্বামীকে সুপথে আনয়নের জন্য বসুমতী এই বলে ভয় দেখায় যে প্রয়োজনে সে অপর পুরুষের সঙ্গ কামনা করবে। স্ত্রীর এই ধরনের কথায় নিকুঞ্জের মধ্যে মিথ্যা স্বামিত্ব জেগে ওঠে: "এই বলে তুই কুকার্য করবি?" বসুমতী তখন উত্তর দিয়েছে; "কেন? আমি কি মানুষ নই? আমার রক্ত-মাংসের শরীর নয়? আমার মন নাই? ইন্দ্রিয় নাই, সুখদুঃখ নাই? কিছুই নাই? তুমি কর কেন? তুমি কি সৎকার্য করে থাকো?"—অর্থাৎ নারী হলেও জীবনকে ভোগ করার নীতিগত অধিকার তার আছে এবং স্বামীও যে সৎপথে চলছে না, স্ত্রী তা স্মরণ করিয়ে দিতে পেরেছে এবং পরোক্ষে সে স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। নারীর সত্তার এই জাগরণ নারীর স্বাধিকার অর্জনের পথকে সুগম করে।

—নায়িকা চরিত্রের উদ্ভব ও বিকাশ—

মানবিক কৌতূহল সমূহ গভীর ভাবে দানা বাঁধার ফলে মানুষে-মানুষে শতাব্দীর ভেদ প্রাচীর ভেঙে পড়ে এবং নর ও নারী সম্পর্কিত পারস্পরিক আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মদের জীবন সম্পর্কিত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এই চিন্তাধারাকে আরো সম্প্রসারিত করে। কারণ সাধারণ ও রক্ষণশীল বর্ণ হিন্দুসমাজে অপরিচিত স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে সামাজিক মেলা-মেশা ছিল না বললেই চলে। ব্রাহ্মদের মধ্যেও এই মেলামেশার পথ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পর সুগম হয়। কেন না দুয়ের রূপকেও ঠাকুরবাড়ির মতো ব্রাহ্মপরিবারে এই মেলামেশার আবহাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সামাজিক প্রতিবেশ আরো

প্রতিকূল ছিল বলেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত যথার্থ নারীচরিত্র অঙ্কনে অসুবিধা বোধ করেছেন।[২৪]

বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য জীবনচেতনার সান্নিধ্যে বাঙালি নরনারীদের মধ্যে রোমান্টিক জীবনবোধ প্রসার লাভ করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জীবনবোধ, নারী সম্পর্কে ক্রম বর্ধমান সশ্রদ্ধ মনোভাব ও রোমান্টিক জীবনানুভূতির কল্যাণেই কি জীবনে কি সাহিত্যে নারী সমগ্র সৌন্দর্যের মূলীভূত আধার হয়ে ওঠে, অবশ্য এর মূলে ভারতীয় ধ্রুপদী জীবনবোধও কাজ করেছে এবং এই পথ ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জনের ফলে বাঙালি নারী ধীরে ধীরে নায়িকা পদে উন্নীত হয়। বাঙালি জীবনে নারীসত্তার এই রূপান্তর অবশ্যই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশ পায়। লক্ষণীয় যে, এই দ্বিতীয়ার্ধ বাঙালি জীবনে রোমান্টিক প্রণয়ের উন্মেষ কাল হলেও এই প্রণয়চেতনা বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-গতানুগতিক বিবাহ প্রথার জন্য বাঙালি জীবনে সীমিত সংখ্যকের মধ্যে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক বালবিধবার মধ্যে পরপুরুষকে আশ্রয় করে কামজ প্রেম লতিয়ে ওঠে।

সমকালীন সাহিত্যেও সমাজ জীবনের এই দিকটির প্রতিসরণ ঘটেছে। শুধু নাটক নয়, সৃজ্যমান বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়েও এই কিশোরী ও উদ্ভিন্ন যৌবনা বিধবাদেরই বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বিধবা, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীও। বাল বিধবাদের এই প্রণয়চেতনাকে অনেকে কামজ পদস্খলন বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু নরনারীর প্রেমের যে মানবিক সত্তা তা কামজ সম্পর্ককে বাদ দিয়ে কি না

২৪. ক. কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬০) প্রসঙ্গে মধুসূদন বাঙালি নারীর সামাজিক বিশেষত্বের প্রতি একটি পত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: "The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step."

খ. সেক্সপীয়রের নাটকের মানদণ্ডে মধুসূদনের নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন: "They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape."

[দ্রঃ ক্ষেত্র গুপ্ত/কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী/১৩৭০/যথাক্রমে ১৬৬ ও ১৫৪ পৃঃ।]

তা ভেবে দেখতে হবে। অধিকন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে নায়িকা চরিত্রের বিকাশে প্রধান অন্তরায় ছিল রোমান্টিক জীবনবোধের অনুপস্থিতি ও বাল্যবিবাহ। বরং বঙ্কিমচন্দ্রই নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালিকে নতুন নতুন জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর রচনা পাঠেই পাঠককুল এই নতুন জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র পড়েই বাঙালি তরুণী সচেতন ভাবে হৃদয়বিলাসিনী হতে শেখে। ভারতচন্দ্রের কাব্যও প্রভাব বিস্তার করেছে। আলোচ্য কালে ভবভূতির সংস্কৃত নাটক মালতীমাধব-এর ব্যাপক অনুবাদও লক্ষণীয় বিষয়। মালতীমাধব-এর বিষয়বস্তু প্রণয়-রসের পরাকাষ্ঠা। কাদম্বরী ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর অনুবাদও উল্লেখনীয়। বাঙালি নারীর ভাবজগতে নায়িকা চরিত্রের অভিনয়ের হাতেখড়িও এই সাহিত্য পাঠে। বস্তুতঃ এই সাহিত্যকৃত হৃদয়বোধের দ্বারা পরিবর্তনের পথ ধরেই বাঙলার প্রথম রোমন্টিক রমণীকুলের আবির্ভাব সূচিত হলো।[২৫] সুতরাং বলা চলে যে, আধুনিক বাঙালি নায়িকার জন্ম সাহিত্যের প্রতিবেশে। অতঃপর এই নায়িকা-চেতনা বাংলার আর্দ্র-জলবাতাসে লালিত পালিত হয়েছে—আবির্ভাব ঘটেছে ললিত লবঙ্গলতাদের।

বাঙালি সমাজে আধুনিকাদের জন্ম স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং ব্রাহ্মসমাজের নতুন জীবনবোধের ফলেই সম্ভব হলো। গত শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে ঔপন্যাসিকেরা নায়িকা চরিত্রের সন্ধানে এই সামাজিক পটভূমিতেই বিচরণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাংলা উপন্যাসের অনেক বিশিষ্ট নায়িকা চরিত্রের সন্ধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজে ও ব্রাহ্মপরিবেশে মিলেছে, বঙ্কিমচন্দ্রে নায়িকা চরিত্রের স্ফুরণ ঘটলেও কুন্দ এবং রোহিণী সামাজিক দিক থেকে অপাংক্তেয় ছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথেই স্তরে স্তরে যথার্থ বাঙালি নায়িকার বাঙ্‌ময় মূর্তিলাভ। চোখের বালি-র বিনোদিনী, গোরা-র ললিতা, চতুরঙ্গ-এর দামিনী, ঘরে বাইরে-র বিমলা বাঙালি নারীর নায়িকা সত্তার প্রতীক। শেষের কবিতা-র কথা নাই বা বলা হলো। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি নায়িকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩ খণ্ড/বিশ্বভারতী, ১৩৫৪ বঃ/৫১৯ ও ৫২৫ পৃঃ।

বিধৃত আছে এবং এই ইতিহাস প্রবীন গবেষকের আলোচনার বস্তুরূপেও গৃহীত হয়েছে।[২৬]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জীবনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য বাংলা উপন্যাসের প্রথমযুগে সমকালীন জীবন নিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকগণ উৎসাহবোধ করেন নি। এর অন্যতম কারণ এই কালের সমাজ প্রতিবেশে মহত্তম সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী নায়িকা চরিত্রের সন্ধান মেলা দুষ্কর ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রেও যথার্থ রোমান্টিক বাঙালি নারীচরিত্রের সন্ধান মেলা ভার। এই সামাজিক সীমাবদ্ধতা একালের লেখকদেরকে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের দ্বারস্থ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশের সমাজের রূপ স্পষ্টতঃ পরিবর্তিত। এই পরিবর্তনের ফলে একদিকে কথাসাহিত্যের নতুন বাতাবরণ গড়ে উঠছে, অন্যদিকে নতুন জীবনবোধের বিকাশে কথাসাহিত্যের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ দানা বাঁধছে। বিবর্তিত এই সামাজিক প্রতিবেশে ব্যক্তি মানুষের জীবন বিভিন্ন দ্বন্দ্বে উর্মিমুখর হয় এবং একাধিক পটপরিবর্তনের ফলে বাঙালি নরনারীর চরিত্রের বিস্তার ঘটে। অধিকন্তু বিবর্তিত প্রতিবেশে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে বাঙালি জীবনে ইহ-চেতনা প্রকাশ পায় এবং এই চেতনাই কথাসাহিত্যকে জীবনানুসারী করে। এই পথেই বাংলায় নভেল সৃষ্টির প্রয়াস বাস্তবায়িত হয়।

মানুষের বহিরঙ্গ পরিচয়ের চেয়ে অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয়েই নভেল-এর বিষয় গৌরব। এখানেই নভেল-এর সঙ্গে রোমান্স-এর বিষয়গত পার্থক্য। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে নরনারীর রহস্যময় অন্তর্জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নরনারীর প্রণয় ও দাম্পত্যজীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিলতাই এই অন্তর্জীবনের পরিস্ফুটনে সাহায্য করে। জীবনের এই জটিল দিকগুলিকে তুলে ধরবার জন্যই নভেল জাতীয় সাহিত্য। তাই জীবনে যখন জটিলতা সংক্রমিত হয় নি তখন নভেল জাতীয় সাহিত্য রচনার বাতাবরণও গড়ে ওঠে নি। বাঙালি জীবনে এই জটিলতা-সংক্রমণের কাল হলো উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

২৬. Majumdar, Biman Bihari. Heroines of Tagore. 1968.

৪. বাংলা গদ্যে সামাজিক মানুষের ভিড়

—মানুষ ও সাহিত্য—

পদ্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে।"[১] প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা থেকে দূরে কবিতার এই বিচরণই সাহিত্যের পরিমণ্ডলে গদ্য ও কাব্যের ভিন্ন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পার্থক্য নির্দেশ করে, বলে দেয় এই দুয়ের দুই ভিন্ন ভাবজগতের কথা। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা থেকে কবিতা নিজেকে দূরে রাখায় দৈনন্দিন জীবনের রূপকার রূপে গদ্যের ভাব ও ভাষা শৈলী হয়েছে জীবননিষ্ঠ। বস্তুতঃ সাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রকাশ মাধ্যম রূপেই গদ্য অধিক মানব-জীবননিষ্ঠ। অনেকাংশে গদ্য তাই সমকালেরই বাণীমূর্তি।

নভেল সমকালের মানুষের জীবনের শিল্পবিন্যস্ত রূপ। এই রূপ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সামাজিক প্রতিবেশ রচনা, যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার ব্যক্তি মহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। মানুষ ও তার আচার-ব্যবহার সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জীবনধারা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের ফলেই গদ্য সাহিত্যের অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সংবাদপত্রের সূত্রে সমকালের নির্বিশেষ মানুষ সম্পর্কিত কৌতূহলই রসাশ্রিত হয়ে বাংলা গদ্যের বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। প্রথম দিকে বাংলা গদ্য বিভিন্ন ধর্মীয় বিতর্কের সর্পিল পথে যাত্রা শুরু করলেও পরিবর্তনমুখী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সামাজিক আন্দোলনের ফলে গদ্য সাহিত্য জীবনরসে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। একালের সামাজিক প্রতিবেশ জীবনানুসারী শিল্প নভেল-এর ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়। নভেল-এর রস পরিণামের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবতা বাংলা গদ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকালে ব্যক্তি বিশেষ শুধু নিজের সম্পর্কেই সচেতন নয়, অন্যান্যদের সম্পর্কেও সচেতন হতে থাকে। সংখ্যায় অল্প হলেও এই কালের মানুষ মনে করতে পারছে অপরের সুখদুঃখের

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পঞ্চভূত/১৯৬১/৮৩ পৃঃ।

সংগে নিজের সুখদুঃখ জড়িত, কারণ সে সমাজ বিচ্ছিন্ন একক কোনো জীব নয়। এই চিন্তার প্রতিসরণ ঘটেছে একালের কবি, সাংবাদিক, নাট্যকার ও গল্প লেখকদের মধ্যে। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সৃষ্টিধারার প্রথম ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত। সমষ্টির পরিচয় দানই এই কালের সাহিত্যিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ইংরেজদের শাসনব্যবস্থায় ও ইংরেজি শিক্ষার সম্প্রসারণ কালে গুপ্তকবি 'আমাদের চিরাভ্যস্ত সমাজপ্রথা ও রীতিনীতির বিপর্যয়' প্রত্যক্ষ করেন। এই কালের সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় সমকালের যে-প্রতিসরণ লক্ষ্য করা গেল, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় অনুরূপ সচেতনতার সহজ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আলোচ্য প্রসঙ্গে গুপ্ত কবির রচনা থেকে কোনো কোনো অংশ উদাহৃত হলো—

(ক) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নতুন-পুরাতনের সংঘর্ষে কলকাতার মানুষদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের যে-অবনতি ঘটে, সে সম্পর্কে গুপ্ত কবির সচেতনতা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মিশ্রিত ভাষায় ছন্দায়িত হয়। যেমন :

"ছড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে,
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে॥
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও।
ছুঁয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও॥

(খ) হঠাৎ করে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে কিছু উঠতি শিক্ষিতের আত্মাভিমান এবং খ্রীষ্টান পাদরীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্মপ্রচারের ফলে হিন্দু বাঙালি জীবনে যে বিজাতীয় মনোভাব দেখা দেয় গুপ্তকবিকে তা বিশেষভাবে বিচলিত করে। যেমন :

"যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব।
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা
দুই হাতে পেটভরে খাব থাবা থাবা।
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কালো
হোটেলে টোটেলে নাশ সে বরং ভালো।
পুরিবে সকল আশ ভেব না রে লোভ
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ।"

(গ) ঈশ্বরগুপ্ত খাঁটি বাঙালি কবি। অকৃত্রিম বাঙালি স্বভাবের বশেই তিনি

বাঙালিকে এবং খাঁটি বাংলাদেশের সব কিছুকেই ভালবাসতে শিখেছিলেন। শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সাধারণ বাঙালির আর্থিক ও মানসিক দুর্দশা প্রকট হয়ে হয়ে উঠেছিল। বাঙালি জীবনের সুখ ও সাধ যে-সব সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত, নবান্নের উৎসব তার অন্যতম। কিন্তু দুর্মূল্যের দিনে নবান্নের সেই আনন্দঘন উৎসব কি সম্ভব? গুপ্তকবি তাই ব্যথিতচিত্তে লিখেছিলেন:

> "এবার বছরকার দিন, কপালে ভাই,
> জুটল নাকো, পুলি পিটে।
> যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার,
> মোর্ত্তেছে লোক, কপাল পিটে॥"

(ঘ) হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন প্রচলিত (১৮৫৬) হলে বাঙালি হিন্দুর এক বিরাট অংশ এর বিরোধিতা করে। এই আইনের পক্ষে সামাজিক নাটক রচনার প্রয়াস বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু গুপ্তকবি কোনো নাটক রচনা করেন নি, কবিতার মাধ্যমে সাংবাদিক সুলভ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শানিত ছুরিতে এই আইনের অসঙ্গতি সমূহ প্রকাশ করেছেন।

> "কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ি।
> তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ি॥
> এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
> কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
> বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
> সতীবলে সম্বোধন কিসে করি তবে?
> বিধবার গর্ভজাত, যে হবে সন্তান।
> 'বৈধ' বোলে কিসে তার, করিবে প্রমাণ?"

স্বভাবসুলভ চটুলতা, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা, সাংবাদিকের বীক্ষণ স্বভাব নিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্য চর্চা করেন। যুগসন্ধির কবি রূপে তিনি সাহিত্যে স্বকালের যথাযথ রূপায়ণে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেকালের বিভিন্ন গদ্য ও নাটকাদিতে রচয়িতাদের যে-সমাজনিষ্ঠ মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, গুপ্ত কবির কবিতা উক্ত মনোভাবের বলিষ্ঠ এবং ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ। শুধু নিজে নন সংবাদ প্রভাকর-এর মাধ্যমে গোষ্ঠী সৃষ্টি করে অন্য দশজনকেও ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে স্বকাল সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য

করেন। নভেল রচনায় মানুষের কথা বলতে গিয়ে যে-আচার-আচরণের পরিচয় দান করা হয় এবং যে-আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে মনুষ্য চরিত্রের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হয়, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ভাবে মানুষের সেই আচার-আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রকাশ পেল।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উন্মেষপর্বে বাঙালি জীবনের পট-পরিবর্তনে পাশ্চাত্ত্য মানবপ্রীতি বীজমন্ত্রের কাজ করে। এই মানবপ্রীতির সূচনায় বাঙালি জীবনে মানুষ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ এবং সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন রকমের চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে দানা বাঁধে। স্বকাল সম্পর্কে এই আগ্রহ এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ প্রায় সমান্তরাল ঘটনা। সাময়িক পত্রের সংবাদ, বৃত্তান্তধর্মী রচনা, আখ্যান, নক্সা, প্রহসন, নাটক প্রভৃতি রচনার মধ্যে সমকালের মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় গদ্য-চর্চার মাধ্যমেই জাতি-বর্ণ-ধর্ম-অর্থ নির্বিশেষে মানুষ সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে।

—সাময়িকপত্র—

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকপত্র-পত্রিকার সূচনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক রচনার মাধ্যমে গদ্যের চর্চা ও বিকাশ আরম্ভ হলেও তা মূলত অনুবাদগর্ভ ছিল। কিন্তু সাময়িকপত্রের পাতায় পাঠ্যপুস্তক রচনার সীমানার বাইরে মৌলিক রচনার প্রথম প্রকাশ ঘটে। এই পত্র-পত্রিকাদিই বাংলা গদ্যসাহিত্যকে গোড়ার দিকে বস্তুনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ করে তুলতে সাহায্য করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সাংবাদিকতার প্রধান ভিত্তি। ফলে একালের সাময়িকপত্রের পাতায় সমকালের মানুষের বিভিন্ন সংবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। সাময়িকপত্রের বিষয়বস্তুর স্বরূপ বিচারের জন্য বর্তমান আলোচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) ঘটনাপ্রধান সংবাদ, (খ) সরস ঘটনা।

ঘটনাপ্রধান সংবাদ

নিছক তথ্যই এই সংবাদের বৈশিষ্ট্য। এবং সংবাদটুকু দিয়েই পাঠককে খুশি রাখা হয়। ধর্মকথা দিয়ে আরম্ভ করা যাক। লোকবাংলার ধর্মীয় জীবনের একটি নিবিড় পরিচয় আমরা নিম্নোদ্ধৃত সাংবাদটিতে পাই।

"গত দোলযাত্রার পর দিবস সোমবার অপরাহ্নে কতিপয় বন্ধু সহিত আনন্দধাম ও পবিত্র স্থান ঘোষপাড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে রাসযাত্রা দর্শন করিতে গমন

করিয়া তথায় স্ত্রীপুরুষে অন্যূন দশ সহস্র ভাবের মনুষ্য অর্থাৎ কর্তা উপাসককে উপস্থিত দেখিলাম, এতদ্ভিন্ন সে স্থলে ক্রেতা, বিক্রেতা, রঙ্গদর্শি ও নিমন্ত্রিত প্রভৃতি অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ঐ বহুসংখ্যক কর্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতর জাতি ও শাস্ত্রবিজ্ঞান বর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে তাহাদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব মান্য, বিদ্বান, এবং সূক্ষ্মদর্শিজন দৃষ্ট হইল, এই ভাবকেরা ভিন্ন২ দলবদ্ধ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠানে অথবা রাজপথে স্ব স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরু বেষ্টন করিয়া বসিয়া একান্তঃ করণে কর্তাগুণ সংকীর্তন করিতেছে, কি আশ্চর্য, কি কুহক, যুবতী ও কুলের কুলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষির ন্যায় নিয়তঃ অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকেন তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুলভয় এবং মনের বিকারকে জলাঞ্জলি দিয়া পরপুরুষের সহিত একাসনোপবিষ্টা হইয়া আনন্দ লহরী ও গোপীযন্ত্রে গীত ও বাদ্য করিতেছে,... ।”২

এই জীবনধারার পাশাপাশি নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে এক নতুন চলিষ্ণু জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের শেষে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশের জনজীবনে ধীর পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনের মুখে কলকাতায় বাবুসমাজ-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। চেতো পরগনা নিবাসী এক বিপ্র সন্তান কলকাতায় এসে এই বাবুদের সম্পর্কে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সেই অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ এখানে উদাহৃত হলো।

“...দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্র সন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধকর্তা তৎপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র ও পরেও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইঁহারা একে২ তাবতেই বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটীর দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এই স্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব।”৩

এছাড়া এ সমাজে আরো কিছু লোক ভিড় করেছে, এরা উপগ্রহের মতো ইষ্ট-

২. সংবাদ প্রভাকর (৩০. ৩. ১৮৪৮)—বিনয় ঘোষ (সম্পাঃ)/সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড/১৯৬২/১৬৫ পৃঃ।

৩. সমাচার সুধাকর (৫. ১১. ১৮৩১)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)/সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড/১৩৫৬ বঃ/২৪৭ পৃঃ।

সিদ্ধির কারণ এক এক বাবুর সাথে বয়স্ততার আলাপ দ্বারা সর্বদা সহবাস করে এবং এরাই বাবুদের পারিষদ্‌বর্গ, এবং নগর কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সংস্কারের বন্ধন থেকে বাঙালি নারীর মুক্তি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব-জাগরণের অন্যতম বিশেষত্ব। এই পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক অনাচার ও পাপাচারের বিরুদ্ধে সাময়িকপত্র সমূহের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে পাবনা জিলার এক 'দর্পন' পাঠকের পত্রের অংশ উদাহৃত হলো।

"··· ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণেরদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ২ সধবা থাকিয়াও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা হইতেছে।—কুলীন ব্রাহ্মণের রীতি নীতি কিঞ্চিৎ এই যে প্রায় তাবৎ কন্যারি ১৫।২০।২৫।৩০ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে কোন স্ত্রী ভর্ত্তার পিতামহীর বয়সী হন সে যে হউক। কন্যা-গণের জনক একটি কুলীন আনিয়া আপনার বংশের মধ্যে যার যত কন্যা থাকে এককালে তাহাকেই সম্প্রদান করিয়া দেন তাহাতেও কুলীন মহাশয়দিগের আশা পূর্ণ না হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী হইয়া নানা স্থানে এইরূপ বিবাহ করিয়া ফেরেন। ৫।৭ বৎসরের মধ্যেও স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন না ··· ।"[৪]

···এইরূপ একাধিক বিবাহ কুলীনদিগের জীবিকা নির্বাহের স্বার্থেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সংস্কারের কাঠিন্য ও পাপাচারের ফল্গুধারা—এই দুয়ের মধ্যে কুলীন পরিবারে নারীত্ব অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এই পর্যায়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' আলোচনাটির প্রথম প্রকাশ (ফাল্গুন ১৭৭৬ শকাব্দ) বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ কালের অনেক নারীই বিধবা বিবাহের আইনকে স্বাগত জানিয়েছে। এর প্রমাণ আছে সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে।[৫] বিদ্যাদেবী নামে এক বাল বিধবা স্বকৃত জীবনোপলব্ধির আলোকে পত্রটি রচনা করেন।

শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোম্পানির আগ্রাসী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঙলার গ্রামীন অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, তারই খবর আছে নিম্নোক্ত সংবাদে।

"···বিলাতি সূতার আমদানি হইয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকদিগের

৪. সমাচার দর্পন (৪. ৩. ৮৩৭)—পূর্ব্ববৎ, ২৫৩ পৃঃ।
৫. সম্বাদ ভাস্কর (২, ৮. ৮৫৬)—বিনয় ঘোষ (সম্পাঃ)/সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড/ ১৬৪/৪৮৩ পৃঃ।

অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাঝি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক……কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইঁহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটিতে বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্যগীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না ।"[৬]

এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সাময়িকপত্রের পাতায় সামাজিক মানুষের ক্রম-উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই পথ ধরেই বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উদ্ধৃত সংবাদগুলি নমুনামাত্র, এই সকল রচনায় কোনো প্রসাদগুণ নেই এবং সংবাদসমূহ জীবনরসেও সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু সরস ঘটনা পর্যায়ে প্রসাদগুণসম্পন্ন ও জীবনরসসমৃদ্ধ সংবাদ উদাহৃত হলো ।

সরস ঘটনা

নিছক তথ্যপ্রধান সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সরস করে দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদ পরিবেশনের একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সাংবাদিকদের মধ্যে এই সময়ে প্রকাশ পায়। ফলে বাঙালি জীবনের কোনো কোনো বিচিত্র ঘটনা মনোরম ভাবে পরিবেশিত হতে থাকে।

ধর্মকথা দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

"কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল…। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী.. মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটি টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ক কর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও

৬. সমাচার দর্পণ (২২. ১১. ১৮২৮)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)/সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড/১৩৫৬ বঃ/১৪৪ পৃঃ।

মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্ত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। স্বরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামীর নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই স্ত্রীপুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার অঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারিপুত্র বিনা নহে আমার পাঁচপুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিছ নাই। পরে স্বরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানাশুনা। এই প্রকার কথোপকথন দ্বারা বড় গোল হইলে গান ভঙ্গ হইল শেষে দুইজনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক।"[৭]

—বর্ণিত ধর্মীয় সংবাদটির সঙ্গে ঘটনাপ্রধান সংবাদ পর্যায়ের ধর্মীয় সংবাদটির পার্থক্য জীবনবোধের গভীরতায়। এই সংবাদটি নিছক সংবাদ নয়, গভীর জীবনবোধেরও প্রকাশক। পরিবেশনের নৈপুণ্যে ধর্মসভার দুই ঈর্ষাতুর বাঙালি নারীর চরিত্র-রহস্য সুন্দর ও সরসভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কুলীন সমাজের কীর্তি বিষয়ক বৃদ্ধের বিবাহ[৮] শীর্ষক একটি সংবাদ আহৃত হল।

"একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীর বিয়োগে পুনর্বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করায়..... ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে দিকে গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর

৭. সমাচার দর্পণ (২৬. ৫. ১৮২১)—পূর্ববৎ, ১৪৪ পৃঃ।
৮. সমাচার দর্পণ (৩০. ৬. ১৮২১)—পূর্ববৎ, ১১৬ পৃঃ।

সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা......। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ভুবুং ...। ...ঘটকেরা ১০ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পাল্কীতে আরোহণ করিয়া বরপাত্রের গ্রামে উপস্থিতা হইল। পাত্রটি সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল।" কিন্তু বৈকালে সুশীলা 'কালের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত' ঐ বৃদ্ধবরকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে।

"এই সম্বাদ পাইয়া যত যত আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ২ গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিশি দিয়া কেহ২ মাথায় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ো ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও গোঁপে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।" অনেক কথাবার্তার পর সুশীলা বৃদ্ধকে বিবাহ করতে রাজী হয় এবং পাঁচশ টাকা পণ ও সর্বাঙ্গের সোনার গহনা আদায় করে বিবাহের পনরো দিন পর কুলীনের কন্যা সুশীলা বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে।

—কুলীন ঘরের বৃদ্ধদের এরূপ বিবাহের কথা এবং দাম্পত্য বিপর্যয়ের খবর একালের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। কুলীন বৃদ্ধদের এই সকল কেলেঙ্কারি পরবর্তীকালে অনেক নাটক ও প্রহসনের জন্ম দেয়।

নিম্নোক্ত সংবাদটিও 'আশ্চর্য বিবাহ' নামে প্রকাশিত হয়।[৯]

বর্ধমানের নিকট এক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহে বিরাট এক পণ দাবি করে বসেছিলেন। এদিকে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষীয়া হলো। নিকটস্থ এক সদ্য বিপত্নীক চাকুরীয়া ব্রাহ্মণ ঘটকের মারফত উক্ত ব্রাহ্মণ ও তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যার সংবাদ পেয়ে ঘটকসহ উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়। "এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল।......বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কির পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা দেখিয়া কন্যাও ঐ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব

৯. সমাচার দর্পণ (১০. ১১. ১৮২১)—পূর্ববৎ, ২৭১ পৃঃ।

তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল এবং কন্যাও স্নানের ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমার পিতার ধর্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করি।..... ঐ টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহা আনন্দিতা হইল ..। ঐ রাত্রেই শুভ বিবাহ হইল।.....প্রাতঃকালে কন্যাকর্ত্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সূতা বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে ..। .. এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল যে শুন পিতা আমি বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত। . কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্ব্বক পিতা আনেন তবে একশত টাকা এহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছুই পাই না। সুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদরপূর্বক একশত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল।"

—পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এরূপ আশ্চর্য বিবাহের সংবাদ বর্ণনান্তে মন্তব্য করেন : "এমত আশ্চর্য্য বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই।" ঘটনার নায়িকা শুধু অদৃষ্টপূর্ব নয়, গভীর জীবনবোধের দিক থেকে আধুনিক উপন্যাসের নায়িকাদেরও হার মানায়।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিরসনে সোমপ্রকাশ পত্রিকার ঐতিহাসিক ভূমিকা

স্মরণীয়। নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি সোমপ্রকাশ পত্রিকা থেকে গৃহীত হয়েছে।[১০]

"নীলের এক কুঠীয়াল সাহেবের প্রতিবেশী এক কায়স্থের এক ভ্রাতৃবধূ ও এক কন্যা প্রতিদিন কুঠীর সম্মুখ দিয়া জল আনিতে যায়। কায়স্থের কন্যাটি কিছু সুশ্রী। তাহাকে দেখিয়া কুঠীয়াল সাহেবের লোভ জন্মিল, সাহেব অতিশয় ধৈর্যশীল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাস্তা হইতে সেই কন্যাটিকে ধরিয়া আনাইলেন না। আপিয়স ক্লডিয়সের ন্যায় প্রতারণারও আশ্রয় লইলেন না। কুঠীয়াল সাহেব প্রবঞ্চনা ভালবাসেন না। উল্লিখিত সাহেব কন্যার পিতা কবে বাড়ী না থাকে তাহার তত্ত্বে রহিলেন। .... যাহার যেমন ভাবনা কার্যসিদ্ধিও তদনুরূপ হয়।

"...কন্যার পিতা বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ একদিন গ্রামান্তরে গমন করিলেন। সাহেব সেইদিন রাত্রিতে ১০।১২ লাঠিয়াল পাঠাইয়া সেই কন্যা ও তাহার পিতৃব্যপত্নী উভয়কেই আনাইলেন। ..যে সকল লোক সেই কন্যাটিকে আনিয়া দিয়া তাহার মহোপকার করিয়াছিল, তিনি যদি তাহাদিগকে শ্রমানুরূপ পুরস্কার না দেন, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। তিনি কেবল সেই অকৃতজ্ঞতা দোষের পরিহার করিবার নিমিত্ত সেই কন্যাটির খুড়িকে আনান এবং পুরস্কার স্বরূপ কর্মকর্তাদিগের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন।"

"...এদিকে ত কুঠীয়াল সাহেব কন্যাটিকে আনাইয়া ভয় ভঞ্জন ও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, ওদিকে তাহার স্বামী ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া আদালতে নালিশ করিলেন। নালিশ হইয়া তদারক হইতে হইতে ২।৩ মাস অতীত হইয়া গেল। ততদিনে সাহেব সেই সেই বন্দীকৃত স্ত্রীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। অনন্তর যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই স্ত্রীর জবানবন্দী লওয়া হইল সে বলিল, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাহেবের নিকট গিয়াছে, সাহেবকেও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ কথা বলিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই।"

এই স্বীকারোক্তির কারণ সম্পর্কে সোমপ্রকাশ-এর সম্পাদক জানাচ্ছেন:
"সে বেশ জানিত ভদ্রলোকের স্ত্রীকে কেহ বাহির করিয়া লইয়া গেলে তাহার স্বামী আর তাহাকে ঘরে লয় না। বিশেষতঃ সাহেবে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।......অতএব সে যদি তখন সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া আইসে তাহার তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল সকলি যায়। সুতরাং তাহাকে সাহেবের সপক্ষতা করিতে হইল।"

১০. সোমপ্রকাশ (২০. ৫. ১২৬৬ বঃ)—বিনয় ঘোষ (সম্পাঃ)/সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড/১৯৬৬/৫৭-৫৮ পৃঃ।

—নীলকরদের অত্যাচারে গ্রাম বাঙলার অর্থনৈতিক জীবন শুধু বিপর্যস্ত হয়নি, গ্রাম বাঙলার জনজীবনও বিপন্ন হয়েছে এবং তাদের কামাগ্নিতে অনেক নারী হয়েছে ভস্মীভূত। বর্তমান সংবাদটি সাহিত্যরসসমৃদ্ধ। কুঠীয়াল সাহেবদের এমত অত্যাচারের বহু কাহিনী মধ্য ও দক্ষিণ বাঙলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। উল্লিখিত ঘটনাটি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক (১৮৬০) রচনার সমসাময়িক।

কোনো এক কুলীনের উদ্ভিন্ন যৌবনা স্ত্রীর করুণ পরিণতির কথা বলেই সরস ঘটনা পর্যায়ের আলোচনার শেষ টানছি—

"আমি শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, আমার শৈশব কাল বাল্যক্রীড়ায় যাপন হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, তথাপি পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না; ইহাতে একদিন আমি প্রতিবাসিনী কোন রমণীর নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবগত হইলাম যে, তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রম কালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। পরন্তু যখন আমার ষোড়শবর্ষ বয়স তখন কোন দিবস অপরাহ্ণে পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক একজন মনুষ্য আমারদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তঃকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এ প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল যে, আমি আর লোক সমাজে মিশ্রিত হইবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম তাঁহার কুৎসিত আকৃতি, গলিত অঙ্গ এবং পক্ক কেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ তাঁহাকে বরণ করি নাই, কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, তাহার সহিত আমার মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই, অথচ, তিনি আমার পতি আমার সুখের মূলাধার, কি আশ্চর্য্য, তাঁহার মূর্ত্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকটে কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপূর্ব্বক যে প্রস্থান করিলেন, সেই পর্যন্ত আর দর্শন হয় নাই। একে আমার যৌবনোদ্গম, তাহাতে এবম্প্রকার বিড়ম্বনা সকল সজ্ঘটন হওয়াতে যেরূপ যাতনা বোধ হইল বিশেষতঃ জীবনের সুখ যে পতিসম্ভোগ, তাহাতে এককালীন বঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণ যে-প্রকার অস্থির হইল, তাহা কি বলিব। মাসাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব, এবং কুলধর্ম রক্ষা করিব কিন্তু

অবশেষ জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচার পথকে অবলম্বন করিয়াছি, এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি।"[১১]
—এ হলো কৌলীন্যপ্রথার ফলাফল। বিষয়ের গভীরতা ও বক্তব্যের সুস্পষ্টতা পত্রটির প্রধান বিশেষত্ব এবং রচনার গুণে পত্রটি একজন বা ব্যক্তিবিশেষের জীবনকথা না হয়ে কুলীনঘরের নির্বিশেষ অধঃপতিত নারীদের জীবনকথা হয়ে উঠেছে।

পাঠক-সমাজের নিকট এই সকল সংবাদের গুরুত্ব ছিল অসীম। প্রথমতঃ সমসাময়িক বাঙলা দেশকে পাঠকেরা এই সকল সংবাদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে। "খবরের কাগজ থেকে যাঁদের খবর তারা জানতে পারছে, তাঁরা সকলেই সমকালীন মানুষ, ইতিহাসের পুরাণের বা রোমান্সের নন।"[১২] এই সমকালীন বা পরিচিত মানুষই হলো নভেল জাতীয় রচনার উপজীব্য বিষয়। বলতে গেলে বাংলা সাময়িকপত্রই সৃজ্যমান পাঠক-সমাজের মনে সমসাময়িক মানুষ ও বাঙলা দেশ সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ জীবনসম্পর্কিত বাস্তব চেতনা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে পাঠক ও লেখকের মনে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। কেননা একটি পর্যায়ে পাঠকই লেখক হন। তৃতীয়তঃ সংবাদের সত্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠায় বাংলা গদ্য বাস্তবানুগামী হয়ে ওঠে। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে বাধা নেই যে বাংলা গদ্যে সামাজিক মানুষের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সাময়িকপত্র ছিল প্রথম সোপান।

লক্ষণীয় যে, ঘটনাপ্রধান সংবাদ বা সাধারণ সংবাদসমূহ অপেক্ষা সরস ঘটনা পর্যায়ের সংবাদসমূহের বিশেষত্ব একটু ভিন্ন রকমের। পরিবেশনের নৈপুণ্যে এই সকল ঘটনায় রসসাহিত্য সুলভ রম্যভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

—বৃত্তান্তধর্মী রচনা—

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোনো কোনা সাংবাদিক সমসাময়িক কলকাতার জীবনযাত্রা নিয়ে কলম চালনা করেন। এই কালের রচিত কয়েকটি বৃত্তান্তধর্মী রচনায় এর সুন্দর পরিচয় আছে। এই সকল বৃত্তান্তের বিষয়বস্তু বাবুসমাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কলকাতায় বাবুরা বহু আলোচিত বিষয়। "ইংরেজী শিক্ষা বা সংস্কৃতি নয়, ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসারের" পটভূমিতেই নগর বাংলায়

১১. বিদ্যাদর্শন (কার্তিক ১৭৬৪ শকঃ)– পূর্বোক্ত পাঁচ সংখ্যকের অনুরূপ/৫৭১—৫৭২ পৃঃ।
১২. দেবীপদ ভট্টাচার্য্য/বাংলা চরিত সাহিত্য/১৯৬৪/৬৭ পৃঃ।

'বাবুসংস্কৃতি' (Babu Culture)-র বীজ উপ্ত হয়। এদের উদ্ভবকাল সম্পর্কে হুতোমের ভাষ্য হলো : "নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো।"[১৩] হুতোমের এই বংশলোচনেরাই সেকালের বাবুসমাজ ও বাবুসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল। সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা অবলম্বনে কলকাতার বাবুসমাজ সম্পর্কে কলম ধারণ করেন, লিখলেন বাবুর উপাখ্যান[১৪] নববাবুবিলাস নববিবিবিলাস দূতীবিলাস। এই সকল রচনার সামাজিক বিশেষত্ব এবং নরনারীর কথা আমাদের বর্তমান পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

বাবুর উপাখ্যান-এ বাবুসমাজের প্রাথমিক বৃত্তান্ত প্রথম পরিবেশিত হয়। কোনো এক ধনাঢ্য দেওয়ানজী কুলীন রাজচক্রবর্তীর পুত্র বাবু তিলকচন্দ্রজীর জীবনকথা এই উপাখ্যানের বিষয় এবং এই বাবুসমাজকে যারা বাঁচিয়ে রাখে সেই "অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্টিমুখো কতকগুলি পারিষদ"-বর্গের পরিচয়ও এই রচনায় আছে। এরা সুসময়ের বন্ধু এবং এদের আচরণ কৃত্রিমতায় পূর্ণ।

লক্ষণীয় যে, এই বাবুদের কেন্দ্র করেই কলকাতায় নতুন কালের নতুন এক সমাজ সংসক্তি চালিত হয়েছে এবং একদল তোষামদকারী ও উমেদার তৈরী হয়েছে। এই বাবুদের বিলাসী জীবন ও কুলকামিনীপ্রীতি ও অনাচার সাংবাদিকদের নজর এড়ায় নি। নববাবুবিলাস এই বাবুর উপাখ্যান-এরই পরিবর্ধিত রূপ।

নববাবুবিলাস-এ কোম্পানির বাণিজ্যে নতুন বড়লোক তোতারাম দত্তের এক পুত্রের বিলাসী জীবনের কথা বিবৃত হয়েছে।

এই নববাবুদের পূর্বপুরুষের পরিচয় বিস্ময়কর। "আধুনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যা-

১৩. হুতোম প্যাঁচার নক্শা/নতুন সাহিত্য ভবন/১৩৬৯ বং/৫১ পৃঃ।

১৪. 'বাবুর উপাখ্যান' দুটি পর্যায়ে 'সমাচার দর্পণ'-এর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী ও ৯ জুন তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই উপাখ্যানের রচয়িতা রূপে কারোর নামই এই পত্রিকায় প্রকাশ পায় নি। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে 'নববাবুবিলাস' 'বাবুর উপাখ্যান'-এরই পল্লবিত রূপ। তাই রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টান্তে 'নববাবুবিলাস'-এর লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাবুর উপাখ্যান'-এর রচয়িতা মনে করা হয়। [দ্রঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড/১৩৫৪ বং/২৩ পৃঃ।]

বচন পরকীয়া রমণী সংঘটনকারী ভাড়ামি রাস্তাবন্দদাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিংবা পৌরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।" – এদেরই একজন তোতারম দত্ত এবং তারই একপুত্র নববাবু।

এই বাবুদের বিলাসীজীবনে প্ররোচিত করতে পারিষদ্‌বর্গই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, দেখা গিয়েছে যে কুমন্ত্রী খলিফা কর্তৃক কর্ণে কুমন্ত্রণাদানেই তোতারাম দত্তের পুত্রের মতো ধনীর দুলালেরা বিলাসী জীবনযাপনে আকৃষ্ট হয়। তোতারাম দত্তের মতো অনেক বৃদ্ধ পিতাকেই পুত্রদের এই বিলাসীজীবনের সাক্ষী হতে হয়েছে এবং দেখতে হয়েছে নিজেদের অর্জিত ধনের করুণ পরিণতি, কেননা দেনার দায়ে পুত্র হয়েছে জেলবন্দী। জেলফেরত বাবুটিকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়েছে, কেননা তাঁর পাঁচটি কন্যা বিবাহযোগ্য। কিন্তু বাবুর করুণ স্বগতোক্তিতে সেদিন সমগ্র বাবুসমাজের ভিৎ কেঁপে ওঠে: "হা বিধাতা একদিবস স্ত্রীর সহিত বাস করিলাম না তথাপি আমার হলো যাতনা, পরে করে গেল সুখ আমার ভাগ্যে ছিল দুখ সে যাহা হউক কিন্তু বিবাহ না দিলে জাতি রক্ষা হয় না।" বস্তুতঃ স্বামীদের স্বেচ্ছাচার ও অবহেলায় কুলবধূরা যৌবনের বসন্তোৎসবে পরপুরুষের সঙ্গকামনা করেছে। লক্ষণীয় যে, বাবু সমাজে শুধু স্বামীদেরই চরিত্রের অবনমন দেখা দেয় নি, সঙ্গদোষে স্ত্রীদেরও অধঃপতন ঘটেছে। অবশেষে এদের অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক গঞ্জনায় গৃহত্যাগী হয়ে নববিবি হয়েছে এবং নববাবুদের সাহচর্য দান করেছে।

গদ্যে-পদ্যে রচিত নববিবিবিলাস-এ এই নববিবিদের বিলাসী ও করুণ জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

কলকাতার সমসাময়িক জীবনভিত্তিক এই সকল রচনা বাংলা গদ্যকে ক্রমশঃ জীবননিষ্ঠ হতে সাহায্য করে। এই সকল রচনায় কলকাতার এক শ্রেণীর ধনী বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের কথা প্রধানতঃ ভাষা পেয়েছে। এই জাতীয় রচনায় বাবু অপেক্ষা তাদের প্রতিবেশের বিবৃতি প্রাধান্য পাওয়ায় বাবুসমাজের শ্রেণীগত রূপটিই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

—আখ্যান—

পাঁচের দশকে অনুবাদাশ্রয়ী গল্পরচনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা অবলম্বনে গল্প রচনার বিক্ষিপ্ত প্রয়াস দেখা দেয়। হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্সের

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ও রেভাঃ লালবিহারীদের চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (১৮৫৯) উল্লিখিত প্রয়াসের নিদর্শন। সমসাময়িক বাঙালি জীবনের কথা এই সকল রচনার বিষয়বস্তু।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এ ধর্মান্তরিত অন্ত্যজ হিন্দুদের কথা বিবৃত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই খ্রীষ্টান মিশনারিরা এই সকল ধর্মান্তরিতদের নিয়ে বাঙলা দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এক বিশিষ্ট সমাজজীবন গড়ে তোলে। এমনি এক বিশিষ্ট জনপদের কথা এই রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।[১৫] এই রচনায় যে-সমাজ প্রতিবেশক পাওয়া গেল তা অবশ্য উচ্চবর্ণ হিন্দু বাঙালির কথা না হলেও তা অপরিচয়ের সীমান্তবর্তী নয়। মঙ্গলকাব্যের কোনো কোনো রচনায় অন্ত্যজবর্ণের মানুষের কথা আছে। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রথম।

আলালের ঘরের দুলাল-এর বিষয়বস্তু নববাবুবিলাস-এরই সম্প্রসারণ, মতিলাল ও ঠকচাচা যথাক্রমে ভবানীচরণের নববাবু ও খলিফা চরিত্রের হাতবদল মাত্র। এই মতিলাল প্রথম ইংরেজি শেখা যুগের মানুষ। এই রচনার নরনারী এক বিশেষ স্থান ও কালের মধ্যে বেঁচে আছে। বস্তুতঃ রচনাটির বিষয়বস্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়বহ, বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র এবং পুরাতন ও নতুন যুগের স্মরণিকা। বাবু মতিলালের পরিবারের মতো বিলাসিতার স্রোতে একসময়ে বহু ধনাঢ্য পরিবার বাঙলা দেশের বুকে লীন হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন ব্যতীত একালে বেঁচে থাকা যে সম্ভব নয় মতিলাল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলোচ্য রচনাটি নববাবুবিলাস-এরই বিশেষ পরিণত রূপ।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান-এ[১৬] রাঢ় বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার অভিঘাতে (impact) ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মুখে বাঙালির জীবনবোধ যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও যুক্তিনিষ্ঠ হচ্ছে এই আখ্যানের বিষয়বস্তু তারই পরিচয়বহ। রচনার শেষ অংশে অবশ্য চন্দ্রমুখীর অসুখী দাম্পত্যজীবন বর্ণনার ছলে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

১৫. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর Preface দ্রষ্টব্য।

১৬. চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান-এর আখ্যাপত্রে রচনাটি 'A Tale of Bengali Life' বলে অভিহিত হয়েছে, অর্থাৎ রচনাটি—বাঙালি জীবনের কথা।

আলোচ্য আখ্যানত্রয়ের মধ্যে একমাত্র আলালের ঘরের দুলাল সচেতন নভেল রচনার প্রয়াস ছিল। লক্ষণীয় যে, এইভাবে ধীরে ধীরে সমসাময়িক মানুষের পরিচয় লেখনীর আঁচড়ে সাহিত্যের বিষয় হয়েছে এবং সমকালীন জীবন সম্পর্কে লেখকমনের এই কৌতূহলই 'নভেল' রচনার প্রয়াসকে আনুকূল্য করেছে। এই সকল রচনায় সামাজিক মানুষের বহিরঙ্গের পরিচয়ই প্রাধান্য লাভ করেছে, নভেল রচনার মৌল উপাদান মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় আলোচ্য রচনাত্রয়ে নেই বললেই চলে।

—নক্‌শা—

বাংলা কথাসাহিত্যের সামাজিক পটভূমি রচনায় যে সকল গদ্যরচনা সাধারণ ভাবে সাহায্য করে তন্মধ্যে নক্‌শা বা নক্‌শাধর্মী রচনাসমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নক্‌শাগুলি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর[১৭] প্রথমার্ধের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। কলকাতার জীবনযাত্রা নক্‌শাসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ভবানীচরণের কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) এই পর্যায়ের প্রথম রচনা।
কলিকাতা কমলালয়-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "... এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন...।" অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোম্পানির শাসন কালে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা কলকাতায় এসে কিভাবে কলকাতাবাসী হয় তার একটি সুন্দর সংবাদ আলোচ্য রচনায় আছে। "পল্লীগ্রাম নিবাসী লোকেরা এই কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া কাহার বাটিতে কিম্বা বাসাতে বাস করেন, . এবং এখানকার আহার ব্যবহার বাক্য বিষয়ে নিপুণ হইয়া অনেকের নিকট মান্যও হয়েন অপর কোন কোন লোকের নিকট নিরন্তর যাতায়াত দ্বারা উপাসনা করিয়া কোন বিষয় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত" হন এবং কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।
নগরকেন্দ্রিক বিত্তাশ্রয়ী সামাজিক মানুষের কথা সম্ভবতঃ কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থেই প্রথম বিবৃত হয়। সৃজ্যমান নগর কলকাতার এই মানুষেরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. অসাধারণ অর্থবান সম্প্রদায়: এঁরা প্রচুর ধনের অধিকারী,

১৭. Sketch—"A brief account, description, or narrative not going into details." (The Shorter Oxford English Dictionary, Vol II. 1964. P. 1906)

কারোর ধনের বৃদ্ধি সুদে, কেউ জমিদারীর আয়ে জীবনধারণ করেন ; দুই. দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম যারা করেন, এরাও যথেষ্ট বিত্তবান ; তিন. মধ্যবিত্তলোক অর্থাৎ যারা ধনাঢ্য নন, এঁদের মধ্যে দান বৈঠকি বা আলাপের অল্পতা আছে, আর পরিশ্রমের বাহুল্য আছে ; চার. দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক, এদের শ্রম বিষয়ে প্রাবল্য ঘটে. এদের কেউ মুহুরি, কেউ মেট, কেউ বা বাজার সরকার। ভবানীচরণের এই শ্রেণীবিন্যাসে প্রথম দুই গোষ্ঠীকে উচ্চবিত্ত পর্যায়ভুক্ত করা চলে এবং শেষোক্ত দুই গোষ্ঠীকে যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

এছাড়াও বিদেশীর জিজ্ঞাসা ও নগরবাসীর উত্তরে নগর কলকাতার আরো কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন : আচার ভ্রষ্ট বিষয়ক, দলাদলি বিষয়ক (ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি), কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক, ভাগ্যবান ব্যক্তির নিকট অনেক লোকের যাতায়াত বিষয়ক. বাবুর নিকট পণ্ডিতজনের শাস্ত্রের তাৎপর্য শ্রবণ বিষয়ক। এসব কিছু মিলেই লক্ষ্মীর আলয় কলকাতা নগরীর তৎকালীন পরিচয়। ভবানীচরণ এই নক্‌শায় ব্যক্তিবিশেষের কথা না বলে কলকাতার নির্বিশেষ মানুষের কথাই আলোচনা করেছেন। আলোচ্য রচনার প্রস্ফুটিত ও রম্য রূপটি হুতোম প্যাচার নক্‌শায়-য় পাওয়া যায়।

"মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" (১৮৫৮) নক্‌শায় দশটি প্রস্তাব সহযোগে প্যারীচাঁদ মিত্র সমকালের কলকাতার বিভিন্ন সমস্যাদির কথা আলোচনা করেছেন। প্রস্তাবগুলি মূলত মদ্যপান এবং জাতিরক্ষা বিষয়ক। একটি প্রস্তাবের বিষয় :

"কলিকাতায় শনিবারকে কোন কোন বাবু মধুর শনিবার বা কোন কোন বাবু সোনার শনিবার বলিয়া থাকেন কারণ শনিবার রাত্রে নানাপ্রকার আয়েস মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্কর বাবু কুঠীর কর্ম আস্তেব্যস্তে শেষ করিয়া আসিয়া নিজ বাটীর বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাবুর পারিষদ্‌গণ প্রেমচাঁদ দত্ত দিগম্বর বাচস্পতি ও জলধর গোস্বামী উপস্থিত হইলেন।" (চতুর্থ প্রস্তাব)

—এই হলো সেকালের কলকাতার শনিবারের সন্ধ্যায় কোনো এক বাবুর বৈঠকখানার নরককুণ্ডজারের আংশিক ছবি। তৃতীয় প্রস্তাবের বিষয় যশোহরের কোনো এক জয়হরি বাবুর সর্বনাশের কথা। অর্থ উপার্জনার্থে কলকাতায় আসার পর মদে ও কুকর্মে তিনি শেষ হয়ে গেলেন।

এই রচনার ভাষা ব্যঙ্গ মিশ্রিত। হুতোম প্যাঁচার নক্শার পূর্ব রূপটি এই রচনায় কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২)-র ভূমিকায় রচনাটি 'নক্শা' বলেই অভিহিত হয়েছে। নক্শাটির বিষয়বস্তু সমসাময়িক কলকাতা, বিশেষ কোনো ব্যক্তির কথা নয়। লেখক নক্শার ভূমিকায় বলেছেন: "সত্য বটে অনেকে নকশা-খানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পুরাতন নতুনের সংঘাতে নতুন সামাজিক মানুষের আবির্ভাব ঘটে। বনেদী ও শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের পাশাপাশি কোম্পানির দাক্ষিণ্যজাত রাতারাতি গড়ে ওঠা শিক্ষাদীক্ষাবিহীন উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় ময়ূরপুচ্ছ দাঁড় কাকের মতো কলকাতার বুকে যথেচ্ছা বিচরণ করেছে। এই শেষোক্ত মানুষের দলই বাবুসমাজের প্রধান অংশ। তাদেরই পরিচয় এই নক্শায় প্রাধান্য পেয়েছে।

আরো আছে কলকাতার চড়ক পর্বের ছবি। তখনো চড়ক উৎসব নতুন কলকাতার বিশেষ লোকোৎসব। কলকাতার নাগরিক সমাজ তখনো সুনির্দিষ্ট কোনো জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলেনি। চড়ক উৎসবের সঙ্গেই কলকাতায় গ্রীষ্মের শেষ চৈতী সন্ধ্যা নেমেছে। বাবুরা এবার ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে এল। নতুন রূপ রস গন্ধ নিয়ে কলকাতার রাত্রি নিশাচার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বাংলা দেশের সন্ধ্যা কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে জানান দিল। হুতোমের ভাষায় "এসময়ে ইংরাজি জুতো, শান্তিপুরী ডুরে উড়নি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেনবার যো নাই।"

যে-বর্তমান পিছনে অতীতকে রেখে ভবিষ্যতের দিকে চলেছে এবং যখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নতুন চলিষ্ণু শক্তি অর্জন করেছে, সেই উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সমাজের দৃশ্যপট হুতোমের প্যাঁচক দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। হুতোম তির্যক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন:

"পেট ভরে জলখাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফর্মেশনের জন্য রাত্তিরে ঘুম হয় না। পুলিশ, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুড়ে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লাবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দা-গিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটার করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি

ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুশেই সব ফুরিয়ে যায়। সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারি কখনো কখনো স্বীকার কত্তে হয়।"

(কলিকাতার বারোয়ারি পূজা)

নক্‌শাকারগন নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কলকাতার মানুষকে দেখেছেন, দেখেছেন একটি নতুন সমাজচৈতন্যকে। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনের বস্তুরস পরিবেশনই নক্‌শা পর্যায়ের রচনার বিশেষত্ব। বাংলা গদ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে এর পূর্বেই বহির্বাস্তবতা দেখা দিয়েছে, তবে নক্‌শাতেই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়া গেল। জীবনের বিশেষ মুহূর্তের গভীর পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত।

—প্রহসন—

ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থী হিন্দু সমাজের মধ্যকার সংঘর্ষ, নব্যবঙ্গীয়দের বিকৃত আচার ব্যবহার—এই সব কিছু মিলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ যখন চঞ্চল, তখন এই সকল সামাজিক বিষয়াদি বাংলা গদ্যের বিষয় বিস্তারে সহায়তা করে। নক্‌শা ও প্রহসন এই সামাজিক প্রতিবেশকে ব্যবহার করে জীবনানুসারী সাহিত্যের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।

কুলীনকুল সর্বস্ব[১৮] (১৮৫৪)-এর রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই রচনায় একদিকে কুলরক্ষার্থে এক ষাট বছরের বৃদ্ধকে এক কুলীন পিতার চারটি কন্যা সম্প্রদান, অপরদিকে ফুলকুমারীর মর্মন্তুদ জীবন-জিজ্ঞাসা পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। যশোদা সম্পর্কে ফুলকুমারীর ঠানদিদি। নাতনীর বিবাহিত জীবনের দুঃখের কথায় বিধবা ঠানদিদির জীবনোপলব্ধি বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তাদের এই করুণ অবস্থার জন্য বল্লাল সেনের কুলপ্রথাই দায়ী—এ তারা বুঝতে পেরেছে। স্বামী থেকেও না থাকার যন্ত্রণাই সমাধিক বেদনাদায়ক বিষয়।

এই প্রসঙ্গেই ফুলকুমারীর জীবনের বিদীর্ণ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। "(চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠানদিদি ! এ থাকাচ্চেয়ে না থাকা ভাল। না থাকলে মনকে প্রবোধ

১৮. নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)-এর 'কুলীনকুল সর্বস্ব' কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। নাট্যকারের মনে নাটক রচনার ইচ্ছা থাকলেও শেষপর্যন্ত 'কুলীনকুল সর্বস্ব' প্রহসনের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। কেউ কেউ মনে করেন যে 'সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণকেই আদর্শরূপে' গ্রহণ করে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' রচিত হয়েছে। [দ্রঃ ক্ষেত্র গুপ্ত/ভূমিকা—মধুসূদন রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ)/১৯৬৫/ত্রিশান্ন পৃঃ।]

দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, একি সামান্যি দুঃখু।"—এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজমোহনের স্ত্রী-র কনকময়ীর উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একালের সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় কুলীন সমাজের যে জীর্ণ পঙ্কিল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে, ফুলকুমারী ও ঠানদিদি তারই প্রতিচ্ছবি। এদের মধ্যে যে-বেদনার অভিব্যক্তি ঘটেছে এ কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়, বরং সমগ্র কুলীন ঘরের মেয়েদের বেদনার আরক্তিম প্রকাশ।

লক্ষণীয় যে, বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিধবা ঠানদিদিরও বিবাহ সম্ভব হতে পারে, এখবর ফুলকুমারী জানালে সেদিন জীবন যন্ত্রণায় কাতর কুলীন ঘরের মেয়ে ঠানদিদি বিধবার বিবাহ প্রথাকে স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্তু তারা এও বুঝতে পেরেছে যে তাদের জীবৎকালে বিধবার বিবাহ সম্ভব হবে না। এই জীবন যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সমব্যথী মায়েরাও সেদিন সচেতন হয়ে কুল ভাঙতে চেয়েছে, কিন্তু সেদিন অচলায়তন সমাজের প্রতিভূ পুরুষেরা বলেছে, 'কুল থাকলেই সব থাকে।' এই কুলের নামে মেয়েদের জীবন-যৌবন হয়েছে বিসর্জিত।

ফুলকুমারী, যশোদা (ঠানদিদি), ব্রাহ্মণী এরা একালেরই কুলীন ঘরের কন্যা। এদের জীবনবোধ বলে দেয় যে. একালের মানুষও নিজেদের জীবনের অপূর্ণতা লক্ষ্য করতে পেরেছে, কিন্তু সমাধানের পথ পাচ্ছে না—বিদ্যাসাগর তখনো করুণাসাগর হন নি। এই রচনার দু'বছর পরেই হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়।

একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯)-র রচয়িতা মধুসূদন দত্ত স্বয়ং নব্যবঙ্গীয়দের ন্যক্কারজনক জীবনযাত্রার সাক্ষী। এই যুগ-জীবন আলোচ্য প্রহসনের অন্যতম চরিত্র নব্যবঙ্গীয় নবকুমার বাবুর জবানীতে প্রকাশ পেয়েছে। ঘরে ও বাইরে এই নব্যবঙ্গীয়গণ সর্বপ্রকারে পুরাতনীকে বিরোধিতা করে এক ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কলকাতায় বাবুসমাজ যখন অস্তমিত তখন নব্যবঙ্গীয়গণের প্রাধান্য চলেছে। আলোচ্য প্রহসনে এই সামাজিক অবস্থাই রূপায়িত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সংস্কার-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুকূল জনমত সৃষ্টির জন্য কলকাতায় বহু সমিতি-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্ত্যের সামাজিক আদর্শের আলোকে নব্যবঙ্গীয়েরা 'সোসীয়াল রিফরমেশন'-এর ক্ষেত্রে বাঙালি

নারীর সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তিকেই অগ্রাধিকার দান করে। নব্যবঙ্গীয়দের এরূপ সত্তা এবং গৃহ আলোচ্য প্রহসনের পটভূমি।
প্রথমদিকে এই নব্যবঙ্গীয়েরা নিজেদের মতো করে কিছু ভাবতে পারে নি। স্বীকরণের অভাবে এদের অস্ত্যর্থক দিকগুলো জীবনের অন্যান্য নঙর্থক দিকগুলির পাশে ম্লান হয়ে গেছে। এরা প্রত্যেক সভায় গুরুগম্ভীর আলোচনার পর মদ্যপান করেছে এবং ইংরেজদের বল-নৃত্যের অনুকরণে গৃহস্থ শিক্ষিত কন্যার অভাবে খেমটাওয়ালীদের নিয়ে নৃত্য করেছে। এদের কার্যকলাপ শুধু সভার ইয়ার ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, এরা রাতারাতি ঘরের মেয়েদেরও মেমসাহেব করতে চেয়েছে। সভান্তে ঘরে ফিরে সহোদরাকে চুম্বন দানের তাদের যুক্তি হলো : 'এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমু খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?'—এহলো নব্যবঙ্গীয় সমাজে ইংরেজি শিক্ষার ফলশ্রুতি, অথচ ইংরেজি শিক্ষা না নিয়েও ঘরের বউ নৃত্যকালী বলতে পেরেছে : 'ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।' (২য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)
কিন্তু সুষ্ঠু জীবনবোধের প্রয়োজনে সেদিন যথার্থ ইংরেজি শিক্ষার দরকার ছিল, কেন না স্বামী পরিত্যক্তা ননদকে তার দাদার সঙ্গে ঘর করতে বলাটা নৃত্যকালীর পক্ষে কতখানি শোভন তা ভেবে দেখতে হবে। এই হলো উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের নব্যশিক্ষিত পরিবারে জীবনবোধের পরিণতি।
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯) মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় প্রহসন। উৎপীড়িত গরীব প্রজাদের দুঃখের কথা আলোচ্য প্রহসনের বিষয়বস্তু। জমিদারতন্ত্রে কত দরিদ্র রমণীকে হারাতে হয়েছে স্বামী, ক্ষুধিত নরপশুর নিকট বিলিয়ে দিতে হয়েছে যুবতীর যৌবন। এরূপ এক প্রজাপীড়ক জমিদার ভক্তপ্রসাদবাবু। এক গরীব প্রজা হানিফের যুবতী স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য এই জমিদার লালায়িত : "এখন যে হানিফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প,—…।" (২য় অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক)
বস্তুতঃ জমিদারের ছত্রছায়ায় সমাজে প্রজা ও রাজার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল খাদ্য ও খাদকের। এদের বিলাসী জীবন যাপন ও নারীসঙ্গ লিপ্সা পল্লী বাঙলার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে অশান্ত ঘূর্ণী তুলেছে।
চার ইয়ারে(র) তীর্থযাত্রা (১৮৫৯) মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত মদ্যপান বিষয়ক প্রহসন। রচনা হিসেবে উচ্চাঙ্গের প্রহসন না হলেও এতে একালের মানুষের পরিবর্তনশীল মনের একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে গড়ে ওঠা বাবুসমাজের ইয়ারগোষ্ঠী বা পার্ষদবর্গের প্রতিনিধি স্থানীয় গোপালচন্দ্র, হরিহর, নিতাই ও শ্যামলাল—চার-ইয়ার। সমাজের এই পরগাছার দল বাবুসমাজের নববাবুদের অনুচররূপে মাত্র নয়, তোষামদে গোষ্ঠীরূপে গোপাল ভাঁড়ের নব্যসংস্করণ রূপে এবং লক্ষ্মীর বরযাত্রী রূপে নতুন সামাজিক চেতনা প্রবাহের মুখে জলের শেওলার মতো ভাসতে ভাসতে এসেছিল। যখন এই বাবুসমাজের কাল শেষ হলো, তখন এই চার-ইয়ারকে দেখা গেল বৃন্দাবনাভিমুখে। চার-ইয়ারের ধর্মপত্নীরাও ধর্মরক্ষার্থে স্বামীদের মতো শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করে।

নতুন-পুরাতনের অভিঘাতে বাবুসমাজ, নব্যবঙ্গীয়গণ, জমিদারবর্গ ও কুলীনেরা যেমন সাধারণ মানুষের নিকট হাস্যাস্পদ হয়েছে, তেমনি সমকালীন প্রহসন ও সামাজিক নাটকেরও প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের প্রয়োজনে একালের সাহিত্য প্রয়াস ক্রমেই মানবজীবনের কাছাকাছি এসে গিয়েছে এবং সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে সামাজিক মানুষ তার জায়গা করে নিয়েছে।

—নাটক—

সমকালের মানুষকে সমসাময়িক জীবনধারা সম্পর্কে সচেতন করবার উদ্দেশ্যেই সমকালের জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে নকশা ও প্রহসনের অনুরূপ নাটকও রচিত হতে থাকে। এই প্রয়াস অবশ্যই 'সপরিণাম সমাজ কলঙ্কচরিত্র' প্রধান নাটক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬)-এর রচয়িতা উমেশচন্দ্র মিত্র। বিধবা বিবাহ আইন-এর বাস্তবায়নের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির জন্য একালে নাটকের সহায়তাও নেওয়া হয়েছে।

বালবিধবা সুলোচনাকে কেন্দ্র করেই এই নাটকের প্লট রচিত হয়েছে। বাল-বিধবার যৌবন যন্ত্রণার অসহনীয় পরিণতি দেখানই এই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই কালেও বাঙালি জীবনে কুট্টিনী ছিল, সাধারণতঃ নাপিতানীরাই এই কুট্টিনীর কাজ করেছে। অন্তঃপুরে অবাধপ্রবেশের সুযোগ নিয়ে রসবতীর মতো নাপিতানীরাই দূতীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের স্বার্থকেন্দ্রিক ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিই কুলবধূ এবং বালবিধবাকে প্রথমে প্ররোচিত ও পরে ঘর ছাড়া করেছে। এর প্রমাণ এই নাটকের নায়িকা সুলোচনা। জীবনের বিভিন্ন

সুখভোগ থেকে বঞ্চিত সুলোচনার মতো বালবিধবারা সেদিন গভীর জীবন তৃষ্ণায় শুষ্ক নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি।

তৎকালের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন অনেক মাতাপিতারই আশীর্বাদ লাভ করেনি। সুলোচনার মতো মেয়েদের বৈধব্যজ্বালা পদ্মাবতীর মতো মায়েরা সেদিন বুঝেও বোঝেনি। এবং স্বাগত জানায়নি বিদ্যাসাগরের শুভ প্রচেষ্টাকে। উলটো তারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে। "নতুন বিধেন হয়েছে, তা কি শোন নাই? বিধবার যে বে হবে।" নাপিতানী রসবতীর এই বার্তায় পদ্মাবতীর মতো মায়েরা সেদিন শঙ্কিত ও ভীত।

বরং অনেক মায়েরাই সেদিন বিধবা কন্যাদের পুনর্বিবাহ অপেক্ষা পতিতা-বৃত্তিকেও শ্রেয় মনে করেছে। এই মনোভাব সেদিন বালবিধবা প্রসন্নের পুনর্বিবাহ সম্পর্কে প্রকাশ পায়। তাই বিধবাবিবাহ আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সুলোচনা প্রশ্ন তুলেছে: "বের কথা বলতেছিলি। পোড়া দেশে কতকগুলীন লোক না মলে আর কতকগুলীন না হলে রাঁড়ের বে কি সর্বত্র চলবে। এই একটা বে হচ্ছে দেখিস্ দেখি এর কত গোল হবে।"—কারণ এই বিবাহের সহযোগীরা একঘরে হয়েছে, সমাজপতিদের অনুশাসনের নিকট রাষ্ট্রীয় আইনও অচল। এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংসক্তি।

নীলদর্পণ নাটক (১৮৬০)-এর রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতির পটভূমিতে এই নাটক রচিত হয়েছে। এবং রূপায়িত হয়েছে বিপর্যস্ত গ্রামীণ মানুষের করুণ চিত্রটি। এই নাটকে তিন ধরণের মানুষ আছে: এক, বাংলার নতুন নবাব তথা জমিদারগোষ্ঠী, দুই, গ্রামের গরীব প্রজা সাধারণ, তিন, বিদেশী নীলকর ও শাসক সম্প্রদায়।

কোম্পানির শাসনকালে গ্রামে গ্রামে নীলকর সাহেবরা নীলচাষের জন্য একটি পর্যায়ে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। গ্রাম বাঙলার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে, প্রজাদের সঙ্গে জমিদারও এই নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছে, গ্রাম বাঙলা হয়েছে হতশ্রী। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক এই অবস্থার দৃশ্যকাব্য। এই সময়ে গ্রামের কৃষক বধূ ক্ষেত্রমণির মতো অনেক নারীই কুঠিয়াল নীলকরদের লালসার কামাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে,[১৯] তোরাপের

১৯. একালের সোমপ্রকাশ পত্রিকা গ্রাম বাঙলাকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে রক্ষাকল্পে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্ষেত্রমণির অনুরূপ একটি ঘটনা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মতো প্রভুভক্ত গরীব প্রজার সাক্ষাৎও এই নাটকে পাওয়া যায়।

বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০)-এর রচয়িতা শ্যামাচরণ শ্রীমানী। তিনি বাল্যবিবাহ ও গৌরীদান প্রথা বিষয়ক সংস্কারমূলক আন্দোলনকে তীব্রতর করবার জন্য বাল্যবিবাহ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং বাল্যোদ্বাহ নাটকটি এই মনোভাব থেকে রচিত। এই কালের বাল্যবিবাহে মাতাপিতাদের অগ্রণী ভূমিকাই এই নাটকে বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। "আমার বড় স্বাদ আমি বোর মুখ দেখব"— মায়াবতীর মতো অনেক মা সেকালে নিজেদের মনের এই অযৌক্তিক সাধ পূরণের জন্য গোপালের মতো নয় বছরের ছেলের বিবাহ দিয়েছে। মায়াবতীর এই মনোভাব সাধারণ বাঙালির সীমিত জীবনবোধের পরিচয়বহ। কিন্তু কারো কারো মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রাসমণির মতো মহিলারাও এই গতানুগতিক মনোভাবের বিরোধিতা করেছে, কারণ তারা নতুন করে ভাবতে শিখছে। এই রূপান্তর নতুন কালের চেতনাসঞ্জাত। যখন এই গোপালের জন্ম হয়, তখন মায়াবতীর বয়স এগার এবং গোপালের বাবা বলহীনের বয়স পনরো। এর মূলে ছিল বাল্যবিবাহ প্রথা। একালের অনেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছে। এই সমাজচেতনার ফলশ্রুতি হলো ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আনীত বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত 'সহবাস-সম্মতি-আইন'।

বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক (১৮৬০)-এর রচয়িতা প্রসন্নকুমার পাল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতার নগরজীবনের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পতিতাবৃত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেকালের সমাজে এই পাপবৃত্তির প্রসারের কারণ পর্যালোচনাই আলোচ্য নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই নাটকের শশীমুখী মদ্যপ ও লম্পট শ্যামাচরণের স্ত্রী। শ্যামাচরণ বাহিরকেই ঘর করেছে। ফলে শশীমুখী অতৃপ্ত যৌবনের দাবী পূরণের জন্য ননদের স্বামী মদনকৃষ্ণের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক স্থাপন করে গৃহত্যাগ করে। কলকাতায় আসার পথে বিপাকে পড়ে শেষপর্যন্ত এই গৃহবধূ জীবিকা ও আশ্রয়ের জন্য পতিতালয়ে আশ্রয় নেয়। এরূপ ঘটনা বাঙলা দেশে নগরকেন্দ্রিক জীবনের সূচনায় প্রায়ই ঘটেছে।

আলোচ্য নাটকসমূহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রচারধর্মী রচনা। এই নাটকগুলির আবেদন একটা বিশেষ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক ঘটনাস্রোতের পটভূমিতে বিভিন্ন চরিত্রের মারফত সামাজিক মানুষের উপস্থিতি ঘোষিত হয়েছে। সামাজিক নাটক বলে নয়, উদ্দেশ্যপ্রধান নাটক বলেই সমকালের

মানুষকে এই সব নাটকে খুব নিকট থেকে দেখা গেল। সংস্কারধর্মিতাই এই সব রচনার মৌল বৈশিষ্ট্য। এই সকল রচনার দ্বিমুখী অভিপ্রায় ছিল : এক. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে তাল-বেতাল বাঙালিকে আঘাত দিয়ে চেতনাসম্পন্ন করা, দুই. ভাঙনের মধ্যেই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার।

মৌলিক গদ্য রচনায় সমকালের মানুষের প্রাধান্যে এবং সমাজ মানসের প্রতিফলনে বাংলা গদ্যে বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা ঘটে। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাই এই সকল গদ্য রচনাকে বাস্তবতার পরিচয় বহনে সমর্থ করে। এই প্রয়াসের মাধ্যমেই কথাসাহিত্য ক্রমেই নেমে এসেছে কল্পনার জগৎ থেকে বস্তু জগতের কাছাকাছি —যে-জগৎ আমাদের সকলেরই পরিচিত।

নির্বিশেষ মানুষ ও জনজীবন সম্পর্কে একালের নব্য লেখকদের গভীর আগ্রহ ও কৌতূহল গদ্য সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। গদ্যে সমকালীন মানুষের বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের এই উপস্থিতির মূলে বাঙালির গভীর জীবননিষ্ঠা কাজ করেছে। বস্তুতঃ, সাহিত্যে সমাজ-সত্যকে মুকুরিত করবার প্রচেষ্টাই এই পর্যায়ের লেখকগোষ্ঠির বড় কৃতিত্ব।

গদ্যে সমাজ-সত্যের বিকাশের মূলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। এই কালেই বাঙালি জীবনে ইহ চেতনার সূত্রে বাস্তব-ধর্মিতা ও মানব-তন্ময়তা প্রকাশ পায়। নভেলের প্রধান দুটি লক্ষণ বাস্তবতা ও ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টি পরস্পর সম্পর্কিত। এই মানব-তন্ময়তার সূত্রেই কি পাঠক মানুষকে ভালবাসতে শিখে নভেল-এর ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অখণ্ড মানুষকে খুঁজে বেড়ায় না?

কথাসাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে মানবজীবনের অপার রহস্য সম্পর্কিত কৌতূহল সৃষ্টির কাজটি প্রথমে সাময়িকপত্র অতি বিশ্বস্তভাবে করেছে, পরে নক্শা, প্রহসন, নাটক। এই কৌতূহল পরবর্তীকালে নভেলের মানব চরিত্র সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদনে এবং নভেলের চরিত্রায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সাহিত্যে বাস্তবতা নতুন কথা নয়, যে-কোনো যুগের সাহিত্যেই এর অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়—পার্থক্যটা পরিমাণ ও গুণগত। 'পরিমাণ'গত কথাটা বলছি, কারণ একালের সাহিত্যে বস্তু রসেরই প্রাধান্য। কেননা চর্যাপদ কিংবা মঙ্গল-কাব্যেও বাস্তবতার পরিচয় আছে। কিন্তু লক্ষণীয়, একালের সাহিত্যে বিশেষতঃ জীবনানুসারী রচনায় বহির্বাস্তবতার চেয়ে অন্তর্বাস্তবতারই প্রাধান্য

ঘটেছে, কিন্তু বহির্বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে নয়। বাংলা কথাসাহিত্যের উন্মেষ-পর্বে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্য জীবনের কাছাকাছি চলে আসে। সংবাদ-পত্রের পাতায় জীবনধর্মী সংবাদ ও সামাজিক চিত্ররচনা, এবং গ্রন্থাকারে নক্শা, প্রহসন ও নাটক ও আখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার বহিরঙ্গ দিকটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। কথাসাহিত্যের ভাবী পাঠকগোষ্ঠীর মানসিক প্রস্তুতিও এই সকল রচনার পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই হতে থাকে।

বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা গদ্যে সামাজিক মানুষের এই উপস্থিতির প্রকৃত শিল্প তাৎপর্য কী? বাংলা গদ্যের এখানে-সেখানে মানুষ এসেছে, এসেছে মানুষের সমষ্টি ও সমাজ। কিন্তু সচেতন শিল্পী-সত্তার অভাবে একালের লেখকেরা মানুষকে গদ্যে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বাংলা গদ্যের আলোচ্য পর্যায়ের নরনারী অধিকাংশই প্রতিনিধি চরিত্র, ব্যক্তি-চরিত্র নয়। কমবেশি সকলেই গোষ্ঠি, সম্প্রদায় বা সমাজের প্রতিনিধি। দু-একটি চরিত্র বাদ দিলে কেউ ব্যক্তিত্বে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ তখনো আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের প্রতিষ্ঠা হয় নি, তা' বীজাকারে উপ্ত হয়েছে মাত্র। প্রথম পর্যায়ে তা ছিল বহিরাগত একটি তত্ত্ব। দু-একজন ছাড়া ব্যক্তি মানুষ তখনো যৌথ পরিবার ব্যবস্থার বন্ধনকে অস্বীকার করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ হয় নি। কিন্তু ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় এই ব্যক্তি মানুষকেই সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনায় তুলে ধরা।

একালের পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমিতে নভেল রচনার বহুল উপাদান বর্তমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই একালে ইংরেজি নভেলের অনুরূপ কোনো কিছু রচিত হলো না।

৫. | বাংলা কথাগদ্যের বিকাশ

প্রশ্ন উঠতে পারে কথাগদ্য কী? কথাসাহিত্য স্থষ্টির অনুকূল গদ্য ভাষাই কথাগদ্য। যে-অর্থে গদ্য সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ ধারা কথাসাহিত্য বলে পরিগণিত, সেই সাহিত্যের ভাষাই কথাগদ্য। বাংলা নভেলের বিকাশ আলোচ্য গদ্যরীতির বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত ছিল।
কোন্ গুণে কথাগদ্যকে চিনতে পারি? আমাদের ইহ ও পরিচিত জগতের রূপময় ভাষা-চিত্র রচনাই কথাগদ্যের বিশেষত্ব। রস-সাহিত্যের ভাষা রূপে কথা-গদ্যের বিশিষ্টতা সরলতায়, বহুভাবনার প্রকাশ ক্ষমতায়, ভাবের সাবয়বতায়, স্বচ্ছন্দ গতিশক্তি অর্জনে, স্থিতিস্থাপকতায় এবং নির্ভার চলনে। সে শুনিয়ে সন্তুষ্ট —সে কথকতার কথকঠাকুর। গল্পসাহিত্যের ভাষার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য টুকুর মধ্যেই কথাগদ্য নামকরণের তাৎপর্য নিহিত। বর্ণনা কথাগদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও চিত্রণ তার অন্যতম অনুষঙ্গ। বর্ণনার গুণে কখনো কথাগদ্য হয়ে ওঠে চিত্রধর্মী, ভাষার গুণে ব্যঞ্জনাধর্মী, আর সামগ্রিক ভাবে নভেল-এর গদ্য হয়ে ওঠে চরিত্রস্থষ্টির উপযোগী। এই জাতের ভাষাস্থষ্টির ফলেই কথাগদ্যের রসোৎকর্ষ। চলিষ্ণু ঘটনা ও দৃশ্যের গতিশীলতা পাঠকমনে পৌঁছে দেওয়াই কথাগদ্যের প্রধান কাজ।
অনাধুনিক সাহিত্যে গদ্য সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালির মুখের ভাষা লেখনী মুখে দেখা দিল এবং গদ্য ভাষার চর্চা শুরু হলো। প্রথমতঃ কোম্পানির শাসন কার্যের প্রয়োজনে ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসারের স্বার্থে সাধু পরিচ্ছদে বাংলা গদ্য ভাষার চর্চা শুরু হয়। দ্বিতীয়তঃ বাঙালির মানসমুক্তির ফলে স্বভাষাপ্রীতি প্রকাশ পায় এবং মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য শিক্ষিত বাঙালি বাংলা গদ্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। তৃতীয়তঃ মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কাব্য শ্রব্যও বটে, কিন্তু গদ্য শ্রব্যসাহিত্য নয়, পাঠ্য সাহিত্য। মুদ্রাযন্ত্র বাংলা গদ্যের চর্চা ও প্রসারকে সম্ভব করে,[১] কারণ মুদ্রাযন্ত্রের আনুকূল্য ব্যতীত গদ্য সর্বজনপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে না।

১. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/১৩৭০ বঃ/৩ পৃঃ।

লক্ষণীয় যে, গল্প কিম্বা রসসাহিত্যের সৃজনে নয়, প্রাবন্ধিক গদ্যরীতির পথ ধরে বাংলায় মৌলিক গদ্যের উদ্ভব ও প্রাথমিক বিকাশ। রামমোহনের জ্ঞান কাণ্ডই বাংলা গদ্যকে সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জীবনের সমতলভূমিতে নিয়ে আসে। রসসাহিত্যের বিষয়টি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পরে বিভিন্ন সংস্থার অনুবাদাশ্রয়ী পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে বাংলা গদ্যে প্রবন্ধরীতির বিকাশ দ্রুততর হয়, কিন্তু কথামূলক রচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো চাপ না থাকায় কথাগদ্যের বিকাশ কিছু বিলম্বিত হয়। এই বিকাশ নিম্নরূপ কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত হতে পারে: প্রথম স্তর (প্রত্নস্তর), দ্বিতীয় স্তর (প্রাক্ স্তর), তৃতীয় স্তর (অনুবাদের স্তর), চতুর্থ স্তর (মৌলিক রচনার স্তর), পঞ্চম স্তর, (পরিণত অবস্থা)।

—প্রথম স্তর : প্রত্নস্তর—

কথামূলক রচনাই আমাদের কথাগদ্য পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-এর পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যে প্রথম কথা বা গল্পমূলক রচনা প্রকাশ পায়। এই সকল পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই সংস্কৃত বা হিন্দী বা ফারসী বা ইংরেজি রচনার সারানুবাদ বা ভাবানুবাদ। উইলিয়াম কেরীর তত্ত্বাবধানে একদল বাঙালি এই সকল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই রচয়িতাগণের অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত এবং এঁদের ভাষা চর্চা আবাল্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকন্তু এঁদের সম্মুখে কোনো আদর্শ বাংলা গদ্যভঙ্গিও ছিল না। বাংলা ভাষায় যে ভাষা-ভঙ্গিটি ছিল না, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর সহযোগী পণ্ডিতগণকে সেই ভাষা ভঙ্গিটি গঠন করতে হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় গল্প পর্যায়ের প্রথম রচনা গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ[২] (১৮০১)। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) বাংলা গদ্যের প্রথম ফসল, কিন্তু কথামূলক রচনা নয়। গোলোকনাথ সংস্কৃত হিতোপদেশ বাংলায় অনুবাদ করে গল্পরচনার প্রথম আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করেন।

২. সজনীকান্ত দাস/বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস/১৩৬৯ বং/১৮৩—১৮৯ পৃঃ।
De, Sushil Kumar. Bengali Literature in the Nineteenth Century. 1962. p, 164-165.

রেখাঃ উইলিয়াম কেরীর কথোপকথন (১৮০১) আলোচ্য পর্যায়ের একটু নতুন স্বাদের রচনা। দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তায় সাধারণ মানুষ কখনো সংস্কৃতানুসারী ছিল না, ফরমাইসী[৩] রচনা 'কথোপকথন'-এর ভাষাদর্শ এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর অপর রচনা ইতিহাসমালা (১৮১২) বিষয়বস্তুর বিচারে "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম গল্পের বইয়ের মর্যাদা" লাভ করতে পারে।[৪] রামরাম বসুর লিপিমালা (১৮০২) চল্লিশটি পত্রের গুচ্ছ। পত্র রচনাচ্ছলে রামরাম অধিকাংশ পত্রেই গল্পরস পরিবেশন করেছেন।

একালের বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান পুরুষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও উইলিয়াম কেরীর আবিষ্কার। তাঁর প্রথম রচনা বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) সংস্কৃতের অনুবাদ বিশেষ। তাঁর কীর্তির পরিচয় প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩ ?) সেকালের বাংলা ভাষার যাবতীয় গদ্যরীতির সংহিতাগ্রন্থ।[৫] বাংলা গদ্য ভাষার বিভিন্ন রূপভেদের সঙ্গে অবাঙালি শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রবোধচন্দ্রিকা পরিকল্পিত ও রচিত হয়।

আলোচ্য পর্যায়ে আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হলেও সৃজ্যমান বাংলা গদ্যের গুণগত অবস্থা বিচারের জন্য উল্লিখিত রচনাসমূহের দৃষ্টান্তই বিবেচ্য।

এক. "কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্বস্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে পাঠ্যমান দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেচক চতুষ্টয় ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে। এমন পুত্র থাকা, না থাকা তুল্য।" [হিতোপদেশ (১৮০১) : গোলোকনাথ শর্ম্মা]

দুই. তোমরা কয় ঘা।

৩. কথোপকথন-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য : "I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers."

৪. সুকুমার সেন/পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৪পৃঃ/কেরী এর সঙ্কলক ছিলেন. গ্রন্থের আখ্যা পত্রে উক্ত হয়েছে : "A collection of Stories in the Bangalee Language collected from various sources by W. Carey, D.D."

৫. প্রমথনাথ বিশী/বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক/১৩৬৭বঃ/[৪৫] পৃঃ।

আমি সকলের বড় আমার তিন যা আছে।

কেমন যায় যায় ভাব আছে কালের মত।

আহা ঠাকুরাণী আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক-বুদ্ধিও করে না।

আলো সকলেই কি একে।

না। তাহার মধ্যে ছোট ছুঁড়ি ভালমানুষের মাইয়া সেইডি আমাকে উপরোধবাদ করে।

তবে তাহারি সাথে তোমার প্রীতি আছে।" [কথোপকথন (১৮০১) : উইলিয়াম কেরী]

তিন "মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে তাহার নাম সতী। দক্ষ মহাব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র শব (শিব) তাহার যামাতা বটে কিন্তু ইনি অনাদি কত কোটি ব্রহ্মা ইহার আজ্ঞাবহ তাহাতে দক্ষ কোন ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বসাধনাক্রমে মহাশক্তি ভগবতী তাহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইলেন সেই কথা মহাশক্তি তিনি মহাদেবের শক্তি। মহাদেব দক্ষকে শ্বশুরভাবে প্রণাম করেন না ইহাতেই দক্ষ মহাদেবের প্রতি আনন্দিত কখন নহেন বরং কোপিত এবং কখন কুৎসা বাক্য মহাদেবের বিপরীতে কহেন। এইমত কতককাল গত হয়।" [লিপিমালা (১৮০২): রামরাম বসু]

চার. "অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করত গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দেবদত্ত নাম ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।" [বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২): মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার]

পাচ. "কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাতর হইলেন নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। ঐ সাধু তাহাকে

দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে তোমার বসতি কোথায়! সে কহিলেক আমার নাম খলেশ্বর আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে এই কথা শুনিয়া সাধু বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি সাধুপুর নিবাসী ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিব।" [ইতিহাসমালা (১৮১২) : উইলিয়াম কেরী]

ছয়. (ক) "পতির এই বাক্যে বাঘিনী স্ত্রীবুদ্ধি প্রযুক্ত প্রকারান্তর বুঝিয়া অল্প মানিনী হইয়া কহিল বটে এমন তবে না হবে কেন হবেই তো সে আমাকে এত অপমান করে তাহা আমার তোমার আগ্রাহ্য হয় যাও মেনে বুঝা গেল তোমার মনে এত ছিল। সে কোটনার মাগু তোমার সোহাগিনী হইয়াছে হউক আমাকে কেন শেয়াল দিয়া কাটাও তাকে লইয়াই আজি হইতে ঘর কর আমার কি মা বাপ ভাই বুন কেহ নাই হায় ইহাও হইল এ অমৃতে বিষ উপজিল সকলি আমার কপাল করে তোমার কি দোষ হে বিধাতা তোমার মনে কি এই ছিল এত কালে সতীনের জ্বালায় জ্বলিতে হইল আমি জন্মিয়া কেন না মরিলাম এ পোড়ামুখীর মুখে আগুন কেন না লাগিল।" [প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩?)/৩য় স্তবক/৩য় কুসুম : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার]

ছয়. (খ) "এক মহাজন নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, স্বকীয় অজাত যৌবনা ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া অর্ণবযানেতে বাণিজ্যার্থে বিদেশ-গমন করিল। পরে নানা-দেশীয় বহুবিধ দ্রব্যজাত ক্রয়-বিক্রয় করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়া বিস্তর দিবসের পর স্ববাটীতে আসিল। তখন তাহার পত্নী প্রগল্‌ভ্যাবস্থা প্রাপ্তা হইয়াছে অনন্তর ঐ সদাগর নিশাভাগে শয়নসময়ে স্বরমণীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ক্রিয়া-বৈদগ্ধ্য ও কাম-কলা-কৌশলাদিরূপ চাতুরী নিরীক্ষণ করিয়া, সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইলেন। ইহাতে ঐ অতিচতুরা সুন্দরী স্বকীয় স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণে চিত্রপটে তুলিকাতে এক অর্দ্ধপ্রসূতা সিংহী পুত্তলিকা চিত্র করিল তৎপশ্চাৎ এক মত্তমাতঙ্গ লিখিল। ঐ মাতঙ্গজের গণ্ডস্থলের উপরে ক্রোধেতে নখ বিদারণ করিতেছে অথচ সিংহীগর্ভ হইতে বিনির্গত পূর্বকায় একপঞ্চাস্য শাবক লিখিয়া স্বীয় স্বামীর সম্মুখে রাখিল এবং সস্মিতাবদনা হইয়া স্বামীকে কহিল যে— আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক দেখুন এ চিত্র কেমন হইয়াছে। তৎপতি তচ্চিত্রাবলোকন করিয়া পত্নীর ক্রিয়াবৈদগ্ধ্যে বিশ্বস্ত ও নিঃসংশয় হইয়া অতি হৃষ্ট হইল।" [প্রবোধচন্দ্রিকা]

—উদ্ধৃত অংশগুলি উনবিংশ শতাব্দীর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকেন্দ্রিক গদ্য চর্চার পরিচয় বহন করছে।

এই পর্যায়ের গদ্য সম্বন্ধে প্রথমে দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়—এক. বাক্য সমূহের কোনো নির্দিষ্ট আকার ছিল না, কারণ জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহারের প্রবণতা ও বিরাম-চিহ্নের অব্যবহার, দুই. আলোচ্য গদ্য ভাষায় গদ্যছন্দ বলে কিছু ছিল না। অধিকন্তু, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যেই সাধু ও কথ্য-রূপভেদ প্রথম ধরা পড়ে। কেরীই প্রথম বাংলা গদ্যকে কথ্যভিত্তিক-রূপ দান করেন এবং এদিকে পণ্ডিত ও মুন্সীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবোধচন্দ্রিকায় বিভিন্ন রীতির গদ্য দৃষ্টান্তরূপে আহৃত হয়েছে। এখানে তিন প্রকারের ভাষারূপ দেখা যায়—কথ্যরীতি, সাধুরীতি ও সংস্কৃত রীতি।[৬] এই কথ্য ও সাধু-রীতির পথ ধরেই বাংলা কথাগদ্যের ভাবীরূপটি প্রকাশ পায়। তা' ছাড়া পণ্ডিত ও মুন্সীদের হাতেই বাংলা গদ্যের পদসংগঠন (Syntax) রীতিও প্রথম প্রকাশ পায়। এবারে একালের গদ্যের গঠনগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক—সাধু বাংলায় পদসংগঠনের স্বাভাবিক রীতিটি হলো কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া, অর্থাৎ গদ্যে ক্রিয়াপদের অন্তে অবস্থিতি। গোলোকনাথের গদ্যে এর প্রমাণ আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। কেরীর ইতিহাসমালার গদ্যও এই রীতির অনুসারী। বর্ণনাধর্মী গদ্যের এটি স্বাভাবিক পদসংগঠন-রীতি। কিন্তু চলিত বা কথাগদ্যে এর হেরফের ঘটে এবং তার প্রমাণ কেরীর কথোপকথন-এর ভাষা : ক্রিয়া-কর্ম. বা ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা। কথা তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে অনেক সময় ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রথমে এসে যায়। লক্ষ্যণীয় যে, রামরাম বসুর গদ্যে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক পদসংগঠন-রীতিটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায় নি এবং জটিল বাক্যগঠনের দিকে তাঁর প্রবণতা ছিল। এবারে একালের গদ্যের উপাদানগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক—

ক. বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার—গদ্যের প্রয়োজনীয় পদসংগঠন বিরাম-চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার সাপেক্ষ। কিন্তু পণ্ডিত ও মুন্সীদের রচনায় সংস্কৃত-রীতি-সম্মত বক্তব্যের পূর্ণতা-জ্ঞাপক-অংশে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে। রামরাম বসু, গোলোকনাথ এবং মৃত্যুঞ্জয়—কেউই পাশ্চাত্ত্যরীতি সম্মত বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেন নি। কিন্তু কেরী ? পাশ্চাত্ত্য বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার জানা থাকা সত্ত্বেও কেরী বাংলা গদ্য সৃজনের অন্যতম উদ্যোগী পুরুষরূপে এবং বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রধান নির্দেশকরূপে বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারে প্রয়াসী হননি। এর প্রমাণ কেরীর কথোপকথন এবং ইতিহাসমালা।

৬. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য/১৩৭৩ বঃ/২৮ পৃঃ।

খ. ক্রিয়াপদের ব্যবহার—ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রাণ। আলোচ্য পর্যায়ের গদ্যে ক্রিয়াপদের রূপগত প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্যের গুরুগম্ভীর রূপাবয়ব এবং ধ্বনি ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সহায়ক ভাষা রূপে সংযোগমূলক ক্রিয়াপদের ব্যবহারাধিক্য। গোলোকনাথ, রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য এর প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ কথোপকথনেও সাধুক্রিয়াপদের ব্যবহাবাধিক্য ঘটেছে। প্রবোধচন্দ্রিকার কথ্যরীতির অংশেও। একমাত্র কেরীর রচনায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। জটিল বাক্য ব্যবহারের জন্য অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়।

গ. নামপদের ব্যবহার—আলোচ্য গদ্যে সমাসবদ্ধ ও প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের প্রাধান্য এবং বিভক্তি নিষ্পন্ন পদের ব্যবহারে জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন গোলোকনাথের ভাষায় তাঁরে স্থলে তাঁরেতে, ইহাদের স্থলে ইহারদের। এদিক থেকে কেরীর কথোপকথন-এর ভাষা অনেক বেশি স্বাভাবিক। "ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি।"—এখানে কাহাকে স্থলে কারে অনেক বেশি স্বাভাবিক। 'কে' স্থলে রে-বিভক্তির ব্যবহার আমাদের মুখের ভাষায় অনেক সময়ই ব্যবহৃত হয়। কিম্বা 'যায় যায়' (জায়েতে জায়েতে স্থলে)। মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন-এর গদ্য সংস্কৃতবহুল। অবশ্য নামপদ ও যৌগিক ধাতুর সুসমন্বিত ব্যবহারে অর্থের প্রাঞ্জলতা রক্ষা পেয়েছে। বিভক্তি নিষ্পন্ন পদের ব্যবহারে গোলোকনাথের যে-ত্রুটি, মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। তিনি শব্দ ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রেখে দক্ষতার পরিচয় দেন। এদিক থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের বর্ণনাপ্রধান গদ্য উন্নত। কেরীর ইতিহাসমালা-র ভাষাও অনেকাংশে ঝরঝরে, ভাষা সাধু এবং ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার থাকলেও রচনায় সমাসবদ্ধ পদ, অলঙ্কার কিম্বা সংস্কৃতানুগ বিশেষণাদির ব্যবহার নেই বললেই চলে। কথ্য ভাষারূপ প্রদর্শনে (ছয়-ক উদ্ধৃতি) মৃত্যুঞ্জয় দেশজ ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। 'অমৃতে বিষ উপজিল', 'পোড়ামুখীর মুখে আগুন' প্রভৃতি বাক্যাংশের ব্যবহারে এই কথামূলক গদ্য অনেক বেশি বাস্তব ও জীবন্ত হয়েছে। ভাষায় আঞ্চলিকতার ছাপও রয়েছে—যেমন বুণ<বোন। সাধুভাষা-রীতির নিদর্শন রূপে উদ্ধৃত অংশটি (ছয়. খ) বিদ্যাসাগরের ধ্রুপদী ভাষার প্রাক্‌রূপ। নামপদের ব্যবহারিক কৌশলে (অজাত যৌবনা, প্রগল্‌ভ্যাবস্থা, ...) মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা অনেক বেশি বর্ণাঢ্য হয়েছে এবং কলমের বিশেষ বিশেষ আঁচড়ে ভাষা চিত্রগুণ-সম্পন্ন হয়েছে। এই চিত্রধর্মিতা কথাগদ্যের অন্যতম

বিশেষত্ব। এই গদ্যের অনন্যতা সমাসবদ্ধপদের ব্যবহারে, সালঙ্কার বর্ণনায় ও বিশেষণের বাহুল্যে।

কথামূলক গদ্যে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিতে জীবনানুসারী শব্দ সমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু রচনা যখন অনুবাদাশ্রয়ী, বিশেষতঃ সংস্কৃত কেন্দ্রিক, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তৎসম ও তদ্ভব শব্দের বাহুল্য রচনায় থাকে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ কখনো যে সংস্কৃতানুসারী ভাষার পক্ষপাতী ছিল না, ১৮০১-এ প্রকাশিত কেরীর কথোপকথন-এর ভাষাদর্শ তারই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ; এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিত্যকার ঘরোয়া ভাষার পরিচয় দান। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকাকে পরীক্ষামূলক রচনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বাঘিনীর জবানী [উদ্ধৃত (ছয় : ক) অংশ লক্ষণীয়]-তে লেখককে শব্দ ব্যবহারে মেয়েলী ভাষা ব্যবহার করতে দেখি। কথ্যরীতির রচনাদর্শ তৈরীর জন্য প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ ও শিষ্ট সমাজে অপ্রচলিত অনেক দেশজ শব্দ (মেনে, কোটনার মাগু, পোড়ামুখী) ব্যবহার করে লেখক তন্নিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন্দ্রিক পাঠ্যপুস্তক বাঙালির হাতের সৃষ্টি হলেও উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের ভাষা শিক্ষা দান, তাই এই স্তরে বাংলা কথাগদ্য কতকগুলি সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই প্রকাশোন্মুখ ছিল। বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কাজচলার মতো একটি 'ভাষাদর্শ' সৃষ্টি ছিল কঠিন কাজ এবং উদ্দেশ্য যেখানে গল্পরস পরিবেশন নয়, ভাষা-শিক্ষাদান ও মাষ্টারি করা, সেক্ষেত্রে ভাষার সরল রূপ সহজাত হতে পারে না। কথাগদ্যের এই প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী স্তরে সূচিত হয়। গদ্যের সচলতা ও সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন সহৃদয় ও প্রবুদ্ধ পাঠক-সমাজ এবং এই পাঠক-সমাজের আবির্ভাব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭), সাময়িকপত্রের প্রকাশ (১৮১৮) এবং বেসরকারী উদ্যোগে (স্কুল টেকস্টবুক সোসাইটি—১৮১৮) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ফলেই পরবর্তী স্তরে সম্ভব হয়।

—দ্বিতীয় স্তর : প্রাক্‌স্তর—

আলোচ্য স্তরের প্রধান বিবেচ্য বিষয় সংবাদপত্রের ভাষা। কারণ, এক-বেসরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রথম স্তরেরই জের চলছিল, বিশেষত রচনার আদর্শ ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রচিত পাঠ্যপুস্তক, এবং

রচনাসমূহ ছিল প্রধানতঃ অনুবাদাশ্রয়ী ; দুই. এই সকল পাঠ্যপুস্তকের পাঠক-সংখ্যা সীমিত ছিল, ফলে তা ব্যাপক গদ্যবোধের জন্মদানে সহায়ক হয় নি। পক্ষান্তরে সংবাদপত্রের আন্দোলন পাঠক সংখ্যার বিস্তার ঘটায় এবং পরিবেশিত ঘটনাসূত্রে নব নব চিন্তার উদ্রেকের ফলে সচেতন পাঠক মনে সজীব গদ্যবোধ জন্ম নেয়। এই কারণে কথাগদ্যের বিকাশের দিক থেকে সংবাদ-পত্রাশ্রয়ী ভাষা রচনার এই প্রয়াস দ্বিতীয় স্তর বলে অভিহিত হতে পারে। এই স্তরের আলোচনা দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হলো—ক. ঘটনাপ্রধান সংবাদ বা সাধারণ সংবাদের ভাষা, খ. সরস ঘটনা বা গল্পরসবাহী সংবাদের ভাষা।

ঘটনাপ্রধান সংবাদের ভাষা

সংবাদপত্রের বিভিন্ন স্তরে একদিকে তথ্য ও বক্তব্যপ্রধান রচনারীতির শক্তিশালী রূপটি গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে দেখি পাঠকমনে রসাবেদন সৃষ্টির প্রয়োজনে কথাসাহিত্যের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত উপাদান টুকরো সংবাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই পর্যায়ের গদ্যের নমুনা চতুর্থ অধ্যায়ে উদাহৃত 'ঘটনাপ্রধান সংবাদ' সমূহে পাওয়া যাবে।[৭] সাংবাদিকের এই পর্যায়ের গদ্যের বিশেষত্ব ঘটনার যথাযথ উপস্থাপনায়। বিষয়বস্তুর বিচারে এই গদ্য পুরোপুরি সংবাদপ্রধান। কিন্তু গদ্যশিল্পের বিচারে? বিরাম-চিহ্নের যথাযথ ব্যবহারের অভাবে এবং অব্যয়াদি ও কারক-বিভক্তির ত্রুটিযুক্ত ব্যবহারে এই সাংবাদিক গদ্যের অর্থ স্থানে স্থানে জটিল, ততোধিক বিস্ময়কর মিশনারী পত্রিকা সমাচার দর্পণ-এ এই বিরাম-চিহ্নের অব্যবহার। অথচ বিষয়ানুগামিতার গুণে, সংস্কৃত ভাষার প্রথানুগত্য অস্বীকারে এবং অলঙ্কার বর্জনে সংবাদপত্রের আলোচ্য গদ্যভাষা ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের গদ্য ভাষার তুলনায় সাধারণ পাঠকের অর্থবোধের অনেক বেশি কাছাকাছি। একদিকে দৈনন্দিন জীবন বিষয় হওয়ায় এই গদ্যের মধ্যে সমসাময়িক জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়, অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবন থেকে গৃহীত শব্দের ব্যবহারে এবং সংবাদ পরিবেশনের বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিমা অর্জনে সৃজ্যমান বাংলা গদ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীকে স্পর্শ করে।

৭. দ্রঃ বর্তমান গ্রন্থের ৭৮ পৃঃ

সরস ঘটনার ভাষা

সংবাদধর্মী গদ্য বলতে যা বুঝি আলোচ্য পর্যায়ের গদ্য পুরোপুরি তা নয়— সংবাদ হলেও গল্পরস এর প্রধান গুণ। এই পর্যায়ের গদ্যের উদাহরণ আছে চতুর্থ অধ্যায়ের 'সরস ঘটনা' বিভাগে।[৮] বাবুর উপাখ্যান-আশ্চর্যবিবাহ প্রভৃতি সংবাদের ভাষা স্বজ্যমান গদ্য ভাষার শক্তির পরিচয় দিয়েছে।

পত্রিকার ভাষার বিশেষত্ব কী? পত্র-পত্রিকা কীই বা দিল বাংলা গদ্য ভাষাকে? প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র ছিল নতুন জীবনবোধের বাহন, বিশেষতঃ 'মধ্যবিত্ত সমাজের কণ্ঠ'।[৯] এর ফলে পত্র-পত্রিকার গদ্যভাষা চলতি-জীবন-ভিত্তিক হয়ে ওঠে। সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজনে সাংবাদিকের কলম নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছে এবং কলমের আঁচড়ে ক্রিয়াপদ নামপদ ও অব্যয়ের ব্যবহারিক তাৎপর্য বক্তব্যভেদে নব নব অর্থের প্রকাশক হয়েছে। অধিকন্তু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অথচ সাহিত্যে তখনো অসমাদৃত এরূপ অপ্রচলিত শব্দকে সাংবাদিকেরাই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লাগান।

বস্তুতঃ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষী জনপদের সঙ্গে বাংলা গদ্যের যোগ ক্রমে ক্রমে নিবিড় হতে থাকে। কিন্তু বিশ্ববোধের সঙ্গে ব্যক্তির চিন্তা যতদিন না যুক্ত হয় ততদিন সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব সম্ভব নয়।[১০] উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে এবং তাঁদের লেখনী-চালনায় বাংলা গদ্য সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে ওঠে। সাহিত্য সৃষ্টি এবং মননের উৎকর্ষ সাধনে যখন কোনো কোনো পত্রিকা এগিয়ে আসে তখনই সাহিত্যিক গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। একালে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রধান মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা গদ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে মনন গদ্যের বিকাশে উদ্দীপক শক্তিরূপে কাজ করে।

প্রথম স্তরের কথাগদ্যের লেখক ও পাঠকের সংখ্যা ছিল সীমিত এবং এই গদ্যের ব্যবহারিক তাৎপর্যও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে লেখক স্বল্প হলেও পাঠকসংখ্যা আর স্বল্প নয়। এই স্তরেই গদ্যের লেখ্যরূপের সঙ্গে সাধারণ লেখাপড়া জানা মানুষ বিশেষভাবে পরিচিত হয়। অধিকন্তু সংবাদপত্রের

৮. দ্রঃ বর্তমান গ্রন্থের ৮১ পৃঃ।

৯. প্রমথনাথ বিশী/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/ [৪৯] পৃঃ।

১০. ভবতোষ দত্ত/বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ—পুলিন বিহারী সেন (সম্পাঃ) রবীন্দ্রায়ণ, ১ম খণ্ড/ ১৩৬৮ বঃ/১২৮ পৃঃ।

বিষয়বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন সংবাদের প্রকাশশৈলী সৃজ্যমান গদ্য ভাষাকে বহুভাবনাক্ষম করে তোলে, এর ফলে বাংলা গদ্যের সংবহন ক্ষমতাও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকের লেখনী চালনার ফলেই তথ্যচারনায় ও বক্তব্যে একমুখীনতা প্রকাশ পায় এবং ভাষায় তন্নিষ্ঠ বাস্তবতা দেখা দেয়।
কিন্তু সাংবাদিকের গদ্য অনেকাংশে প্রাবন্ধিক গদ্যের কাছাকাছি। যেখানে বিষয় তথ্য ও যুক্তি-নিষ্ঠ, সেখানে ভাষা আতিশয্যবর্জিত ও নিরলঙ্কার হবেই। প্রকৃতপক্ষে এই ভাষাকে কথাগদ্য ও প্রবন্ধের গদ্যের মধ্যবর্তী বলা চলে। ঘটনাশ্রয়ী এই সব সংবাদের ভাষাও যথার্থ কথাগদ্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত, হতে পারত সাহিত্য গুণান্বিত যদি এর সঙ্গে যুক্ত হতো প্রসাদগুণ। পরবর্তী কালে 'মাসিক পত্রিকা', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' পত্রিকা এই রসসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখন ভেবে দেখতে হবে যে বাংলা গদ্য যথার্থ কথাগদ্যরূপে উন্নয়নের পথে কী কী অন্তবায়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

বাংলা কথাগদ্যেব বিকাশে অন্তরায়

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কথাগদ্যের স্বচ্ছন্দ বিকাশ কয়েকটি কারণে বিলম্বিত হয়। রসসাহিত্য সৃষ্টিতে বাংলা গদ্যের ভূমিকা পরিচ্ছন্ন রূপ ধারণ না করায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে বাংলা কথাগদ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই ছিল এবং ইংরেজি গদ্যশৈলীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের বিভিন্নমুখী প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। প্রথম যুগের বাংলা কথাগদ্যের বিকাশের পথে কী কী অন্তরায় দেখা দিয়েছিল, তার উল্লেখ করা যেতে পারে।
এক. গদ্যের সংবহনক্ষমতার অভাব—গোড়ার দিকে বাংলা গদ্য বহুভাবনাক্ষম ছিল না। এ গদ্যে কী রসসাহিত্য কী মননসাহিত্য কোনোটিই সুষ্ঠুভাবে রচনা করা সম্ভব ছিল না। কোনো কিছু রচনা কালে এ ভাষা সহজেই সংস্কৃতের অধীন হয়ে পড়ে। বাংলা গদ্যের এই সৃষ্টি-অক্ষম অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহনই প্রথম আমাদের সজাগ করে তোলেন।[১১] শতাব্দীর মাঝখানে যখন বাংলায় অনুবাদের জোয়ার আসে তখন বঙ্গভাষাসেবী দুজন ইংরেজও বাংলা গদ্যের অপরিণত অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলেন। এঁদের একজন ডঃ এড্‌বার্ড রোআর বলেন (১৮৫৩) যে 'লিপিচাতুরীর পারিপাট্য' তখনো

১১. রামমোহন রচনাবলী/হরফ প্রকাশনী/১৯৭৩/৭ পৃঃ।

বাংলা গদ্যে দেখা দেয় নি।[১২] দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন এইচ. জি. গ্রাট। তিনিও লক্ষ্য করেন (১৮৫৬) যে, সাধারণ বর্ণনাধর্মী অংশের বাংলায় ভাষান্তর অসুবিধাজনক না হলেও ভাবমূলক ('abstract reflections') ও নীতিমূলক ('didactic') অংশের ভাষান্তর কালে প্রয়োজনীয় ভাষার অভাবে মূলের সঙ্গে অনুবাদের বড় রকমের অসঙ্গতি থেকে যায়।[১৩]

দুই. সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব—কেরীর 'কথোপকথন' ও অন্যান্যদের হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র জাতীয় রচনাকে কেন্দ্র করেই গোড়ার দিকে বাংলা গদ্যের কথ্য ও সংস্কৃতানুসারী সাধু রীতি স্পষ্ট রূপ লাভ করে। এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্টির প্রকাশ মাধ্যম হবে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাংলা গদ্যকে লালন করতে গিয়ে কেরী সমকালের মানুষের মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্য, তার গতি-প্রকৃতি ও পদ-সংগঠন (syntax) রীতির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন। তাঁর কথোপকথন সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়ের পরিচয়বহ। সৃজ্যমান বাংলা গদ্য ভাষার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয়ও সচেতন ছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকার গদ্য ভাষায় কথ্য-সাধু-সংস্কৃত এই তিনের রূপাদর্শ লক্ষণীয়। কিন্তু এর কোনোটিই সাহিত্যিক গদ্যের আদর্শরূপ ছিল না। একালের সাধু ও কথ্য গদ্যরূপের কোনোটাই ভাষাবোধের দিক থেকে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দুই রূপের মধ্যে ব্যবধানও ছিল মেরুপ্রমাণ। ডঃ রোআর প্রথম এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আবশ্যকমতো গ্রহণ ও বর্জনপূর্বক এই দুই ভাষারূপের এক সমন্বয়ধর্মী মধ্যমরীতির ভাষাদর্শকেই সাহিত্যিক গদ্যের মানদণ্ড রূপে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।[১৪] বঙ্কিমচন্দ্র এই মতের পরিপোষক হয়েও এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারেন নি, বরং তিনি সাধু গদ্যের প্রবহমান রূপটিকেই উপন্যাসের ভাষাদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। অনেক দিন পর্যন্ত কথ্যভাষা কথাগদ্য হয়ে উঠতে পারে নি। এই ভাষাদর্শগত দ্বন্দ্বের ফলেই কথাগদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয় নি।

তিন. কথোপকথনেব ভাষা—কথাগদ্যের বিকাশে তৃতীয় অন্তরায় ছিল

১২. Edward Roer কৃত 'মহাকবি সেক্সপীর প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৩. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-এর পাল ও বর্জিনিয়া ইতিহাস-এর Notice অংশটি দ্রষ্টব্য।

১৪. ১২ এর অনুরূপ।

কথোপকথনের ভাষাদর্শ। সমকালীন প্রহসন ও সামাজিক নাটকে জীবনানুসারী কথোপকথনের ভাষাদর্শ গৃহীত হয়, অথচ দীর্ঘকাল পর্যন্ত কথাসাহিত্যে কথোপকথনের ভাষায় কখনো সাধু কখনো বা সাধু ও চলিতের মিশ্ররূপ ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনানুসারী শিল্পরূপে কথোপকথনের এই ভাষাগত দুর্বলতা বাংলা কথাগদ্যের বিকাশের অন্যতম অন্তরায় ছিল। কারণ কথোপকথনের বাগ্‌ভঙ্গিমা কথাগদ্যের অন্যতম প্রকাশভঙ্গি। কাহিনী তথা রোমান্স রচনার ক্ষেত্রে কথোপকথনের ভাষায় সংস্কৃতানুসারিতা তেমন বেমানান না হলেও সমকালাশ্রয়ী আখ্যানে সাধুভাষা অচল নয়। বরং কথোপকথনে সাধু ও সাধু চলিতের মিশ্রণে গল্পের জীবনধর্মিতা বিনষ্ট হয়েছে। কথোপকথনের ভাষা যতক্ষণ না কথ্যভাষা ভিত্তিক হয়ে উঠতে পেরেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কথাগদ্য পরিপূর্ণ স্বস্তিকর হয়ে ওঠে নি। আলালের ঘরের দুলাল-এর ঠকচাচা, নীলদর্পণ নাটক-এর ভদ্রেতর চরিত্রগুলি, কিংবা প্রহসনের পাত্রপাত্রীর সংলাপের আদর্শ সমসাময়িক কালে রচিত কাহিনী বা আখ্যানে গৃহীত হয়নি।

সাহিত্যিক গদ্যসৃষ্টির অন্তরায় সমূহ দূরীকরণের জন্য মধুসূদনের মতে প্রয়োজন ছিল: "men of genious to polish it up."[১৫] বিদ্যাসাগরে এসেই বাংলা কথাগদ্য বিশেষ সংবহন ক্ষমতার অধিকারী হয়। সাধু ও চলিত ভাষাদর্শের দ্বন্দ্ব আখ্যান রচনার ধারায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়। অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথেই এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু উপন্যাসের কথোপকথনের ভাষায় স্বাভাবিকতা সঞ্চারিত (অর্থাৎ মুখের ভাষার ব্যবহার) হলো অনেক পরে। রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় নিলেন। গোড়া উপন্যাসেই কথোপকথনের ভাষার চলতি রীতির প্রথম স্বাভাবিক ব্যবহার দেখা গেল। অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর চরিত্রকেই মুখের ভাষা বলতে শোনা গেল।

—তৃতীয় স্তর : অনুবাদের স্তর—

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই বাংলায় কথামূলক রচনা ধারাটি বিশেষ বিকাশ লাভ করে—অনুবাদই ছিল এই বিকাশের প্রধান অবলম্বন। গল্পসাহিত্য রচনার জন্য বাঙালি অনুবাদকগণ ইংরেজি-ফারসী-সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ অনুবাদে অগ্রসর হন। আলোচ্য পর্যায়ে বঙ্কিম-পূর্ব কালের

১৫. ক্ষেত্র গুপ্ত/কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী/১৩৭০ বঃ/২৩৩ পৃঃ।

অনুবাদাশ্রয়ী কথাগদ্যের রূপটিই কালানুক্রম রক্ষা করে আলোচিত হচ্ছে। প্রথমেই অনুবাদ-অংশগুলি গৃহীত হলো :

ক. "বেতাল কহিল, মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ, ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে ও কলহে কালহরণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা, ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা, সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি. শ্রবণ কর। প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রশ্ন করিব; যদি তুমি তত্তৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দাও, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব; আর, যদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও, অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবেক। রাজা অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন এবং বেতালও উপাখ্যানের আরম্ভ করিল।" [বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭): ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর][১৬]

(খ) "জোহাক নির্ভয় হইয়া তক্তে বসিয়া জমসেদের দুই ভগ্নী একজনার নাম সহরনাজ, দ্বিতীয়ার নাম আরণওয়াজ সেই দুইজনকে আপন ভোগ্যাস্ত্রী করিয়া রাখিল, আর সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ হইয়া অতিশয় দৌরাত্ম্য ও অন্যায় আরম্ভ করিল, বিশেষতঃ প্রত্যহ দুইজন মনুষ্যকে হত করিয়া তাহারদিগের মর্জা আপন স্কন্ধের দুই সর্পকে খাওয়াইত কয়েকদিন পরে জোহাক এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যে তিনজন অতি বলবান বীর জোহাককে আক্রমণ করিল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ যে সেই জোহাকের মস্তকে এক গদা প্রহার করিল এবং দুই হস্তে ও গলদেশে রজ্জুসংযুক্ত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, আর অনেক মনুষ্য তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে, জোহাক এই দুঃস্বপ্ন সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিল, বেগম ও সহিলিনী যাহারা যে স্থানে ছিল তাহারা বাদশাহকে কহিল হে বাদশাহ তুমি কি নিমিত্ত এমত ভীত হইয়া চিৎকার শব্দ করিলে তখন তাহারদিগকে কহিল যে আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ..।" [শাহনামা (১৮৪৭): বিশ্বেশ্বর দত্ত]

(গ) "অনন্তর মন্ত্রিনন্দন নিদ্রাচ্ছলে শয়ন করিলে পাংস্থ রূপসী একপাত্রে মদ্য

১৬. এখানে দশম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে। ["এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।" দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন]

পুরিয়া রক্ষককে এমত মধুর বাক্যে পান করিতে কহিল যে সে কথা অন্যথা করিতে না পারিয়া তখনি তাহার হস্ত হইতে পাত্র লইয়া পান করিল। এই প্রকারে একবার পান করিলে তাহার পর আর আপত্তি করিল না, মদ্যের উত্তমাস্বাদ পাইয়া আপনি সুরা ঢালিয়া পান করিতে লাগিল। এই প্রকারে চতুর্থ পাত্র পান কালে নুরদ্দীন ছল নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বৃদ্ধের মদ্যপান দৃষ্টে হাস্য করিল তাহাতে শাহ এব্রাহেম লজ্জিত হইল কিন্তু সে লজ্জা ক্ষণিক, পরে সে আরো পান করিতে লাগিল তাহাতে ক্রমের বুদ্ধির চাঞ্চল্য জন্মিল।" [আরব্য উপন্যাস (১৮৫০) : নীলমণি বসাক]

(ঘ) "রাজা এই কথায় স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত অচৈতন্য ভাবে থাকিলেন, তৎপরে স্বভাবস্থ হইয়া কেকয়ী রাণীকে বলিলেন, আরে চণ্ডালি, শ্রীরাম আমার প্রাণাধিক, তাঁকে বনবাস দিয়া এক দিবসও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। অতএব পতিহীনত্ব স্বীকার করিয়াও তুই সপত্নী পুত্রের বনবাস ইচ্ছা করিস্। হায় তোর তুল্য নরাধমা পৃথিবীতে আর নাই। কল্য রাম রাজা হইবেন, অদ্য তাঁহার অধিবাস হইয়াছে। কল্য ভরতকে রাজ্য দিলে লোকে কহিবে আমি স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া এই কর্ম করিলাম, ইহা আমার প্রাণে কখনো সহ্য হইবে না। যে ব্যক্তি নারীর বশ সে অত্যন্ত হেয়।" [নরনারী (১৮৫২) : নীলমণি বসাক]

ঙ) "ময়ূর ও ময়ূরীগণ আহ্লাদে পুলকীত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কদম্ব, মালতী, কেতকী, কুটজ প্রভৃতি নানাবিধ তরু ও লতার বিকশিত কুসুম আন্দোলিত করিয়া নবসলিলসিক্ত বসুন্ধরার মৃদ্গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক ঝঞ্ঝাবায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখাকলাপে আঘাত করিতে লাগিল। কোন দিকে কেকারব, কোন দিকে ভেকরব, গগনে চাতকের কলরব, চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাবায়ু ও বৃষ্টিধারার গভীর শব্দ এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্ঝরের পতনশব্দ। গগনমণ্ডলে আর চন্দ্রমা দৃষ্টিগোচর হয় না" [কাদম্বরী (১৮৫৪) : তারাশঙ্কর তর্করত্ন]

চ) "শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্রশোভায় বিভূষিত, আর, নবযৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। .. তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুম স্বরূপ, নখাঘাতবর্জ্জিত নবপল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্নস্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধুস্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফলস্বরূপ;" [শকুন্তলা (১৮৫৪) : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

ছ) "শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে; অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি, সহকার তরুতলে গিয়া, দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি! ঐখানে খানিক থাক! শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্ত-লতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এইজন্যেই, তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে।" [ঐ]

জ) "ইতিপূর্ব্বে বৎসর খানেক হইবেক, এখানে আর এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহার স্বভাব সাহসিক, চিত্ত দয়ার্দ্র এবং চরিত্র নিতান্ত সাধু, বৃটানি দেশীয় কৃষকবংশে জন্ম, নাম মার্গ্রেট। সে পূর্ব্বে আপন পরিবারবর্গের যৎপরোনাস্তি প্রিয় পাত্র ছিল; তাহাতে সে স্বজাতীয় অধম ব্যবসায়ে থাকিলেও সাতিশয় সন্তোষ এবং পরম সুখ ভোগ করিতে পারিত, কিন্তু সে আপন দোষেই সে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। তাহার প্রতিবাসী একজন অভদ্রাচার ভদ্রসন্তান তাহাকে বিবাহ করিব বলিয়া কতক দিন তৎ-সংবাস হয়।" [পাল ও বর্জিনিয়া ইতিহাস (১৮৫৬): রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন]

ঝ) "এই রাজকন্যা মধ্যে মধ্যে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিতেন, তৎকালে পীতচিহ্নে সুশোভিত শ্বেত অশ্বে আরূঢ়া হইযা মুখাবরণ মুক্ত করিয়া রাখিতেন, এবং কৃষ্ণবর্ণা অশ্বারূঢ়া একশত সহচরী তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গিনী নবীনবয়স্কা ও পরমাসুন্দরী এবং নানা বেশভূষায় ভূষিতা। যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের শোভা হয়, সখীমণ্ডলের মধ্যে রাজদুহিতা সেইরূপ সুশোভিতা হইয়া যাইতেন।" [পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬): নীলমণি বসাক]

ঞ) "মাধবকে দেখিয়াই মালতীর মুখশশী হৃদয়রাগে প্রভাতোদিত রবিমণ্ডলের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইল, স্বেদ পুলকচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ, যেন বিগলিত ও মন্মথোপদিষ্ট বিবিধ বিভ্রম আবির্ভূত হইতে লাগিল। মাধবের মুখনিবিষ্ট বিশাল লোচন তাঁহার স্নেহ ব্যক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু লজ্জাভরে নয়নদ্বয় পক্ষ্মান্তরিত হইতে লাগিল।" কিম্বা "তাঁহার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি যেন মাধবের মনে প্রতিবিম্বিত, চিত্রিত বা উৎকীর্ণ রহিল। পঞ্চশর যেন স্বীয় পঞ্চবিশিখ-দ্বারা মালতীকে মাধবের হৃদয়ে কীলিত করিলেন অথবা চিন্তা তন্তুদ্বারা মালতী যেন মাধবের

অন্তঃকরণে নিবদ্ধ হইলেন।" [মালতীমাধব (১৮৫৮) : কালীপ্রসন্ন ঘোষাল]
—উপরে উদাহৃত গদ্যাংশ সমূহ নমুনা মাত্র। আলোচ্য পর্বে বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদক বহু গ্রন্থের প্রণেতাও নন এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁরা কোনো গভীর প্রভাবও বিস্তার করতে পারেন নি, এঁদের অধিকাংশই একটি বা দুটি রচনার অধিকারী। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির আলোকে এই পর্বের কথাগদ্যের বিশেষত্ব আলোচিত হলো—

এক. বাক্যের দৈর্ঘ্য—বক্তব্যে জটিলতা পরিহারের জন্যই বাক্যগঠনে সরলতা সম্পাদন কথাগদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিষয় ভাবনা যেখানে জীবনের অনুসারী, সেক্ষেত্রে বাক্যের আকার কখনো দীর্ঘ ও জটিল, কখনো ক্ষুদ্র ও সরল। আলোচ্য স্তরে লেখকগণ যেন-তেন প্রকারে ভাবপ্রকাশ করেই বাক্যগঠনের দায়িত্ব শেষ করেছেন। এঁদের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষার বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, ফলে বাক্যগুলি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। আবার পূর্বক, করতঃ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে একদিকে যেমন বাক্যের নমনীয়তা নষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বাক্যের বহরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই ভাবে যৌগিক ও জটিল বাক্য রচনার ফলে এসব রচনায় সংস্কৃতানুসারী দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী বাক্যের সমধিক ব্যবহার ঘটেছে। আর এটি হলো এই পর্বের কথাগদ্যের অন্যতম বিশেষত্ব।

দুই. গদ্যছন্দ—পদ্যের মতো গদ্যেরও ছন্দ আছে এবং যথার্থ ছন্দযুক্ত গদ্যই সাহিত্যিক গদ্য হতে পারে—বিদ্যাসাগরের পূর্বে কোনো বাঙালি লেখকই গদ্যের এই ছন্দস্পন্দ উপলব্ধি করতে পারেননি। গদ্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ধ্বনি-ব্যঞ্জনা অপরিহার্য এবং তা গদ্যের ভাষায় ছন্দস্পন্দ আনয়নের দ্বারাই সম্ভব। শ্বাসপর্ব (breath group) ও সার্থপর্ব (sense group)—এ পদসংগঠনগত আভ্যন্তরীন বিন্যাস সাধনের দ্বারা বিদ্যাসাগর গদ্যে ছন্দ সৃষ্টি করেন। গদ্যের এই বিশেষত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকায় এই স্তরের অনেকেরই গদ্যে কোনো প্রকার ভাষা-সৌষ্ঠব প্রকাশ পায় নি।

তিন. পদসংগঠন—গদ্যের অর্থবোধ পদসংগঠনের উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়টি তিনটি পর্যায়ে আলোচিত হলো—বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার, ক্রিয়াপদের ব্যবহারিক তাৎপর্য ও নামপদের ব্যবহার। অনুবাদকদের হাতে এই পদসংগঠন বা পদবিন্যাস রীতিটি অবশ্যই অভিনবত্ব অর্জন করে, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের হাতে, যে-অর্থে তিনি গদ্যশিল্পী।

ক. বিরাম-চিহ্ন—সুষ্ঠু পদসংগঠন যথাযথ বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার সাপেক্ষ। বিরাম-চিহ্নের অব্যবহারে গদ্যের অর্থোদ্ধার যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তার প্রমাণ রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের কথাগদ্যে। বিরাম-চিহ্ন বাক্যের 'সার্থপর্ব'কে নির্দিষ্ট অ'কার দান করে। বাংলা গদ্যে বিরাম-চিহ্নের এই ব্যবহারিক সাফল্য বিদ্যাসাগরের হাতেই ঘটেছে। এই স্তরের অনেকেই পাশ্চাত্ত্য-রীতির বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার আয়ত্ত করতে পারেন নি। সাহনামায় কমা-র ব্যবহার প্রায়ই পূর্ণচ্ছেদের কাজ করেছে, আবার অর্থজ্ঞাপক বাক্যাংশের শেষে কমা বা সেমিকোলনের ব্যবহারও চোখে পড়ে না। (আরব্য উপন্যাস-এর মূল অংশ)। তারাশঙ্করের কাদম্বরী-র কথোপকথন অংশেও উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার নেই. এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরও ব্যতিক্রম নন। অবশ্য পূর্ণচ্ছেদের পাশাপাশি কমা চিহ্নের অতিরিক্ত ব্যবহার ছাড়া সেমিকোলন ও জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষতা দেখিয়েছেন। সমসাময়িক অনুবাদকদ্বয় রামনারায়ণ ও কালীপ্রসন্ন এক্ষেত্রে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

খ. ক্রিয়াপদের ব্যবহার—সাধুগদ্যের গুরুগম্ভীর রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ, যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার ঘটেছে। আবার কাল-এর বিচারে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে দুর্বলতা (বিশ্বেশ্বর দত্তের উদ্ধৃত গদ্যাংশের মূল অংশ), কথ্য নামপদ ও সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ জনিত ভাষায় পদলালিত্যের অভাব (নীলমণি বসাক-এর কথোপকথন অংশ) এই স্তরের রচনায় প্রায়ই দৃষ্ট হয়। সরল বাক্যগঠনের অভিপ্রায়ে 'হইতে লাগিল', 'করিতে লাগিল' প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়াপদের পুনঃপুনঃ ব্যবহার লক্ষণীয় (পারস্য উপন্যাস ও মালতীমাধব), এর ফলে ভাষার শ্রুতি মাধুর্যও বিনষ্ট হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৈচিত্র্যমণ্ডিত, যেমন—সম্বোধিয়া, জিজ্ঞাসিতেছি প্রভৃতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। অবশ্য কথাগদ্যে ক্রিয়ার এরূপ ব্যবহারে কোথাও কোথাও বাক্যের সাবলীলতা বিনষ্ট হয়েছে।

গ. নামপদের ব্যবহার - ভাষার তন্ময় ও মনোময় লক্ষণগুলো নামপদের প্রয়োগ সার্থকতার উপর নির্ভর করে। সাহনামার অনুবাদক বিশ্বেশ্বর দত্ত সংস্কৃতানুসারী ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মূল ফারসী রচনা থেকে অনূদিত বলে 'তক্তে, বাদসাহ বেগম' প্রভৃতি ফারসী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিভক্তির ব্যবহার কখনো স্বাভাবিক নয় (তাহার+দিগের>

তাহাদিগের স্থলে তাহারদিগের, তাহার+দিগকে > তাহাদিগকে-এর স্থলে তাহারদিগকে প্রভৃতির ব্যবহার), সংখ্যাবাচক বিশেষণাদির ব্যবহারও ত্রুটিপূর্ণ, এর ফলে ভাষার পদলালিত্য নষ্ট হয়েছে। নীলমণিও শব্দব্যবহারে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নি। 'উত্তমাস্বাদ' প্রভৃতি অনাবশ্যক সন্ধি ভাষার জড়তা সৃষ্টি করেছে, বিশেষণের লিঙ্গান্তরও লক্ষণীয়; তিনিও বিভক্তিযুক্ত পদের সরল রূপ দিতে পারেন নি। এই পর্যায়ে শব্দ ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অবশ্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' বিদ্যাসাগরের রচনাতেও বাংলা কথাগদ্য (সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্য) সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করতে পারে নি। ভাবপ্রকাশে ভাষার জটিলতা তখনো রয়েছে। সমাসবদ্ধপদের বহুল ব্যবহার (নবমালিকা-কুসুমকোমলা, আশ্রমললামভূতা কণ্বদুহিতা, সমাগমসম্ভাবনা, অপুত্রতানিবন্ধন, শকুন্তলাসমভিব্যাহারে), আভিধানিক বিশেষণের ব্যবহার (অসম্ভবনীয় নহে, পরস্ত্রী স্পর্শপাতকী, আমার উপরে অক্রোধ হন), বাংলা ভাষার স্বভাববিরুদ্ধ বিশেষণের লিঙ্গান্তর (একাকিনী রহিলাম, সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, শকুন্তলা একেবারে ম্রিয়মানা হইলেন), সম্বন্ধপদের জটিল ব্যবহার (আপনকার নিকট, পরকীয় পুত্রের গাত্র) এবং তুলনামূলক অর্থে বিশেষ বিশেষ অব্যয়পদের ব্যবহার (ঈদৃশ, মাদৃশ, তাদৃশ)-এ বিদ্যাসাগরের কথাগদ্য শ্লথগতিসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পর্যায়েই বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। ভাষায় ছন্দস্পন্দ আনয়ন ছাড়াও তিনিই প্রথম কল্পনাসমৃদ্ধ ভাষাভঙ্গি তৈরি করলেন। এর ফলে বাংলা কথাগদ্য রসসাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে বিশেষণ পদের ব্যবহারিক গুরুত্ব স্বীকার্য, কিন্তু ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ উপমার প্রয়োগনৈপুণ্য, যার ফলে বিদ্যাসাগরের গদ্যে চিত্রকলা দুর্লভ নয়। অনুবাদকদের মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগরই উপমাকে ব্যঞ্জনাগভীর করে তুলেছেন। যেমন "তোমার বাহুলতার স্পর্শে, আমার সর্ব্ব শরীরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ হইতেছে," "রাম হা হতোহস্মি বলিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন," "তুমি চন্দনতরুবোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলে।"

এখন অনুবাদ পর্যায়ের কথাগদ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। আলোচ্য অনুবাদ পর্যায়ের ভাষা সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্য। ভাষার সাধুরূপ লেখকভেদে কথাগদ্যকে কখনো করেছে মন্থর, প্রাণহীন, নিস্পন্দ, আবার কখনো প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ। অনুবাদাশ্রয়ী রচনার বিষয়বস্তুও সমসাময়িক কালের নয়

বরং তা অপরিচয়ের দূরত্ব দিয়ে ঘেরা এবং বাঙালি-জীবন-বহির্ভূত। এর ফলে তৃতীয় স্তরেও বাংলা কথাগদ্য জীবনানুসারী হয়ে উঠতে পারে নি। 'নব-সলিলসিক্ত বসুন্ধরার মৃদ্গন্ধ বিস্তার পূর্বক ঝঞ্ঝাবায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখাকলাপে' (কাদম্বরী)—নব বর্ষা-বর্ণনার এই ভাষা আর যাই হোক জীবনানুসারী কথাসাহিত্যের ভাষা হতে পারে না। আবার শকুন্তলার সৌন্দর্য বর্ণনার ভাষা বা মালতীমাধব-এর হৃদয়রহস্য বিশ্লেষণের ভাষা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। কথাগদ্য অবশ্য অনুবাদের তাগিদে ক্রমশঃ স্বচ্ছন্দ ও বিষয়ানুসারী হয়ে উঠছিল। বিষয়ও অনেক সময় ভাষার ভাবমণ্ডলকে প্রভাবিত করে, তার প্রমাণ সমকালের মৌলিক আখ্যান ধারার ভাষা।

বিশ্বেশ্বর দত্তের গদ্য সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং পদে পদে পদসংগঠনের জটিলতা ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। নীলমণি বসাকের আরব্য উপন্যাস (১৮৫০)—এর ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ, ফলে গল্প সর্বত্র থেমে যায় নি। ইংরেজির গদ্যানুবাদ হওয়ায় আরব্য উপন্যাসের-এর ভাষায় সংস্কৃতানুগত্য সহজেই এড়ান গিয়েছে। কিন্তু তাঁর অপর রচনা পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬)-এর ভাষা অনেক বেশি সংস্কৃতানুসারী। এই দুই গ্রন্থে ভাষার এই পার্থক্যের কারণ বাংলা কথাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, অধিকন্তু পারস্য উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেই বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট সংখ্যক অনুবাদ হয়েছে এবং কাদম্বরী ও শকুন্তলার ভাষার চমৎকারিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর, নীলমণির নরনারী (১৮৫২)-র ভাষার সংশোধক ছিলেন বিদ্যাসাগর, এই সূত্রে বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়েছিলেন গদ্যরচয়িতা নীলমণি। অনুবাদ নয় বলেই পৌরাণিক বিষয়াশ্রয়ী 'নরনারী'র ভাষায় লেখকের মৌলিকতার পরিচয় রয়েছে এবং দশরথের উক্তিতে পিতৃসত্তার স্নেহার্ত রূপটি অপেক্ষাকৃত সরলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বেশ্বর দত্তের তুলনায় নীলমণি বসাক গল্পবলার গদ্যভঙ্গি ব্যবহারে অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনুবাদের জন্যই অনুবাদ করেন, রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। কাদম্বরীতে বহুস্থলেই শব্দ ভাবপ্রকাশে সহায়ক হয় নি। বর্ণনাত্মক গদ্য হলেও তৎসম শব্দের আধিক্যে ও অসম ব্যবহারে ছন্দস্পন্দ ও ভাবব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হতে পারে নি। লেখকের কল্পনাশক্তির অভাবে কথাগদ্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম ভাবের সাবংবতা ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয় নি।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের কালেই পাশ্চাত্ত্য রীতির বিরাম-চিহ্নের

ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের চেয়ে অধিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু পদবিন্যাসের কৌশল আয়ত্তে না থাকায় তিনি ভাষায় ছন্দস্পন্দ আনয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ হওয়ায় রচনায় আভিধনিক তৎসম শব্দের ব্যবহার বিদ্যাসাগরের তুলনায় কম। 'পাল ও বর্জিনিয়া ইতিহাস' কাদম্বরী ও শকুন্তলার ভাষা বৈভবের অধিকারী নয়, কিন্তু এর ভাষা অনেকাংশে চলতি জীবনানুসারী এবং সহজেই বোধগম্য, এখানেই রামনারায়ণের ভাষার অভিনবত্ব।

কালীপ্রসন্ন ঘোষাল রচিত মালতীমাধব-এর সমাস-কণ্টকিত গদ্যথেকে রোমান্স-রসের গুণে এবং বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার-নৈপুণ্যে গল্পরসকে উদ্ধার করা গেলেও ভাষার প্রসাদগুণ অনুভব করা যায় না। কিন্তু কথাগদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এসব রচনা কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কারণ, তৃতীয় স্তরে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কোনো অনুবাদকই বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না এবং কোনো অনুকারী গোষ্ঠীও তৈরী করতে পারেন নি।

বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকে নয়, প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রেরণা থেকেই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বেতাল-পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) নয়, শকুন্তলা (১৮৫৪) ও সীতার বনবাস (১৮৬০) বাঙালির ভাষা-চিন্তায় সোনারকাঠির স্পর্শের মতো কাজ করে। বেতালপঞ্চবিংশতিতে সংস্কৃতানুসারিতা অনেক বেশি, কিন্তু শকুন্তলা ও সীতার বনবাস-এ পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টির অনুকূল সংস্কৃতানুসারিতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার উৎকর্ষ শকুন্তলাতেই প্রকাশ পেয়েছে, সীতার বনবাস-এ অধিক কোনো উৎকর্ষ প্রকাশ পায় নি।[১৭] বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের এই ভাষাশৈলী বাংলা গদ্যে ধ্রুপদী ভাবনার পাশাপাশি রোমান্টিক ভাবনা সঞ্চার করে। বাঙালি পাঠক এই রচনা দুটি পাঠ করেই সর্বপ্রথম সাহিত্যিক গদ্যভাষার[১৮] স্বাদ আস্বাদন করে। ভাবের ভাষামূর্তি-গঠনই তাঁর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া ছন্দস্পন্দ সৃষ্টির দ্বারা জড় বাংলা গদ্যে গতিসঞ্চার তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

বিষয়ানুসারী গদ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা

১৭. গোপাল হালদার/ভূমিকা—বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড/বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি/১৩৭৯/সতের পৃঃ।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিদ্যাসাগর চরিত/১৩৬৫ বঃ/৮ পৃঃ।

স্বীকার করি।[১৯] কেউ কেউ অবশ্য তাঁর জীবনানুসারী ভাষা-রচনার কৃতিত্বও স্বীকার করেন। তখন তাঁদের লক্ষ্য অবশ্যই শকুন্তলা-র তৃতীয় পরিচ্ছেদের গৌতমী ও শকুন্তলার কথোপকথন। কিন্তু সচেতন পাঠকের নিকট এই কথোপকথনের অংশটি শকুন্তলার কথাগদ্যে সর্বাধিক দুর্বল অংশে বলে বিবেচিত হতে পারে। এখানে পূর্বাপর ব্যবহৃত ভাষার ছন্দপতন ঘটেছে, অধিকন্তু চলতি ভাষাশ্রয়ী এই কথোপকথনের গদ্যে শকুন্তলার বর্ণাঢ্য ও ধ্রুপদী রূপটি অটুট থাকেনি এবং সেস্থলে শকুন্তলাও বাঙালিয়ানায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে বিষয়-পরিমণ্ডলের সৌন্দর্য খণ্ডিত হয়েছে।

শকুন্তলা-সীতার বনবাস-কাদম্বরীর কথাগদ্য বর্ণনাপ্রধান হলেও কাদম্বরীর ক্ষেত্রে বর্ণনার জন্যই বর্ণনা, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এই বর্ণনাত্মক গদ্যভঙ্গির সার্থকতা কল্পনার প্রসারণে ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে। এখানেই তারাশঙ্করের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যভঙ্গির পার্থক্য। এরূপ কথাগদ্যভঙ্গি সৃষ্টির মূলে বিদ্যাসাগরের মনন ও রসবোধ সর্বাধিক সক্রিয় ছিল।

যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী হলেও বিদ্যাসাগর যুক্তি ও মননের নিকট কল্পনাকে বিসর্জন দেন নি, গল্পরসকেই তিনি কথাগদ্যের প্রয়োজনীয় রস বলে মেনেছেন। তাঁর সামনে বিশেষ কোনো আদর্শ গদ্যরীতি ছিল না, প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকেই যথার্থ গদ্য সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

নদীপ্রবাহের সঙ্গে ভাষাপ্রবাহ তুলনীয়। পর্বতাশ্রয়ী নদী সমতলভূমিতে অবতরণের পরেই সর্বজন ব্যবহার্য হয়ে ওঠে, অনুরূপ জীবনানুসারী কথাগদ্যের বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল ভাষার পার্বতী অবস্থার অবসান ও সমতলভূমিতে অবতরণ। গল্পরস যেদিন সমকালভিত্তিক আখ্যান-আশ্রয়ী হলো তখন থেকেই বাংলা কথাগদ্যের পার্বতী অবস্থার অবসান ঘটে এবং সংস্কৃতানুসারী সাধু গদ্যরীতি মৌলিক গল্প রচনার পর্যায়ে অধিকতর স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে এই দিকটি বঙ্কিম-পূর্ব মৌলিক রচনার স্তরনামে আলোচিত হচ্ছে।

—চতুর্থ স্তর : বঙ্কিম-পূর্ব মৌলিক রচনার স্তর—

অনুবাদগর্ভ নয়, স্বকপোলকল্পিত রচনার ভাষাই এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। অনুবাদাশ্রয়ী রচনার পাশাপাশি মৌলিক রচনার একটি ক্ষীণ ধারা প্রথমাবধি

১৯. প্রমথনাথ বিশী/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/ [৭৫] পৃঃ

বহমান ছিল, এই ক্ষীণ ধারাটি পাঁচের দশকে এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তী স্তরে বিকাশ লাভ করে। এযুগে বহু লেখকই অনুবাদগর্ভ রচনায় সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। মৌলিক ভাবনা ও বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পসাহিত্য রচনা সম্ভব—এই ধারণা পাঁচের দশকের আগে কারোর মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করে নি। এই মৌলিক রচনার ধারা বিষয় ভাবনার দিক থেকে দুটি পর্যায়ে আলোচিত হলো : এক, একটি কাহিনীমূলক রচনার ধারা; দুই, দ্বিতীয় ধারাটি আখ্যান মূলক রচনার ধারা।

এক. কাহিনী পর্যায়

মৌলিক কাহিনী রচনার ধারায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অভিনবত্বের পরিচয় দেন। ভূদেব বিষয়বস্তুটি ইংরেজি রচনা থেকে গ্রহণ করলেও রচনাটি সম্পূর্ণভাবে অনুবাদগর্ভ নয়।[২০] ফলে মৌলিক রচনা হিসেবেই ঐতিহাসিক উপন্যাসকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই অর্থেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষাকে মৌলিক কথাগদ্যের স্তরভুক্ত করা হয়েছে।
ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন কাহিনী রচনায় অগ্রসর হন, তখন কাহিনী রচনার জগতে তারাশঙ্কর এবং বিদ্যাসাগরের ভাষা শৈলীর একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে। এবং ভূদেবও কাহিনী রচনায় সংস্কৃতপ্রধান সাধুগদ্যের অনুবর্তী হন। তারাশঙ্কর ও বিদ্যাসাগরের বিষয়টা ছিল পৌরাণিক এবং ভূদেবের বিষয়টা ছিল ঐতিহাসিক। তৎকালীন সংস্কৃত প্রধান সাধুগদ্যের অনুবর্তী হলেও ভূদেব ভাষাশৈলীতে বিদ্যাসাগরের তুল্য প্রাঞ্জলতা ও ছন্দস্পন্দ আনয়ন করতে পরেন নি। অপ্রচলিত শব্দ ও সন্ধির অনাবশ্যক ব্যবহারে, স্থিতিস্থাপকতা গুণের অভাবে, জটিল বাক্য রচনায় এবং শব্দের অনাবশ্যক ব্যবহারে ভাষা ভারবহ ও গতিহীন হয়ে পড়েছে এবং ভাষার পদলালিত্য ও স্বাদুতা নষ্ট হয়েছে। এবারে উদ্ধৃতি সমূহ খতিয়ে দেখা যেতে পারে—

ক, "একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।" (সফল স্বপ্ন)

২০. সুকুমার সেন/বাংলা সাহিত্যে গদ্য/১৩৭০ বঃ/৮২পৃঃ।

খ, "কিন্তু অল্পক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুঃসমাচার রোসিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া এক জন সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবাজীর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবা মাত্র শিবাজী সম্মিলিতনেত্রে এবং সহাস্যমুখ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোসিনারা বাক্য দ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।" (অঙ্গুরীয় বিনিময়)

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের অনুধাবনই যথার্থঃ "ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষা বিদ্যাসাগরের রীতির অনুবর্তী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। কচিৎ আভিধানিক শব্দ রচনায় অমসৃণতা আনয়ন করিয়াছে।"[২১] বিদ্যাসাগর কর্মযোগী হলেও রসকলাবিৎ ছিলেন, যদিও সাহিত্যরচনা তাঁর কর্মজীবনের প্রক্ষেপ রূপে অভিহিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভূদেব বিদ্যাসাগরের অনুরূপ রসিকসত্তার অধিকারী ছিলেন না, শিক্ষা ও কর্মসূত্রে কাব্যরস সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিবিড়তা ভূদেবের ছিল না এবং শিক্ষক হলেও ভূদেব বিদ্যাসাগরের মতো পাঠ্যপুস্তক রচনাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি; ফলে ভূদেবের রচনায় ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা সর্বত্র স্বাচ্ছন্দ্য ও ঋজুতা অর্জন করতে পারে নি। তাঁর কথাগদ্যের ভাষা স্থানে স্থানে আড়ষ্ট।

সফল স্বপ্ন-এর উদাহৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজমোহনের স্ত্রী ও দুর্গেশনন্দিনীর রচনাশৈলীকেই[২২] শুধু নয়, ভাষাশৈলীকেও মনে করিয়ে দেয়। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের উদ্ধৃত অংশটিও দুর্গেশনন্দিনীর আয়েসা ও জগৎসিংহের কথা ও দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার কথা মনে করিয়ে দেয়। অধিকন্তু সমসাময়িক গল্প লেখকদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[২৩] সুতরাং বঙ্গদর্শনের পূর্বেকার বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী-নির্ভর-কথাগদ্য যে প্রথম প্রথম বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের কথাগদ্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের কথাগদ্যের বিশেষত্বকে কমবেশি

২১. তদেব।
২২. জ্যোতির্ময় ঘোষ/রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়/১৩৬৯/১১২পৃঃ।
২৩. Bengali Literature—Bankim Rachanavali (English works) Sahitya Samsad. 1969. p.114.

আশ্রয় করেই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা কথাগদ্যের পরিণত রূপটি প্রকাশ পায়।

দুই. আখ্যান পর্যায়

বঙ্কিম পূর্ববর্তী মৌলিক রচনান্তরের আখ্যান সমূহের ভাষাদর্শ অর্থাৎ নববাবুবিলাস, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, আলালের ঘরের দুলাল ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান-এর ভাষাই বর্তমান পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়। লক্ষণীয় যে আলোচ্য পর্যায়ের ভাষা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভবানীচরণের রচনায় প্রথম প্রকাশ পেলেও চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে এই গদ্যের বিশেষ কোনো বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। ষষ্ঠ দশকেই আলোচ্য পর্যায়ের গদ্যের ব্যাপক চর্চা লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য পর্যায়ের কথাগদ্যের কয়েকটি সাধারণ বিশেষত্ব নির্দেশ করা যেতে পারে। এক. এই স্তরের গদ্য ভাষার গাঁথুনি সাধু। ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি ছাড়া কম নয় ও স্থানে স্থানে সমাসের অনাবশ্যক ব্যবহার লক্ষণীয়। অধিকন্তু পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়াপদের জটিল ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। দুই. সমসাময়িক বাঙালি জীবনভিত্তিক রচনা বলেই এই পর্যায়ের গদ্যের চাল অনুবাদাশ্রয়ী ও কাহিনী পর্যায়ের রচনার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল ও নির্ভার। তিন. গদ্যে ছন্দের অভাবে আলোচ্য পর্যায়ের ভাষা গতিহীন। চার. এই পর্যায়ের কথোপকথনের ভাষা কখনো সাধু কখনো বা সাধু-চলতির মিশ্রণ, আদ্যন্ত কথ্য ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। পাঁচ. এই স্তরের গদ্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট নয়। ছয়. দীর্ঘ ও জটিল বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাত. এই স্তরের গদ্য কল্পনাসমৃদ্ধ নয়।

আখ্যান পর্যায়ের প্রথম গদ্যলেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবুর উপাখ্যান, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস প্রভৃতি সমকালাশ্রয়ী রচনা তাঁরই সৃষ্টি। নিম্নোদ্ধৃত অংশ সমূহ তাঁর গদ্যের নিদর্শন রূপে বিবেচিত হতে পারে—

ক. "কর্ত্তাটীর কাছে কি কেহ পারসী কথা বা হিন্দী কথা কহিয়া খোসনাম পাইতে পারেন তিনি অনর্গল অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিন বোট অফিসের মাঝি ছিলেন এক সার্টিফিকেট দেখাইলেন… কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকেট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি করিয়াছে …. কপি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি

কতকাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে মুনশী কহেন উহাতে লেখা আপনি দেখিবার চানতো দেখুন।"

—কর্তার অজ্ঞতার রূপটি এবং মুনশীর ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভাবটি এখানে খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

খ. "খোসামুদেরা কর্ত্তার নিকটে কহেন বাবুদিগের লেখা ঠিক ঠিক ইংরেজও বুঝিতে পারেন না এ সকল আপন পুণ্য প্রকাশ। যেরূপ বিদ্যা হইয়া উঠিল অনুসন্ধান করিলে প্রায় এরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি পাওয়া ভার ......।"

—ব্যঙ্গ এই গদ্যাংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ব্যঙ্গাত্মক গদ্যরচনাতেই ভবানীচরণের অনন্যতা। বিষয়ের উপযোগী শব্দ ব্যবহার এই পদ্যের বিশেষত্ব। চলতি-জীবনভিত্তিক রচনা বলেই তৎসম শব্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না, প্রয়োজনে ইংরেজি, পারশী ও দেশজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভবানীচরণ প্রাঞ্জল গদ্যরচনা করতে পারেন নি। পাশ্চাত্ত্য রীতির বিরাম-চিহ্নের অব্যবহার বাঙলা বাগ্‌রীতির অক্ষম অনুসরণ এবং বাক্যগঠনে বাক্যাংশের অসমঞ্জস্য ব্যবহার—এই দুই কারণে ভবানীচরণের গদ্য জটিল হয়ে পড়েছে। ফলে বাক্য সুস্পষ্ট অর্থবহ হয়ে ওঠে নি, আর বাক্যের গতি হয়েছে মন্থর। কথাগদ্যের রম্যগুণটি তখনো প্রকাশ পায় নি।

হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্সের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ থেকে কয়েকটি অংশ আলোচনার জন্য গৃহীত হলো—

ক. "পরে আমি প্রতিবাসিদের প্রতি ফিরিয়া বলিলাম, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ একটু মাছের ঝোল আনিয়া দিতে পার, তবে বড় উপকার হয়। এই কথাতে একটি যুবতী স্ত্রী ঝোল আনিতে আপন গৃহে দৌড়িয়া গেল কিন্তু সকল বুড়িরা মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, এই প্রকার রীতি ইংরাজ বিবিদের পক্ষে ভাল হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালিদের নিমিত্ত বাঙ্গালিদের রীতি ভাল। পোয়াতিকে ঝোলটোল খাওয়াইলে সে অবশ্য মারা পড়িবে।"

খ. "আমি তাহার (সুন্দরী) সৌন্দর্য্যের বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যথার্থ বোধ হইল। সে অতিশয় রূপবতী ছিল বটে; বিশেষতঃ তাহার বর্ণ গৌর, এবং তাহার যেমন সুন্দর ও বড়চক্ষুঃ তেমন আমি আর কাহারো দেখি নাই। তাহার বদন লাবণ্যযুক্ত, এবং সে সুন্দর রূপে গমন করিত। সুন্দরী কিছুমাত্র অসভ্য না হইয়া বড় লজ্জাবতী ছিল, ...।"

—প্রথমটি হলো দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নির্ভর গদ্য। ফলে ভাষা জীবনানুসারী। দ্বিতীয় অংশটি নারীর সৌন্দর্য বর্ণনামূলক। এক্ষেত্রে লেখিকা উপমাদির জন্য সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর না করে ঘরোয়া সহজ সরল ভাষায় নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।

বলাই বাহুল্য নীতিশিক্ষাদান ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-সার্থকতার জন্য লেখিকা তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এর ফলে, একদিকে যেমন ইংরেজি ও বাইবেলের কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে ভাষাকে যুগোপযোগী ও জীবননিষ্ঠ করবার প্রয়োজনে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত তদ্ভব ও দেশজ শব্দাদির অধিক ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। সমাসবদ্ধপদের ব্যবহার স্বাভাবিক। এই সব কিছু মিলে ভাষা অনেকাংশে নির্ভার হয়েছে। বস্তুতঃ আখ্যানটি খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত। লেখিকা বিদেশিনী বলেই সম্ভবতঃ খাঁটি বাংলায় বিশেষতঃ সরল সাধু গদ্যে আখ্যানটি রচনায় সাহসী হন। ভাব-পরিস্ফুটনের অনুকূল বিরাম-চিহ্নের প্রয়োজনীয় ব্যবহারও এই গ্রন্থে লক্ষণীয়। কিন্তু কল্পনাসমৃদ্ধ ভাষার অভাবে রচনাটি প্রসাদগুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের তুলাল মৌলিক রচনা পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। রচনাটির কথাবস্তুর তুলনায় রচনাটির ভাষার জন্যই প্যারীচাঁদ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর গ্রন্থের অংশ বিশেষ উদাহৃত হলো—

"কতকগুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল, কর্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো—আ মরি! কি চমৎকার বর! যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে চাঁপা ফুল করে খোঁপাতে রাখবে। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল—বুড়ো হউক ছুড় হউক তবু একে মেয়েমানুষটা চক্ষে দেখতে পাবে তো? সেও তো অনেক ভাল।" পৃঃ ৭৫

—কথোপকথন অংশে খাঁটি মুখের ভাষা ব্যবহৃত হলেও বর্ণনাংশে সাধু ভাষা ও পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষার গাঁথুনিটি অবশ্যই সাধু। চলতি জীবনের বাতাবরণ সৃষ্টিই প্যারীচাঁদের ভাষা-ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য। একদিকে চরিত্রোপযোগী ভাষা ব্যবহারের দ্বারা সার্থক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস (ঠকচাচা ও ঠকচাচী), অন্যদিকে ভাষাকে সর্বার্থসাধক রূপদানের জন্য কথ্য-ভাষা নির্ভর জীবনানুসারী ভাষা ব্যবহারের প্রয়াস এই আলালী গদ্যভঙ্গিতে

প্রকাশ পেল। বস্তুতঃ বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচনের ব্যবহারে এবং প্রচুর দেশজ শব্দ ও প্রয়োজনীয় ফারসী শব্দের ব্যবহারে আলালী ভাষা জীবন্ত ও জীবনানুসারী হয়ে উঠেছে। ভাষাও অনেকাংশে নির্ভার। প্যারীচাঁদ কথামূলক বাংলা স্বচ্ছন্দ গদ্যের প্রথম শিল্পী হলেও যথার্থ সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা নন। কারণ ভাব ও ভাষা কল্পনাসম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

রেভা. লালবিহারী দে-র চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ভাষা-প্রকৃতির দিক থেকে এক অর্থে বিশিষ্ট রচনা। প্রথমেই তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক—

ক. "জলের নির্ম্মলতা লঘুতা হেতু চন্দ্রপুরের প্রায় সকল লোক উহাতে স্নানাদি করেন। তাহার দুই ঘাট। একটিতে পুরুষ ও একটিতে যোষাগণ অবগাহন করেন।" খ. "ঐ সকল সরোবর বসন্তকালে অতি মনোনীত ও হর্ষোৎপাদক স্থান হয়।" গ. "পরে বৃষ্টি নিবৃত্তি হইলে অস্তগতোন্মুখ রবির কিরণ দ্বারা শস্যক্ষেত্র হাস্য করিতে লাগিল। দূরস্থ বৃক্ষগণের উচ্চতম শাখা পল্লবাদি স্বর্ণপ্রায় সুদৃশ্য হইল।"

—খ্রীষ্টধর্মের প্রচার উদ্দেশ্যে আখ্যানটি রচিত হলেও লেখক ভাষায় সব সময় সরলতা সম্পাদন করতে পারেন নি। ভাষার গাঁথুনিটিও সাধু। লেখকের বিশেষ প্রবণতাই সংস্কৃতপ্রধান সাধু ভাষারীতির দিকে। বাংলায় অচলতি সংস্কৃত শব্দ ও অনাবশ্যক সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারে (অস্তগতোন্মুখ, যোষাগণ) ভাষার প্রাঞ্জলতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'শস্যক্ষেত্র হাস্য করিতে লাগিল'—এ ধরণের বাগ্‌ভঙ্গির ব্যবহার সাধু গদ্যে অপেক্ষিত নয়। বিশেষণাদির ব্যবহার সুষ্ঠু নয় বলে ব্যঞ্জনাসৃষ্টির প্রয়াস সার্থক হয় নি। বাক্যগঠনে জড়তা থাকায় ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার বিশেষতঃ কমার প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্থক হয় নি। বস্তুতঃ এই কথাগদ্য সংস্কৃতপ্রধান সাধুভাষারই নিকট আত্মীয়।

লক্ষণীয় বিষয় যে, একক সাধনা রূপেই আলোচ্য পর্যায়ের বিভিন্ন লেখকের গদ্য বেঁচে আছে, কোনো সার্থক অনুসারী লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে নি এই সূত্রে। গদ্য এবং সাহিত্যিক গদ্য—এ দুয়ের পার্থক্য এই পর্যায়ের গদ্যলেখকদের রচনায় স্পষ্ট নয়। এঁদের রচনার বিক্ষিপ্ত অংশ সমূহ বাদ দিলে সামগ্রিক ভাবে ভাষা রসসৃষ্টির বাহন হয়ে ওঠে নি। স্পন্দিত ও সাবলীল গদ্যভঙ্গির পরিচয় এসকল রচনায় নেই বললেই চলে। বস্তুতঃ ভাষা সৃষ্টি ব্যক্তি-প্রতিভা-সাপেক্ষ এবং এর পরিচয় আছে অনুবাদ পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের রচনায়। আর মৌলিক

গদ্য রচনার পর্যায়ে রসসাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী গদ্য বিদ্যাসাগরের পর বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায়।

বলাই বাহুল্য পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রের সীমানার বাইরে জীবনানুসারী কথাগদ্যের প্রথম আভাস পাই ভবানীচরণের নববাবুবিলাস-এ। কিন্তু ভবানীচরণ ঈশ্বরগুপ্তের মতো সাহিত্যে কোনো গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেন নি। ফলে সৃজ্যমান কথাগদ্যের ধারায় ভবানীচরণের ভাষার কোনো যথার্থ অনুসরণ ঘটেনি। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। কথাবস্তুর বিচারে "সাধারণ বঙ্গভাষী সমাজের জন্ত ইহার কোন বাণী বা আবেদন ছিল না।"[২৪] ফলে তাঁর এই রচনার পাঠক-সমাজ ছিল সীমিত। অবশ্যই ম্যালেন্সের গদ্য শব্দচয়নের দিক থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কিন্তু বাংলা গদ্য ভাষার নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি, তাল বা ছন্দ তিনি অনুসরণ করতে পারেন নি। এর ফলে বিরাম-চিহ্নের প্রয়োজনীয় ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর গদ্য মন্থর হয়ে পড়েছে। কথ্য বা চলিত ভাষার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর এই গদ্যের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি কথাগদ্যের গাঁথুনিকে কথ্যভিত্তিক করে তুলতে পারেন নি। এই আলালী গদ্য পরবর্তী কালে কথামূলক রচনার স্থায়ী প্রকাশ মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে নি, যদিও বাংলা গদ্যের বনিয়াদটিকে দৃঢ় করবার জন্ত প্যারীচাঁদ মাটির কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন—এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। লালবিহারীর রচনার ভাষা প্যারীচাঁদের পরবর্তী হলেও আলালী ভাষার মতো নির্ভার ও সরল নয়। পূর্ববর্তীদের তুলনায় লালবিহারীর ভাষা অভিনবত্বহীন ও বিশেষত্ববর্জিত। সংস্কৃতপ্রধান সাধুভাষার দিকেই তাঁর নজর ছিল।

বস্তুতঃ এই পর্যায়ের গদ্যের উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্কিম-সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের কথাগদ্যের উল্লেখ করা যায়, কিন্তু এঁদের গদ্যও খুব বেশি চমকপ্রদ নয়। তারকনাথ বঙ্কিম-সমসাময়িক কালে বিষয়ভাবনায় মৌলিকতার পরিচয় দিলেও সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করলেও এই ভাষা নিষ্প্রভ ও স্তিমিত এবং কল্পনাসম্পৃক্ত না হওয়ায় এই ভাষা শিল্পিত

২৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়/পরিচিতি—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৩৬৫ বঃ/ ।৶০ পৃঃ।

গদ্যভঙ্গি বা Prose Art হয়ে উঠতে পারে নি। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমপূর্ববর্তী ও বঙ্কিম-সমসাময়িক আখ্যানে বিষয়ানুগ বর্ণনাকেই পাওয়া যায়, বাস্তবের বহিরঙ্গ বিশ্বস্ততাই এসব ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে। কল্পনার প্রসারণ না ঘটায় কথাগদ্যে নরনারীর জীবনের কাব্যময় সত্তার অভিব্যক্তি সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয় নি ব্যঞ্জনাধর্মী ও ইঙ্গিতময় গদ্য রচনা। একালে বঙ্কিমচন্দ্রই অপ্রতিদ্বন্দ্বী গদ্যলেখক। ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শে গদ্য শুধু ধন্য হলো না ধনীও হলো। বর্তমান আখ্যান পর্যায়ের ভাষাই প্রতিভার স্পর্শে কল্পনাসম্পৃক্ত ও রসসমৃদ্ধ হয়ে নভেল রচনার যথার্থ প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল তারই পরিচয়বহ।

নক্শা নভেল-জাতীয় রচনা না হলেও রচয়িতার সমসাময়িক জীবনভিত্তিক রচনা। এই ধরণের রচনার প্রধান বিশেষত্ব হলো সমকালীন মানুষের নঙর্থক দিক সমূহের বিদ্রূপাত্মক পরিচয় প্রদান। সামাজিক মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োজনে শব্দ-সৃষ্টি হুতোমী ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। নক্শার ভাষার এই বিশেষত্ব কথাসাহিত্যের ভাষারও অন্যতম গুণ। আলোচ্য প্রসঙ্গে হুতোমী ভাষার নিদর্শন গৃহীত হলো—

ক. "টুলো পুজরি ভটচাজ্জির কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেছে, আজ তাদের বড় ত্বরা·····। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, একসচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েচে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না··· ।"

খ. "পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানে কাটান। ছুকুর ব্যালা কেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, দশ বারো জন মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখলেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্তিমান মা! বিসর্জন, বারোইয়ারী, খ্যামটানাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রির দরুণ গা ঢাকা দেন।"

মৌলিক কথাগদ্যের বিকাশে হুতোমী গদ্যরীতিকে সেকালে কাজে লাগানো হয় নি। সাধু কথাগদ্যের পাশাপাশি এই প্রথম কথ্য বা চলিত কথাগদ্যের ব্যবহার দেখা গেল, যদিও এই ভাষাভঙ্গির অনুসারী কোনো গোষ্ঠী গড়ে ওঠে

নি। প্রসঙ্গতঃ আমরা হুতোমী ভাষার চারটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব নির্দেশ করতে পারি : এক. নকশাটি কথ্য গদ্যভঙ্গিতে রচিত। চলতি শব্দের ব্যবহার বিশেষতঃ বহু বিচিত্র দেশজ শব্দের ব্যবহার এই রচনাটিতে দেখা যায়। বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার ভাষাকে জীবন্ত ও সাবলীল করেছে। দুই. ভাবের প্রয়োজনানুরূপ বাক্য ব্যবহার প্রধান লক্ষণীয় বিষয়, বাক্য কখনো ক্ষুদ্র, কখনো দীর্ঘ। তিন. উপমা ও বিশেষণাদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে শানিত করেছে, এ-সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চার. সার্থক কথাগদ্য সৃষ্টিতে সহায়ক ভাষার ইঙ্গিতময়তা হুতোমের ভাষাশৈলীতে লক্ষণীয়-ভাবে প্রকাশ পায়। চরিত্র সৃষ্টি ও ভাব পরিস্ফুটনের উপযোগী উপমা ব্যবহারের নৈপুণ্যে ভাষা প্রাণবন্ত হয়েছে এবং গদ্যভঙ্গি প্রাঞ্জল হয়েছে। বস্তুতঃ জীবনানুসারী ভাষার বিচারে হুতোমী ভাষা সামগ্রিক ভাবে সামাজিক কথাচিত্রেরই ভাষা। তাঁর শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে ভাষার অন্তর্নিহিত চিত্রনির্মানশক্তিও প্রকাশ পেয়েছে।

—পঞ্চম স্তর : পরিণত অবস্থা—

বঙ্কিম পর্যায়

ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শেই লেখনী যথার্থ ভাষা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। এ সত্য বাংলা কথাগদ্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিদ্যাসাগরের রচনায় পরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা কথাগদ্যে সাধুরীতির প্রাধান্য ছিল। এই সাধুরীতির পাশাপাশি হুতোমের রচনায় কথ্যরীতির প্রকাশ ঘটে, তারো আগে কোনো কোনো সামাজিক নাটকে এবং মধুসূদনের প্রহসনে। আবার, সাধুরীতিও দুটি ধারায় প্রবাহিত ছিল, একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত প্রধান সাধুগদ্য, দ্বিতীয়টি তদ্ভব ও দেশজ শব্দ প্রধান সরল সাধুগদ্য। প্রথম ধারাটি তারাশঙ্কর ও বিদ্যাসাগরের রচনায় উৎকর্ষ লাভ করে, দ্বিতীয় ধারাটি বঙ্কিম-পূর্ববর্তী মৌলিক আখ্যান রচয়িতাদের হাতে বিকাশ লাভ করে। বাংলা কথাগদ্যের এই অবস্থা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।[২৫] পরবর্তী কালেও তিনি ভাষার মধ্যকার এই পার্থক্যের অবসান চেয়েছিলেন এবং

২৫. Bengali Literature. op. cit. p. 107-114.

বাংলা গদ্যের দুই সাধু রীতির যথার্থ সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন।[২৬] তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, গদ্যে গতিসৃষ্টির জন্য যেমন কাদম্বরীর ভাষাকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না, তেমনি সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং অন্তর্লীন রোমান্টিক ভাব পরিস্ফুটনও আলালের তদ্ভব ও দেশজ শব্দ-প্রধান সরল সাধু ভাষার দ্বারা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ বাংলা কথাসাহিত্যের উপযোগী গদ্য ভাষা নির্মাণের কথা মনে রেখেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, কেননা প্রসঙ্গতঃ তিনি কথামূলক রচনার ভাষার কথাই উল্লেখ করেছেন, প্রবন্ধের কথা বলেন নি।

লক্ষণীয় বিষয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথামূলক গদ্যের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন এবং প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল-এর ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও বিদ্যাসাগরের কথামূলক রচনার ভাষারীতি তথা সংস্কৃতপ্রধান সাধু গদ্যরীতিকেই উপন্যাসের প্রকাশ মাধ্যমরূপে প্রথম দিকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ "বিদ্যাসাগরী রীতির ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি গড়ে উঠেছে।"[২৭]

[মৃত্যুঞ্জয়ের সাধুগদ্য + ছন্দস্পন্দ ও ছেদচিহ্ন > বিদ্যাসাগরী গদ্যভঙ্গি,] + অন্তর্লীন রোমান্টিক চেতনা > বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্য

কথাগদ্যের সামগ্রিক বিশিষ্টতা রম্যভাব সৃষ্টিতে এবং নরনারীর জীবনবোধের যথাযথ পরিস্ফুটনে। অবশ্য এ সব কিছুই ব্যক্তিপ্রতিভা সাপেক্ষ। লেখকমনের অন্তর্লীন রোমান্টিক চেতনার সুষ্ঠু প্রতিসরণেই ভাষা লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরে এই প্রয়াস ছিল বহিরঙ্গ নির্ভর, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে তা অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত হয়। এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা সৃষ্টিতেই প্রথম অনুভূত হয়;[২৮] বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠে শ্রোতৃবর্গ যে আবিষ্ট ও বিস্মিত হয়েছিলেন তার প্রধান কারণই হলো দুর্গেশনন্দিনীর গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তি। গল্প ও ভাষার এই মোহিনী শক্তির কথা উল্লেখ করেন মধুসূদন স্মৃতিরত্ন। চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নও দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার মাধুর্যের কথা স্বীকার করেন। এঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির সঙ্গে এঁরা পরিচিত ছিলেন না—একথা আমরা বলতে পারি না।

২৬. বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র : প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

২৭. প্রমথনাথ বিশী/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/[১০৯] পৃঃ।

২৮. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু > সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাঃ)/কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র/১৯৬৪/৮৩ পৃঃ।

কথাগদ্যের স্পন্দিত গতিশীল রম্য ও প্রাণবন্ত রূপটির সঙ্গেই ভাষার আলোচ্য মোহিনী শক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। বস্তুতঃ ভাষার এই মোহিনী রূপ লেখক মনের অন্তর্লীন রোমান্টিক চেতনা-সঞ্জাত। এর তুলনা মিলবে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাবপ্রকৃতির স্বরূপ বিচারে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগের বাংলা কথাগদ্য মোহিনী শক্তি অর্জন করতে পারে নি। সম্ভবতঃ এই দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষাকে 'somewhat nerveless language'[২৯] বলে অভিহিত করেন।

ভাষার গতিশীলতা, রোমান্টিক পরিবেশের উপযুক্ত শিহরণ ও চমক সৃষ্টি শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল এবং তা লেখকের বিশিষ্ট সৃষ্টি সামর্থ্যের পরিচয়বহ। কথামূলক গদ্যে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি ও নমনীয়তা আনয়নের দ্বারাই কবিত্ব সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং সামগ্রিক ভাবে একেই আমরা ভাষার সৌন্দর্যসৃষ্টি বলে অভিহিত করতে পারি। এই সব কিছুই পরিণত কথাগদ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। বাংলা কথাগদ্যের ক্ষেত্রে এই পরিণতি স্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্রে। লক্ষণীয় যে, রোমান্টিক কবিসুলভ মনোভাবই বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রাবস্থার কবিতাসমূহ স্মরণ করতে পারি। উপন্যাসের কথাবস্তুতে রোমান্স সুলভ আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং ভাষায় রোমান্সের দীপ্তি ও গৌরব উভয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। এ শুধু রোমান্সধর্মী রচনার ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় নয়, তাঁর বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি সমসাময়িক-জীবন-নির্ভর রচনা সমূহের ভাষাও কল্পনাসম্পৃক্ত হয়ে যথার্থ রসসাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষার কয়েকটি সাধারণ বিশেষত্ব নির্দেশ করা যায়—এক. সরল ও ক্ষুদ্র বাক্য রচনার প্রয়াস, দুই. গদ্য ক্রমশই নির্ভার হয়ে উঠেছে এবং বাগ্‌ভঙ্গির চালও দ্রুততর, তিন গদ্য সরস, কমণীয় ও স্থিতিস্থাপক, চার. ভাষা ভাবকে অতিক্রম করে না, পাঁচ. সরল সাধুরীতির ব্যবহার, ছয়. বিষয়-ভেদে ভাষা প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন সাত. কথোপকথনে সাধু-চলতির মিশ্রণ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার এই বিশেষত্ব অর্জন প্রাঞ্জলতা আনয়ন ও সরলতা সম্পাদনের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের ফলেই সম্ভব হয়েছে[৩০]।

২৯. Bengali Literature. op. cit.p. 109.

৩০. ক. দ্রঃ জগদীশনাথ রায়কে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর লিখিত ইংরেজি পত্রটি [Bankim Rachanavali (English works). op. cit. p. 162.]

খ. দ্রঃ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন এবং সহজ রচনাশিক্ষা।

রচনার ক্ষেত্রে 'সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা'—এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি।

এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যটিও কাজ করেছে। যুক্তিবাদী মনের অধিকারী ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কথাবস্তুর বিন্যাসে শৃঙ্খলারক্ষা ও অর্থযুক্ত সুবিন্যস্ত অনুচ্ছেদ রচনা সম্ভব হয়েছিল। ফলে ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারে এবং ভাষা ভাবানুগ হয়ে ভাবের সাবয়বতা সাধন করে।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার গতিপ্রকৃতি আলোচনার জন্য তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো। এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক-জীবন-ভিত্তিক রচনাসমূহের ভাষার আলোচনার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ জীবনানুসারী শিল্প নভেল-এর ভাষার আলোচনাই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

ক. "একদা চৈত্রের অপরাহ্লে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল; মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুষ্ক করিতে লাগিল, এবং সদ্যশয্যোত্থিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধূত করিতে লাগিল।" [রাজমোহনের স্ত্রী]

খ "অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্যপথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্য সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল।" [দুর্গেশনন্দিনী]

গ. "পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল।" [বিষবৃক্ষ]

ঘ. "দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী।" [ঐ]

৬. "রোহিণী চাহিয়া দেখিল—নীল, নির্ম্মল, অনন্তগগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুন শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।" [কৃষ্ণকান্তের উইল]

উদ্ধৃত অংশসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্যের সামগ্রিক বিচারে যথেষ্ট না হলেও নমুনা স্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। লক্ষণীয় বিষয় যে, রাজমোহনের স্ত্রী-র পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ক্রমশই পরিচ্ছন্ন, সরল ও নির্ভার হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে স্পন্দিত গদ্য। এরূপ গদ্যসৃষ্টিতেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থকতা। বিদ্যাসাগরে ভাব ভাষার অধীন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে ভাব আর ভাষার অধীন নয়, বরং ভাষাই ভাবের অধীন। বঙ্গদর্শন পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশেষত্ব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। বিশেষতঃ সমসাময়িক জীবনাশ্রয়ী রচনাসমূহের ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার হ্রাস পায়। এই পর্যায়ে সংস্কৃত প্রধান সাধু গদ্য ক্রমেই সরল সাধু গদ্যের অবয়ব লাভ করে। বিষয়বস্তুগত বাতাবরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাপ্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিষবৃক্ষ-এ এসেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্য স্বকীয়তা অর্জন করে।[৩১] এর দুটি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করা যায়—এক, দুর্গেশনন্দিনী গল্পের মোহিনী শক্তি বিষবৃক্ষ গল্পের ছিল না, বিষবৃক্ষ সমসাময়িক-বাঙালি-জীবন-ভিত্তিক হওয়ায় ভাষাও সমসাময়িক জীবনবোধের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছে, দুই, বিষবৃক্ষ-পূর্ব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সৌন্দর্যসৃষ্টি, এই সৌন্দর্যসৃষ্টির অনুরোধেই শব্দের অসাধারণত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।[৩২] কিন্তু বিষবৃক্ষ পর্যায়ে সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়, নরনারীর জীবনের অন্তর্নিহিত সমস্যাসমূহের রূপায়ণই প্রাধান্য লাভ করে। ফলে সরলতা ও স্পষ্টতাই রচনাশৈলীর বিশেষত্ব হওয়ায় ভাষাও নির্ভার ও গতিশীল

৩১. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/১৩৭০ বঃ/২১৬ পৃঃ।
৩২. প্রমথনাথ বিশী/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/ [১১৬] পৃঃ।

হয়। বস্তুতঃ বিষয়ভেদে, কালভেদে এবং স্বকীয়তা অর্জনের সঙ্গে সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহারে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত আমরা একটি পরিসংখ্যানের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি—

আলোচ্য পরিসংখ্যানটি নিম্নলিখিত উপন্যাস সমূহের প্রথম একশত শব্দে তৎসম-তদ্ভব-সমাসবদ্ধপদ-উপসর্গযুক্তপদের পর্যালোচনা—

	রাজমোহনের স্ত্রী	দুর্গেশনন্দিনী	কপালকুণ্ডলা	বিষবৃক্ষ	চন্দ্রশেখর	কৃষ্ণকান্তের উইল	রাজসিংহ (৪র্থ সংস্করণ)	আনন্দমঠ	সীতারাম
	?	১৮৬৫	১৮৬৬	১৮৭২	৮৭৫	১৮৭৬	১৮৯৩	১৮৮২	১৮৮৬
তৎসম	৭১	৫৯	৬০	৫৮	৪৭	৪৭	৬১	৪৬	৫১
তদ্ভব	৪	১৩	১৭	১০	১৭	১৫	১৩	১০	১৭
সমাসবদ্ধপদ	২০	১৯	১৪	৭	১৭	৪	৫	৬	৩
উপসর্গযুক্ত পদ	১৬	১৬	৭	৩	৫	৯	১৩	৩	২

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভাষা-বিচারেও প্রদত্ত পরিসংখ্যানটিকেই আমরা চূড়ান্ত বলে মনে করি না। কিন্তু অন্যান্য পরিসংখ্যানের মতো আলোচ্য পরিসংখ্যানটিও বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্যের প্রকৃতির উপর আলোক সম্পাতে সাহায্য করবে। প্রদত্ত পরিসংখ্যানটি থেকে আমরা সাধারণ ভাবে নিম্নরূপ কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি—

এক. অসম্পূর্ণ ও পরিত্যক্ত রচনা রাজমোহনের স্ত্রী-তে তৎসম শব্দের ব্যবহার পরবর্তী অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় সর্বাধিক। একই ভাবে সমাসবদ্ধ শব্দ ও উপসর্গযুক্ত শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারও অধিক। ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা সমূহে শব্দ ব্যবহারে অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সমসাময়িক বাঙালি জীবন ভিত্তিক রচনায় এই প্রবণতা হ্রাসপ্রাপ্ত। এই সকল রচনায় সরলতা সম্পাদনই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাশৈলীর বিশেষত্ব।

দুই. তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। নভেল জাতীয় রচনায় লেখক প্রাঞ্জলতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই দেশজ শব্দের ব্যবহারে অধিক উৎসাহ বোধ করেছেন। ইতিহাসাশ্রয়ী রচনায় বিষয়ের ভাব গাম্ভীর্য বজায় রাখবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ভাবে দেশজ শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে গিয়েছেন, বিশেষতঃ বর্ণনাংশে।

আর বিষবৃক্ষ-পূর্ব রচনা সমূহে ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সংযোগমূলক ধাতু ও যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। বিষবৃক্ষ-এ মৌলিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের তাৎপর্য লক্ষণীয়। এই সবই বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্যের বিবর্তনের ধর্মটি জানিয়ে দেয়। এই বিবর্তনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভাষার প্রাঞ্জলতা আনয়ন।

এছাড়াও বিষয়ের প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যের দৈর্ঘ্য অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন, ফলে তাঁর উপন্যাসের ভাষা ক্লান্তিকর ঠেকে নি। অধিকন্তু বাংলা কথাগদ্যে স্থিতিস্থাপকতা গুণটি আনয়ন করে তিনি বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করেন। উপন্যাসের বিষয়-বিস্তার ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বহতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিষয়ানুগ ও ভাবানুগ শব্দ আহরণ ও তার ব্যবহারের বৈচিত্র্যে এবং ভাবের সাবয়বতা সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্য সর্বগ হয়ে ওঠে এবং স্থিতিস্থাপকতা গুণ অর্জন করে[৩৩]। আর, অন্তর্লীন রোমান্টিক চেতনার প্রভাবে বঙ্কিমী কথাগদ্য নমনীয় হয়েছে ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ধারণ

৩৩. ভবতোষ দত্ত/পূর্ববৎ/২৩১ পৃঃ।

করেছে, যা বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের কথাগদ্যে লক্ষ্য করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্য সম্পর্কিত এ সবকিছুই বঙ্গদর্শন পর্যায়ে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করেই "বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"[৩৪]

বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশৈলীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। আর, কথাগদ্যের ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাশৈলীর মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বঙ্কিমী ভাষাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল এবং এই কথাগদ্য নভেল রচনার উপযোগী প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠল। লক্ষণীয় যে, বিষবৃক্ষের সূচনা বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই। এই কারণেই বাংলা কথাগদ্যের বিকাশ প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন পত্রিকার অবতারনা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা "আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব ঐ পত্রিকায়। এর পূর্বে বাঙালির আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নি।"[৩৫]

জীবনানুসারী সাহিত্যের প্রকাশ-মাধ্যম-উপযোগী জীবনানুসারী ভাষা রচনাতেই কথাগদ্যের বিশেষত্ব। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সিদ্ধি বিষবৃক্ষে, কী কথাবস্তুতে, কী ভাষা সৃষ্টিতে। বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভাষারীতির প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটল। বিদ্যাসাগর প্রমুখের কথাগদ্যের পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগদ্যের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ বাংলা কথাগদ্যকে একটি সার্বিক রূপদান করে। এটি বস্তুতঃ বাংলা কথাগদ্যের পরিণত অবস্থারই সূচক। আর, উপমাগর্ভ ভাষা রচনার ফলেই এই কথাগদ্য চরিত্রদ্যোতক হয়ে উঠেছে। নরনারীর চরিত্রায়ণই নভেল-এর শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব, ফলে চরিত্রের রহস্য উন্মোচন এই শিল্পশৈলীর লক্ষ্য হয়ে উঠায় নভেল-এর ভাষাকেও চরিত্রদ্যোতক হয়ে উঠতে হয়, এখানেই নভেল-এর ভাষার তথা কথাগদ্যের সর্বার্থসাধকতা। এই পূর্ণতা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথে।

রবীন্দ্র পর্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই কথাগদ্যের পরিণত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে এবং এই গদ্য বাংলা কথাসাহিত্যের যথার্থ প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই গদ্যের আরো বিকাশ প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন অবশ্যই ছিল এবং এখনো আছে। কারণ নদীর মতো একটি জীবন্ত

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বঙ্কিমচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য/১৩৬২ বঃ/৬ পৃঃ।
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শরৎচন্দ্র - প্রবাসী/আশ্বিন, ১৩৩৮ বঃ/৮০৬ পৃঃ।

ভাষাও স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবন্ত ভাষাকে প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে কালোপযোগী হয়ে উঠতে হয়। ভাষার এই বিকাশ ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং এই বিকাশ কোনো এক জন বিশিষ্ট লেখকের ভাষার অনুবর্তী হয়ে পড়ে এবং কোনো এক জনের ভাষাশৈলীকে মেনে নিয়েও নতুন এক ভাষাশৈলীর জন্ম দিতে পারে। বাংলা কথাগদ্যের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ এই নতুন ভাষাশৈলীর স্রষ্টা।

লক্ষণীয় বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগে আবির্ভূত হন এবং বঙ্কিমযুগেই সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর এই খ্যাতি অর্জন বাংলা সাহিত্যের কোন একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অধিকন্তু বাংলা গদ্যের শক্তি, সীমা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিরীক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। তাঁর এই পরীক্ষা পরবর্তী কালেও অব্যাহত ছিল। "এইসব পরীক্ষা চালাতে গিয়ে পর্বে পর্বে তিনি নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তন করেছেন। তৎসত্ত্বেও স্থূলবিচারের উদ্দেশ্যে তাঁর গদ্য রচনাকে তিন অতিপর্বে ভাগ করা চলে। প্রথম থেকে আরম্ভ করে চোখের বালি, নৌকাডুবিতে এসে একটা পর্বের শেষ হয়েছে।"[৩৬] আমাদের আলোচনাও এই পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। প্রসঙ্গতঃ আমরা প্রমথনাথ বিশীর অভিমতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেই মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি। তিনি বলেছেন: "বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের উপরে যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা অল্পবিস্তর সকলের রচনাতেই পড়েছে— রবীন্দ্রনাথের প্রথম অতিপর্বের রচনাও মুক্ত নয়— যদিচ বঙ্কিমের গদ্যরীতির ছাঁচ ও ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্বকীয়তাও দেখা দিতে সুরু করেছে।"[৩৭] বাংলা কথাগদ্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই স্বকীয়তার পরিচয় দানে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

পরিণত বয়সে লিখিত 'বাঁশরি' নাটকে (১ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক) তিনি বলেছেন: "সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।" স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাষার সৌকর্যসাধনের কথা বলেছেন এবং রসসৃষ্টিই এই সাধনার প্রধান লক্ষ্য। এই রসসৃষ্টি মহৎ সাহিত্যিকগণের সাহিত্যরচনারও লক্ষ্য। বিভিন্ন সাহিত্যিকের মধ্যে এই রসসৃষ্টি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই রসাত্মক বাক্যসৃষ্টির প্রয়াস সম্ভব হয়েছে অলঙ্কারের

৩৬ ও ৩৭. প্রমথনাথ বিশী/পূর্ববৎ/যথাক্রমে [১৭৪] ও [১৭৫] পৃঃ।

বিচিত্র ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিত্বগুণ[৩৮] "রচনার বস্তু ও বাচন দুয়েতেই। এই শ্রেণীর রচনার কথা বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতেই পারতেন না।" এর কারণ হলো রবীন্দ্রগদ্যের স্বাধর্ম্য এবং এই ধর্মটি হলো কাব্যধর্ম। এখানেই রবীন্দ্রনাথের কথাগদ্যের স্বকীয়তা। এছাড়াও আছে অন্যান্য বিশেষত্ব যা রবীন্দ্রনাথের কথাগদ্যকে করেছে মহনীয়। তা হলো তার বিশেষণের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য এবং লীলায়িত ভাগ্‌ভঙ্গি। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে:
"বাংলাদেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্য্যাস্ত—কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা।" (ছিন্নপত্র)
কথাগদ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথ "যোগ করে দিলেন নমনীয়তা, কমনীয়তা ও কাব্যশ্রী যার ফলে অন্তর্লোকে ও বহির্বিশ্বে সঞ্চরণের ক্ষমতা হঠাৎ বেড়ে গেল ভাষার।"[৩৯] অধিকন্তু শব্দের আভিধানিক অর্থকে নয়, বিভিন্ন অর্থাভাসকে ব্যবহার করে[৪০] রবীন্দ্রনাথ ভাষাশৈলীকে ব্যঞ্জনাধর্মী এবং ধনী করে। এর ফলেই তাঁর কথাগদ্যের ভাষা চরিত্রসৃষ্টির উপযোগী হয়ে উঠল, এবং শব্দের বিভিন্ন অর্থাভাসকে গ্রহণ করার ফলে ভাষায় অলঙ্কারের বিচিত্র ব্যবহারও সম্ভব হলো। এ ছাড়া কল্পনাশক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগও এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। বস্তুতঃ জীবননিষ্ঠ কল্পনা ছাড়া জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ফলে নরনারীর চরিত্রায়ণও অসম্পূর্ণ থাকে।
চোখের বালি রচনার আগমুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথাগদ্যের প্রধান ধারাটি ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে পুষ্টিলাভ করে। আরেকটি ধারা কথামূলক বৃহৎ রচনা (করুণা-বউঠাকুরানীর হাট-রাজর্ষি-মুকুট)-র মধ্য দিয়ে পুষ্টি লাভ করে। এই শ্রেণীর গদ্যের পরিচয় দানের জন্য কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেয়া গেল—
ক) "ধীরে ধীরে যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।" (ঘাটের কথা)

৩৮ ও ৩৯. প্রমথনাথ বিশী/পূর্ববৎ/যথাক্রমে [১৯৩] ও [২০৪] পৃঃ।
৪০. ভবতোষ দত্ত/পূর্ববৎ/১৩৯ পৃঃ।

খ) "যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।" (পোষ্ট্‌মাষ্টার)

গ) "যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, "চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ওতো তিন্নি নয়।"

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, "ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।"

যুবক কহিল, "চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না, বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।" (দালিয়া)

ঘ) "এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'কেমন আছ' তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশলাভ করিত।" (মধ্যবর্তিনী)

ঙ) "কী লজ্জায় এবং কী আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিনী, আমি সামান্য নারীমাত্র।" (দৃষ্টিদান)

চ) "এতদিন তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেমনি বিদায় লইবার একটুখানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মুখে কতই মিষ্টি, কতই ভালোবাসা। মানুষকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র নাই।" (নষ্টনীড়)

ছ) "সে বলে, মানুষকে ভালবাসিতে দোষ কী। আমি তো মোহিনীকে তেমন ভালোবাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসি—আমি

কখনও তাহার অধিক তাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভালোবাসে। সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত।" (করুণা)

জ) "সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।" বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল, সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রান্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, "আর আসিতে পাইব না, আর হইবে না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল,—যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই,...... ।" (বউঠাকুরানীর হাট)

ঝ) "রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কোনো প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। পাষাণ মন্দির দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে কোথাও হৃদয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি গিয়া গোমতী তীরের শ্বেত সোপানের উপর বসিলেন। সোপানের বামপার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল।" (রাজর্ষি)

ঞ) "আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোতে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়, উঁচু নীচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারি দিকে যেন মানুষের মাথায় ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে।" (মুকুট)

লক্ষণীয় যে, এ সব ক্ষেত্রে উপমার ব্যবহার ভাবের সাবয়বতা সাধনে ও নর নারীর চরিত্রের বিশেষত্ব পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে। আর বর্ণনাংশে ভাষার স্বচ্ছতাও লক্ষণীয়। বউঠাকুরানীর হাট-রাজর্ষি-মুকুট ইতিহাসরসাশ্রয়ী রচনা

হলেও ভাষা বর্ণোজ্জ্বল ও ভাবগম্ভীর নয়,[৪১] বরং পরিচ্ছন্ন নির্ভার ও স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন এবং সমসাময়িক-বাঙালি-জীবনাশ্রয়ী করুণার ভাষার কাছাকাছি। অবশ্য, ছোটগল্পের ভাষা আরো বেশি সাহিত্যরস সমৃদ্ধ, কবিত্বগুণেই এই পর্বের ছোটগল্পের ভাষা বাংলা কথাগদ্যে একটি স্ব-তন্ত্র হয়ে উঠেছে।

এছাড়া চলতি গদ্যরীতিতে লেখনী চালনার [য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১)] অভ্যাসে রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রকাশ ভঙ্গিমা এবং শব্দ ব্যবহার সহজেই সমকালের জীবনবোধের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। ফলে সাধু গদ্যরীতিকে আশ্রয় করলেও আলোচ্য পর্বের কথাগদ্য সহজেই জীবনানুসারী হয়ে উঠতে পেরেছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি রচনা করেন। বস্তুতঃ তখন তিনি সাহিত্যসাধনার তুঙ্গে অবস্থান করছেন এবং এই সাধনাও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কবিতা-ছোটগল্প-নাটক-প্রবন্ধ-সমালোচনা—বাংলা সাহিত্যের সব অংশকে তিনি নিজের দানে পূর্ণতা দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে স্ব-জীবনের মধ্যাহ্নে এসে তিনি চোখের বালি রচনা করেন এবং এই রচনাকার্যে তিনি যে পূর্ববর্তী সবকিছুকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

নভেল হিসেবে সার্থকতা লাভের মূলে চোখের বালির গদ্যের অবদানও অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথ চোখের বালির বিষয়গত ও শিল্পগত যে-অভিনবত্ব দাবী করেন, সেই অভিনবত্ব সম্ভব হয়েছে ভাষার গুণে। চরিত্রদ্যোতক উপমাগর্ভ ভাষা সৃষ্টির ফলেই নরনারীর মনের কারখানা ঘরের কথা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ যোগে বক্তব্য স্পষ্ট করা যেতে পারে—মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী সম্পর্কিত ভাষ্যঃ "মা তাহাকে ষ্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধা-বোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।" আর মহেন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে : "কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।" এই মহেন্দ্রের মা সম্পর্কে

৪১. "বঙ্কিমচন্দ্রের মেজাজটাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতার মেজাজ, বর্ণোজ্জ্বল ঘটনা ও চরিত্র, অতীতের পরিবেশ ও আবেগতপ্ত ভাষাভঙ্গি—এ সমস্তই যেন বঙ্কিমের ইঙ্গিতমাত্রের অধীন। রবীন্দ্রনাথ বহিরঙ্গ ঔজ্জ্বল্য-সৃষ্টিতে (সেটাই তো ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবহসৃষ্টিতে সহায়ক) তেমন উৎসুক নন, ইতিহাসের নরনারীর প্রাণের গভীরে তাঁর অন্বেষণ।" [দ্রঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ/রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায় /১৯৬৯/১৩৮ পৃঃ।]

বলা হয়েছে : "কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।" বা, "রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, আমার বউ! তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে!" মহেন্দ্র সম্পর্কে বিহারীর উক্তিটিও অনুধাবনীয় : "মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয়; কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত।" বা মহেন্দ্রের একটি ভাবনা : "জীবনের কবিত্ব অধ্যায়ে মা-খুড়ি যে এমন বিঘ্ন, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।" বা মাতা পুত্রের সম্পর্কে : "গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে কোথায় কত জল, রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন।" বা আরো উপমাগর্ভ ব্যাখ্যা "বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল।" ততোধিক ইঙ্গিতবহ উপমা হলো 'চোখের বালি'—আশা ও বিনোদিনীর উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের নামকরণে। এটি গ্রন্থেরও নাম। বিনোদিনী সম্পর্কিত উপমা : "ক্রুদ্ধা ফণিনী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।" কিংবা বিনোদিনীর উপমাগর্ভ আত্মবিশ্লেষণ : "এত ঔদাসীন্য কিসের! আমি কি জড় পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।" সুতরাং ভাষার এই শক্তিপ্রকাশেই রবীন্দ্রনাথের নভেল-রচনা-সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা সার্থক হয়েছে। নভেল-এর প্রকাশ-মাধ্যম রূপে এই উপমাগর্ভ ভাষা রচনা অবশ্যই বাংলা কথাগদ্যের বিকাশকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গিয়েছে, এই ভাষা কবির ভাষা, প্রাবন্ধিকের ভাষা নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে কথাগদ্য হলো লাবণ্যমণ্ডিত এবং ভাবের সঙ্গে উপমা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে যুক্ত হলো। ফলে সবকিছু মিলে রবীন্দ্রনাথের কথাগদ্য হলো চরিত্রদ্যোতক। রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধি অবশ্যই জীবনের প্রারম্ভে নয়, মধ্যাহ্নে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিদায় নিয়েছেন।

বাংলা কথাগদ্যের বিকাশ বহুজনের সম্মিলিত সাধনার ফল। ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কথাগদ্য বহুভাবনাক্ষম হয়ে ওঠে এবং নভেল নামক শিল্পশৈলীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

৬. বাংলা সাহিত্যে নভেল

—গল্পপ্রতিম রচনার ধারা—

কথাসাহিত্যের মৌলিক উপাদানটি হলো গল্পরস, উপন্যাসেরও। তাই কথা-সাহিত্যের অপর নাম গল্পসাহিত্য। সাধারণ পাঠক গল্পের জন্যই উপন্যাস পড়ে। বাংলা গদ্যের সূতিকাবস্থায় বাংলা কথাসাহিত্যের জন্ম-সূচনা। এই সূচনার সঙ্গে সাহিত্যরস সৃষ্টির বিশেষ কোনো যোগ ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনাকে কেন্দ্র করে অনুবাদাশ্রয়ী যে-গল্পসাহিত্য গড়ে ওঠে, পরবর্তী স্তরে সেই প্রচেষ্টা মৌলিক গল্পসাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই মৌলিক গল্পসাহিত্য রচনার একটি বিশিষ্ট অংশ উপন্যাস বা নভেল দখল করে আছে। নভেলও গল্প বলে, কিন্তু তার গল্প বলার ঢং ভিন্ন এবং এই গল্পের বিষয় প্রত্যক্ষ জগতের মাটি ও মানুষ : লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।
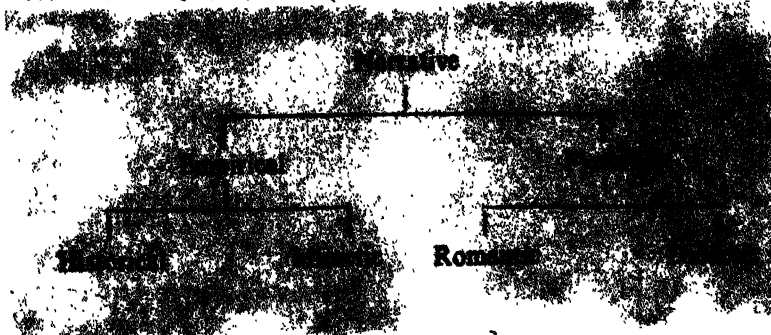
—গল্পসাহিত্য মূলত বর্ণনাধর্মী রচনা। পাশ্চাত্ত্যে এই গল্পসাহিত্য প্রাগুক্ত চারটি ধারার মাধ্যমে সঞ্জীবিত।[১] পাশ্চাত্ত্যে রেনেসাঁস-উত্তর কালের পরিবর্তিত জীবনবোধের পরিণত পর্যায়ে উল্লিখিত বর্ণনাত্মক সাহিত্যের পথ ধরেই নতুন ধরণের একটি গদ্যবাহী গল্পসাহিত্য বিকাশ লাভ করে। এই নতুন গল্প-সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্যায়ে নভেল নামে একটি বিশিষ্ট শিল্পশৈলী (form) গ'ড়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে, মহাকাব্য ছিল পাশ্চাত্ত্য গল্পসাহিত্যের উৎস। বাঙালি জনসাধারণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত আখ্যানমূলক রচনার মাধ্যমেই

১. Scholes, Robert, and Kellog, Robert. The Nature of Narrative. 1968/ p. 13-15.

গল্পরস আস্বাদন করে এসেছে একথা সত্য, কিন্তু বাংলা গদ্যে এই গল্পরস অনুরূপ কোনো মহাকাব্য সম্ভূত ধারা নয়, বরং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকাবলী এই গল্পসাহিত্য রচনার প্রেরণাস্থল ছিল।

বাংলা গদ্য ভাষা যখন ভাব সংবহন ক্ষমতা অর্জন করে নি, তখন বিভিন্ন প্রয়োজনে কথামূলক গদ্যরচনার আয়োজন চলেছে। ১৮০১ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী সম্পর্কিত Descriptive Catalogue of Bengali Works-এ পাদ্রী J. Long আলোচ্য কথামূলক গদ্যরচনার এক বিস্তৃত খতিয়ান দিয়েছেন।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে 'গল্প প্রতিম' রচনার প্রাথমিক পরিচয় কথা (Fable), কাহিনী (Tale) এবং বৃত্তান্ত (Anecdote)-ধর্মী রচনায় আছে। লক্ষনীয় যে, সাময়িকপত্র-পত্রিকার কিছু কিছু রচনা বাদ দিলে আলোচ্য 'গল্পপ্রতিম' রচনার উৎস বাংলা দেশ নয়, অন্য দেশ।

তবে কি বলতে হবে যে বাঙালির নিজস্ব গল্পরসের ধারা ছিল না? নিশ্চয় ছিল। ছিল রূপকথা (Fairy Tale)-র জগতে, ছিল বিভিন্ন লোক-গাথায়। এদের সহযাত্রী রূপে ছিল বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কাহিনী এবং ভারতীয় পুরান কথা। এই সকল গল্পরস গ্রহণে ও পরিবেশনে বিশেষ সীমাবদ্ধতা ছিল ; রূপকথার জগতে ঠাকুরমা-ঠাকুরদা ও নাতি-নাতনীরই প্রবেশের ছাড়পত্র ছিল, লোক-গাথা বা পল্লীগীতিকা ছিল দিনের সর্বকর্ম অবসানে অবসর বিনোদনের বিষয়, মায়েরা সব এসে বসতেন বা বয়স্করা ; মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গীত হতো বিভিন্ন পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্যের বিষয় ; কথক ঠাকুর এসে সন্ধ্যাবেলায় পাঠ করতেন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত। এই গল্পরসের বিষয়টা ছিল মূলত audio-visual ; উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত অবস্থায় এই গল্পরসের ধারায় নতুন গল্পরস সংযোজিত হলো, ভিন্ন বিষয়বস্তু ও ভিন্ন রূপাদর্শ এই নতুন গল্প রসের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সংযোজনা প্রথমে অনুবাদ চর্চার মাধ্যমে, পরে মৌলিক গল্প রচনার মাধ্যমে।

একদিন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনেই বাংলা গদ্যের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে যে 'গল্পপ্রতিম' রচনার ধারা তৈরি হলো, তা বিভিন্ন খাত পরিবর্তন করে পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে। এই গল্পপ্রতিম রচনার ধারা বিকাশের দিক থেকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত হতে পারে : কথা-উপকথা-উপাখ্যান-বৃত্তান্ত-আখ্যান। অবশ্য এর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন

প্রয়াসরূপে যুক্ত হতে পারে সাময়িকপত্রের 'সরস ঘটনা'। এ সবকিছুই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় পরিপূরক রূপে এসেছে এবং বাংলা কথাসাহিত্যের চলার পথকে প্রশস্ত করেছে। আলোচ্য গল্পপ্রতিম রচনার ধারা অনুবাদাশ্রয়ী ও মৌলিক—এই দুই প্রধান বিভাগে আলোচিত হলো।

অনুবাদাশ্রয়ী ধারা

এখন অনুবাদাশ্রয়ী গল্পরসের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হচ্ছে। এই গল্পপ্রতিম রচনার ধারা নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিন্যস্ত : কথা-উপকথা-উপাখ্যান।

কথা : এই পর্যায়ের রচনা সমূহ ইংরেজি Fable-এর সঙ্গে তুলনীয়। পশু-পাখীর কথা, বা মানুষ ও জীবজগতের কথা এই সকল রচনার বিষয়বস্তু। এই রচনাগুলির উৎস ও আদর্শ প্রধানতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজি রচনা। সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' এবং ইংরেজি 'ঈশপ'-এর গল্প এই অনুবাদ পর্যায়ে প্রাধান্য লাভ করে। এই রচনাগুলি প্রধানতঃ নীতিকথা সম্বলিত, বক্তব্যের দিক থেকে উপদেশাত্মক। অবাঙালি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি ভিন্ন ভাষা-শিক্ষাকে মনোগ্রাহী করবার জন্য কেরীর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কয়েকজন বাঙালি এই সকল অনুবাদ কার্যে এগিয়ে আসেন। বিদ্যাসাগরও পাঠ্য-পুস্তক রূপে কথামালা-আখ্যানমঞ্জরী রচনা করেন।

কাহিনী : গল্পেরসের বৈচিত্র্য ও গভীরতা প্রথমে দেখা দিল কাহিনী পর্যায়ের রচনা সমূহে এবং এই ধারা বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশে সহায়ক হয়। কাহিনী ইংরেজি Tale-এর সমর্থক। ইংরেজিতে Tale হলো "A mere story as opp. to a narrative of fact "[২] অর্থাৎ তথ্যভিত্তিক বর্ণনাত্মক রচনার বিপরীত এক সাধারণ গল্প। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সারস্বত মণ্ডপেই প্রথম 'কাহিনী' পর্যায়ের গদ্য রচনার আরম্ভ। এই শ্রেণীর রচনাও দুটি ভাগে বিভক্ত : ক) উপকথা, খ) উপাখ্যান।

উপকথা : পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রচিত কাহিনীমূলক গদ্যরচনা সমূহের মধ্যে যা বৃহৎ কথা-গদ্য রচনা (long prose story) নয়, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ অথচ সাহিত্যের রসোৎকর্ষতার মানদণ্ডে বিরাট কিছু নয়, এই ধরণের রচনা সমূহই উপকথা পর্যায়ভুক্ত। গল্পে রোমান্সরসের স্পর্শও আছে।

২. Shorter Oxford English Dictionary, Vol II. 1964. P. 2125

বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষপরীক্ষা, তোতা ইতিহাস, প্রবোধচন্দ্রিকা, বেতাল পঞ্চবিংশতি এই পর্যায়ের রচনার নিদর্শন।

এই শতাব্দীর প্রধান বাণী ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে মানবরস উপলব্ধি। নব্য বাঙালি পাঠক এই শ্রেণীর রচনার মধ্যেই প্রথম মানবীয় রসের সন্ধান পায়।

উপাখ্যান : 'উপাখ্যান' পর্যায়ের রচনা সমূহের মধ্যেই 'কাহিনী' তার পূর্ণতা নিয়ে প্রকাশ পেল। উপাখ্যান স্বরূপত রোমান্সধর্মী বৃহৎ কথামূলক বর্ণনা-প্রধান গল্প। ইংরেজিতে বস্তুতঃ এরাই Tale বলে অভিহিত। জীবন সম্পর্কিত কোনো গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এবং কোনো দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা এই সকল রচনার বৈশিষ্ট্য নয়। বিষয়ের সারল্যের জন্য ভাষাও ভারমুক্ত। উপাখ্যানের বিষয়বস্তু পুরান, ইতিহাস, কিংবদন্তী, প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি থেকে গৃহীত। উৎস বিচারে এর তিনটি ভাগ আছে—ভারতীয়, ইসমালিক, ইউরোপীয়।

এক, ভারতীয় ঃ ভারতীয় রচনার আকর সাধারণত সংস্কৃত ও প্রাকৃত রচনা। চল্লিশের দশক থেকেই ইংরেজি কাহিনীর আদর্শে বাংলা গদ্যকাহিনী রচনার প্রয়োজনে কাব্যমোদী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃত নাটক কাব্য ও গদ্যকাব্যের অনুসরনে বাংলায় গল্পসাহিত্য রচনা করেন। এই পর্যায়ে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ও মেঘদূত, বাণভট্টের কাদম্বরী, ভবভূতির উত্তররাম-চরিত ও মালতীমাধব একাধিকবার উৎসগ্রন্থ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, হরিনাথ মজুমদারের বিজয় বসন্ত কাহিনীমূলক গল্পসাহিত্য রূপে পাঠকদের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হয়। সীতার বনবাস বাদ দিলে অন্যান্য কাহিনী সমূহ নরনারীর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

বাংলায় অনূদিত কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎস প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের রোমাঞ্চকর কাহিনীও ইংরেজি রচনার মাধ্যমে হাত বদল হয়ে বাংলায় এসেছে। ভারত-ইতিহাস বিষয়ক দুটি ইংরেজি গ্রন্থ কনটারের Romance of History এবং টডের Annals and Antiquities of Rajasthan প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি বাংলা গদ্যসাহিত্যে কাহিনী রচনার মাধ্যমে রোমান্স রসের উৎস মুখ খুলে দেয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং কৃষ্ণকমল

ভট্টাচার্যর দুরাকাঙ্খের বৃথাভ্রমণ Romance of History অবলম্বনে রচিত; দ্বিতীয়টি বাংলা কাব্য ও নাটকের জগতে নতুন নতুন কাহিনীর জোগান দেয়।
দুই. ইসলামিক : বহিরাগত মুসলমানেরা ভারতবর্ষে যখন আসে, সঙ্গে শুধু তরবারী ছিল না, সঙ্গে এনেছিল নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই সূত্রেই আরব ও ইরানের প্রাচীন ইতিহাস ও লোকজীবনের প্রেমগাথা ধীরে ধীরে ভারতীয় মুসলমানদের জনজীবনে অবসর বিনোদনের কাহিনী রূপে সমাদৃত হতে থাকে। মধ্যযুগের বাংলাদেশেও এই সকল রোমান্টিক কাহিনীর প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে এই সকল কাহিনী কেচ্ছা নামে পরিচিত এবং কাহিনী সমূহ আদিরসাত্মক। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ছাপাখানার দৌলতে এই সকল কেচ্ছা স্থায়ী রূপ লাভ করে। এই পর্যায়ে অনুবাদের কাজ দুভাবে চলেছে : এক, আরবী ও ফারসী রচনার প্রত্যক্ষ অনুবাদ, দুই, আরবী ও ফারসী রচনার পরোক্ষ অনুবাদ—ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় হাতবদল হয়ে বাংলায় রূপান্তর লাভ।

পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনেই বাংলায় গদ্যে রচিত গল্পসাহিত্যে ফারসী উপাদান এসে যায় (১৮০৫)। তোতা ইতিহাসের লেখক চণ্ডীচরণ মুন্সী এই ধারার পথিকৃৎ। ইংরেজি Arabion Nights অবলম্বনে হরিমোহন সেনের আরব্য ইতিহাসের সার সংগ্রহ (১৮৩৯) আরব্য উপন্যাস পর্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনার গৌরব দাবী করে। ইংরেজি Persian Tales অবলম্বনে নীলমণি বসাক প্রথমে পয়ারছন্দে পারস্য ইতিহাস (১৮৩৪) রচনা করলেও পরে গদ্যে তার অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। বিশ্বেশ্বর দত্তের শাহনামা (১৮৪৭) পারস্যের মহাকাব্যের মূলানুবাদ। নীলমণি বসাক, W. O. Smith এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকার সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Arbian Nights অবলম্বনে আরব্যোপন্যাস (১৮৫০) রচনা করেন। এই সময়ের অন্যান্য রচনা হাতেমতাই, বাহার দানিশ, দ্বারকনাথ রায়ের লায়লা মজনু, উমাচরণ মিত্রের, চার দরবেশ, একটি জনপ্রিয় কাহিনী গোলে-বকাওলি এবং নীলমণি বসাকের পারস্য উপন্যাস বাংলায় বিশুদ্ধ গল্পরস সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সাদাসিধে ও মনোরঞ্জক গল্পরসের আকর্ষণেই এই সকল আরবীয় ও পারসিক উপাখ্যান সর্বকালের মানুষ পড়েছে।
তিন. ইউরোপীয় : বাঙালির গদ্যবোধ ইউরোপীয় বিদ্যার সান্নিধ্যের ফল। হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্রেরা ইংরেজি সাহিত্যে যে জীবনরস ও

সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সাধারণ বাঙালি পাঠক-সমাজকে সেই রসের কিঞ্চিৎ সন্ধান দেবার জন্ম পরবর্তী কালে তাঁরা কলম ধরেছিলেন। অবশ্য এই পর্যায়ের অনেক অনুবাদই পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে রচিত হয়।
John Bunyan এর Pilgrim's Progress অবলম্বনে যাত্রীদের অগ্রসরণ বিবরণ (১৮২১) রচনা করে ফেলিক্স কেরী (১৭৮৬-১৮২২) বাংলার উপাখ্যান-ধর্মী গদ্যরচনায় পথিকৃতের গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু ধর্ম নয়, জীবনধর্মী রচনার ধারাই বাংলা কথাসাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করে। Lamb's Tales From Shakespeare-এর একাধিক অনুবাদ, মরিশাস দ্বীপের পল এবং ভর্জিনীর 'বেদনা মাধুরীপূর্ণ নিকলুষ রোমান্টিক প্রেমের' কাহিনী সম্বলিত Paul et Virginie-এর বহুল অনুবাদ এবং আবিসিনিয়ার রাজকুমার রাসেলাস-এর সঙ্কটময় জীবনের বিচিত্রকথা অবলম্বনে Dr. Johnson-এর Russelus এর অনুবাদ আলোচ্য পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। Paul et virginie-এর প্রথম অনুবাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন The Exiles of Siberia অবলম্বনে 'এলিজিবেথ' (১৮৪৮) রচনা করেন। 'পুত্রাশোকাতুরা দুখিনী মাতা,' 'বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা,' 'বিচার'—এই তিনটি অনুবাদাশ্রয়ী রচনার লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। যদুগোপালের 'হতভাগ্য মুরাদ' Miss Edgeworth এর Murad the unlucky'-র অনুবাদ। পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সুশীলা চন্দ্রকেতু' সেক্সপীয়রের Twelfth Night এর অনুবাদ।
এইবারে হিসেবের পালা। প্রশ্ন উঠতে পারে আলোচ্য অনুবাদ পর্যায়ে বাংলা কথাসাহিত্য কী ধরণের গল্পরসের উত্তরাধিকারী হলো। প্রথমতঃ এই পর্যায়ের রচনা সমূহের অধিকাংশই প্রধানতঃ প্রেমের কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ গল্প; তৃতীয়তঃ জীবনধর্মী রচনা। চতুর্থতঃ বিশ্বের বিভিন্ন গল্পসাহিত্যের রূপ ও রসের পরিচয়বহ। লক্ষণীয় বিষয় যে, এই সকল অনুবাদাশ্রয়ী রচনার পাশাপাশি মৌলিক গল্প রচনার ধারা প্রকাশ পায়, প্রথম পর্যায়ে এই মৌলিক রচনার ধারা অবশ্যই কাহিনী নির্ভর ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মৌলিক রচনার ধারা সমসাময়িক-জীবন ভিত্তিক হয়ে ওঠে।

মৌলিক ধারা : কাহিনী

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, কোনো ইতিবৃত্ত, কিংবদন্তী বা অলৌকিক ঘটনা কাহিনী পর্যায়ের গল্পসাহিত্যের কথাবস্তু।

একটি ইতিহাসশ্রয়ী কাহিনী রচনার ধারা বাংলা গদ্যে প্রথমাবধি প্রবহমান ছিল। বাঙলার বারভূঁইয়াদের অন্যতম প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়রূপে গৃহীত হয়। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) এই ধারার প্রথম গদ্য রচনা। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-এ। রামরামবসুর রচনার আদর্শে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বনে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) রচনা করেন। উইলিয়াম কেরীর ইতিহাসমালা (১৮২২)-র একটি গল্পও প্রতাপাদিত্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮৫৩) আলোচ্য পর্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নূরজাহান রাজ্ঞীর জীবন বৃত্তান্ত (১৮৫৭), জাহানিরার চরিত্র (১৮৫৮) উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় Romance of History অবলম্বনে ইতিহাসরসাশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৮ এর প্রথম দিকে) রচনা করেন। এই রচনার প্রথম কাহিনীটি, একটি স্বপ্ন কী ভাবে সবকতাগীনের জীবনে সার্থক হয়—তারই একটি সংক্ষিপ্ত আলেখ্য হলো 'সফল স্বপ্ন'। দ্বিতীয় কাহিনী 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর কথাবস্তু মূলত শিবাজী ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারার প্রণয়োপাখ্যান। কল্পনার যথাযথ প্রয়োগে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ইতিহাসের কাহিনী মাত্র না থেকে স্বকপোলকল্পিত রচনা হয়ে উঠেছে এবং হয়েছে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স। কিন্তু প্রথম গল্প 'সফল স্বপ্ন' কল্পনার তড়িৎস্পর্শের অভাবে যথার্থ গল্পসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি।

লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা প্রকাশের পর পাঠ্য-পুস্তকের সীমানার বাইরে নতুনভাবে প্রতাপাদিত্যকে অবলম্বন করে রসসাহিত্য রচনার প্রেরণা আসে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস অবলম্বনে বড়ো ধরণের কাহিনী বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯) রচনা করেন। উপেনচন্দ্র মিত্র প্রতাপ-সংহার রচনা করেন (আঃ ১৮৭৯)। রবীন্দ্রনাথও একই ইতিহাস অবলম্বনে বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮১) রচনা করেন। এই পর্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা সত্যচরণ শাস্ত্রী রচিত (১৮৯৯) 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু-মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', রচনাটির এরূপ নামকরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের নবোন্মেষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যঞ্জনাবহ।

বঙ্কিম-পূর্ববর্তী অধিকাংশ কাহিনীই পাঠ্যপুস্তকের সীমানায় বন্দী। এই উদ্দেশ্যগত সীমাবদ্ধতার জন্ত এই সকল রচনা কখনো পূর্ণাঙ্গ রসসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি। ভূদেবই প্রথম পাঠ্যপুস্তকের সীমানায় বন্দী ইতিহাসের ধারাটিকে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রশস্তক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন। ইংরেজি রোমান্সের আদর্শে বাংলায় রোমান্স রচনার সচেতন প্রয়াস প্রথম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ দেখা দিল এবং এর দ্বিতীয় গল্প 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-ই মৌলিক কাহিনী তথা রোমান্স রচনার সূচনা করে।[৩] এদিক থেকে ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্রের পথপ্রদর্শক। বঙ্কিমচন্দ্রে এই কাহিনী রচনার ধারা কূলপ্লাবিনী প্রবাহিনী রূপে দেখা দেয়। বস্তুতঃ মৌলিক কাহিনী রচনার উষালোকে ভূদেব হলেন 'ভোরের পাখি', যে-পাখি বাঙালি রসিক চিত্তকে গল্পের নতুন রাগিনীতে জাগিয়ে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) হলো এই কাহিনীলোকের নবোদিত সূর্য। কল্পনাশক্তি, গভীর জীবনবোধ ও রেনেশাঁয় চেতনাজাত অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী রচনায় অগ্রসর হন।

মৌলিক ধারা : আখ্যান

এই পর্যায়ের গল্পরসের উৎস চলমান বর্তমান—রচয়িতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই প্রকার গল্পরসের চরম স্ফূর্তি ঘটেছে নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীতে এবং ছোটগল্পে। বাংলা সাহিত্যে এই আখ্যান-ধারার প্রাথমিক রূপটি আছে সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায়। কিন্তু স্পষ্টতর জগতের অধিবাসী বলে আখ্যান বর্ণিত নরনারীর জীবন অনেক বেশি বিশ্বাস্য।

প্রাত্যহিক জীবনের কোনো কোনো ঘটনা বা সংবাদই নভেল-এর বীজ রূপে দেখা দেয়। বস্তুতঃ সংবাদপত্রের গল্পরসবাহী ঘটনার মাধ্যমেই বাঙালি পাঠক প্রথম প্রথম বাস্তবজীবনাশ্রয়ী গল্পরসের স্বাদ পেয়েছে। পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে উদাহৃত 'বৃদ্ধের বিবাহ' 'আশ্চর্য বিবাহ' 'নীলকর সাহেবের নারীহরণ', বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণদের কন্যা ক্রয়-বিক্রয়, এক কুলীন স্ত্রীর পতিত জীবনের কথা—এরূপ অনেক সমসাময়িক বিষয়ই সংবাদপত্রে সরসভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'আশ্চর্য বিবাহ' বিষয়ক দ্বিতীয় সংবাদটিতে বাঙালি জীবনে রমণী হৃদয়ের রোমান্টিক প্রেমের বীজাকার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। কোনো বড়ো ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে এই সংবাদটি একটি

৩. রামগতি ন্যায়রত্ন/বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব/১৩১৭/২৮০ পৃঃ।

সম্ভাবনাময় মহৎ উপন্যাস হতে পারত। স্বকালের কোনো কোনো বিষয় সাধারণ পাঠকদের কাছে অখণ্ডভাবে তুলে ধরবার বাসনা জীবনরসিক সাংবাদিকদের মনে জাগে এবং এই প্রবণতা বৃত্তান্তধর্মী রচনায় প্রথম প্রকাশ পায়। ভবানীচরণের বাবু-বিবি পর্যায়ের রচনা সমূহ বৃত্তান্তধর্মী রচনার সুন্দর উদাহরণ। বস্তুত: নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীর অনুকূল বাস্তবসচেতনতা প্রথম সাংবাদিকের কলমের আঁচড়েই প্রকাশ পায়। লক্ষণীয় যে, ভবানীচরণের রচনাকে আশ্রয় করেই সাময়িক পত্রপত্রিকার সীমানার বাইরে লেখকের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রথম গল্পসাহিত্য রচিত হলো।

আখ্যান সাহিত্য: বিশের দশকে ভবানীচরণের মৌলিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে গল্পরস সৃষ্টির প্রয়াস একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কারণ তিরিশ ও চল্লিশের দশকে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গল্পরস সৃষ্টির আয়োজন বিশেষভাবে দানা বাঁধে নি। কিন্তু সমসাময়িক বিষয়ও সাহিত্যের কথাবস্তু হতে পারে—এই চেতনা পঞ্চাশের দশকে প্রকাশ পায়। এটি প্রধাণতঃ ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব। বঙ্কিম-পূর্বকালে এই শ্রেণীর তিনটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। রচনা তিনটী হলো—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২), আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৫) ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (১৮৫৭)। এই তিনের কথাবস্তু পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

রচনা রচয়িতার অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হলেও নভেল হয় না, **নভেল গল্পের এক বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গি**। আলোচ্য আখ্যানধর্মী রচনার ধারাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১৮৭২)-এ এসে প্রথম শিল্পসম্মিত রূপ লাভ করে এবং নভেল পদবাচ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল মৌলিক বিষয় উদ্ভাবনের দ্বারা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর চেহারা ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। ঘটমান জীবনও যে অফুরন্ত গল্পরসের আধার, মহৎ সাহিত্যের বিষয় হতে পারে পঞ্চাশের দশকের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া গেল।

আলোচ্য গল্পপ্রতিম রচনার পরিণত পর্বে নভেল জাতীয় শিল্পকর্ম বাংলা কথাসাহিত্যে গড়ে ওঠে। ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গল্পপ্রতিম রচনার ধারা প্রধানতঃ অনুবাদাশ্রয়ী ছিল এবং পাঁচের দশক থেকে মৌলিক কথাবস্তু অবলম্বনে গল্পরচনার বিক্ষিপ্ত প্রয়াস দেখা দেয়। এ-সব রচনাই সৃজ্যমান পাঠক সম্প্রদায়কে নতুন নতুন গল্পসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।

অবশ্য যে-কোনো গল্পই 'নভেল' পদবাচ্য নয়। অন্যান্য গল্পের সঙ্গে তার পার্থক্য

আছে। পূর্ববর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সবকিছুই আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই নভেল জাতীয় গল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রেই। পাঠকের আগ্রহ ও লেখক গোষ্ঠীর সচেতন শিল্প-প্রয়াস—উভয়ে মিলেই নভেল জাতীয় গল্পপ্রতিম রচনার ধারা বাংলা সাহিত্যে বিকাশ লাভ করে।

—রোমান্স রস ও বাংলা কথাসাহিত্য—

প্রধানতঃ রোমান্সরস-নির্ভর অনুবাদধর্মী রচনা ও মৌলিক কথামূলক রচনার (কাহিনী ও আখ্যান) পরবর্তী স্তরেই বাংলায় 'নভেল' (Novel)-এর আবির্ভাব (১৮৭২)। লেখক ও পাঠক উভয়ের পরিবর্তিত জীবনবোধ নভেল-এর শিল্পসত্তাকে সুষ্ঠু রূপ দান করে। নভেলর রসোৎকর্ষ সাধন আলোচ্য 'রোমান্স'রসকে বাদ দিয়ে নয় বরং আত্মস্থ করেই।

তবে 'রোমান্স' ও 'নভেল' এক নয় কেন, কেন উভয়ের পৃথগত্ব দাবী করা হয়? এই বিরোধ রসাধিক্যের প্রশ্নে। রোমান্স সুলভ কল্পচারিতা নভেলের বিষয়-বিন্যাস ও রসপরিণতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও তার প্রাধান্য রসাভাসের কারণ হয়, বিশেষতঃ জীবনায়নের প্রশ্নে, কারণ জীবনটা কল্পনা সর্বস্ব নয়। এর তুলনা আছে আমাদের চারিপাশের জীবন-বৃত্তে: ছিমছাম আটপৌরে শাড়ী পরিহিতা নারীর সৌন্দর্য যদি নভেল হয়, তবে ধনীগৃহের সালঙ্কারা নারী হবে রোমান্স।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী-চেতনা, ও ইতিহাস-চেতনা দুটিই লক্ষণীয়। সাধারণতঃ দুটি কারণে ধ্রুপদী চেতনা সাহিত্যে এসে থাকে[৪] এবং বাংলা সাহিত্যেও এসেছে: এক. শাশ্বতের সঙ্গে বর্তমানের সমতা বিধানে, দুই. ঐতিহ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের সামঞ্জস্য সাধনে। আর ইতিহাসের চর্চা ঘটেছে দুটি কারণে: এক. ইতিহাস বিমুখ বাঙালিকে ইতিহাস সচেতন করণে, দুই. বৃহত্তর জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্র সম্প্রসারণে ও বাঙালির ভারতীয়-করণে। এই উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক রূপেই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির ভারতচর্চা।

একালের কবিযশঃপ্রার্থী অনেকেই কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য এবং ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসকে অধিক পছন্দ করেছেন। এই পথ ধরেই মধুসূদন-এর হাতে বাংলা কাব্যে মহাকাব্যের

৪. Sartre, J. P. What is Literature. 1950. p. 67-68.

আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে নাটকে সমকালীন জীবনের উপস্থিতি ঘটলেও পুরান ও ইতিহাস চেতনাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের নাটক এর প্রমাণ, বিদ্যাসাগরকেও কি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তির জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের উপর নির্ভর করতে হয় নি? বাঙলার সৃষ্টি-উন্মুখ সাহিত্যের এই সব কিছুরই মূলে ছিল নতুন যুগের বিশিষ্ট জীবনাদর্শ ও প্রেরণা। সমকালীন চিন্তাধারা ও জীবনরীতির সীমাবদ্ধতা থেকে প্রশস্ততর জীবনচর্যার ক্ষেত্রে মুক্তি লাভের প্রেরণাতে এবং সমকালের চলার পথকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে একালের মানুষ স্বভাবতই অতীতাচারী হয়ে ওঠে। এই পথেই বাংলায় কাহিনী পর্যায়ে 'রোমান্স' রসের স্ফুরণ ঘটে।

এর মূলে ছিল আমাদের জাগরণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং তা একান্ত ব্যক্তিক চেতনা নির্ভর নয়, গোষ্ঠি ও জাতীয় চেতনাশ্রয়ীও বটে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশপর্বে পুরাণ ও ইতিহাসাশ্রয়ী বিষয়ভাবনার মাধ্যমে এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রথম প্রথম সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে না পারায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যথার্থ জীবনানুস্মৃতি বিলম্বিত হয়, বিলম্বিত হয় নভেলের প্রতিষ্ঠা।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ধরে মৌলিক গল্পসাহিত্যকে প্রধানতঃ রোমান্সের জগতে বিচরণ করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের মৌলিক ধারায় প্রথম রোমান্সের উৎস উন্মোচন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে এই রসধারার বহুধা বিকাশ। জীবনের বহিরঙ্গের রূপায়ন ও ঘটনার প্রাধান্যে এঁদের রচনায় রোমান্সরসের বহির্মুখী রূপটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। পাঠকের মন হরণ ও মুগ্ধ করাই এই রোমান্সরসের লক্ষ্য। এঁরা গল্পের জমজমাটি ভাবটি অক্ষুন্ন রাখার জন্য চমক-সৃষ্টিকারী ঘটনাবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। এঁদের অনুসরণ করে সমসাময়িক অন্যান্য গল্প-লেখকদের রচনায় এই রসের অনুবর্তন ঘটেছে, কেউ ব্যর্থ হয়েছেন, কেউ সফল হয়েছেন।

কিন্তু কাহিনী-প্রধান রচনার সূত্রেই বাংলা গদ্যে আর্ট-এর অভিপ্রকাশ ঘটে। বঙ্কিম-পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের মধ্যে এই আর্ট চেতনা তথা সৌন্দর্যবোধ বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর তর্করত্নের রচনার মধ্যে প্রথম বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। এই কালের কাহিনী কথনের শিল্পগত বিশেষত্বটি হলো বর্ণনকুশলতা ও ঘটনাপ্রবাহের

একমুখিতা। এই গল্পরচনার পথেই বাংলা কথাসাহিত্যে নভেল জাতীয় শিল্প-শৈলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

যখন গল্পের বিষয়বিন্যাসে অন্তর্জীবন প্রকটন প্রাধান্য লাভ করে তখন ভিতরের মানুষটির সজীব প্রস্ফুটন ঔপন্যাসিকের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে পড়ে। তখন ভিতরের কল্পনাপ্রবণ মানুষটি মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাকে অনুভব করা যায়, তাই তাকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বুঝিয়ে বলতে হয়। ফলে অন্তর্বাস্তবতা পরিস্ফুটনের জন্য যা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তা অবশ্যই নিছক বর্ণনা নয়, বিশ্লেষণ এবং সে ক্ষেত্রে রোমান্স রস অন্তর্মুখী এবং ফাল্গুধারার মতো জীবনের অন্তস্তলে বিভিন্ন সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক আচরণের মধ্যে প্রবহমাণ। অন্তর্বাস্তবতার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো রচনায় রোমান্সের এই অন্তর্মুখিতা প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথেই তা প্রথম যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করলো। এর মূলে ঔপন্যাসিকদ্বয়ের মেজাজগত পার্থক্য কাজ করেছে। বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বর্ণাঢ্য রূপ অঙ্কনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। অতীতের পৃষ্ঠা থেকে তিনি গল্পরস গ্রহণ করলেও সেখানে তিনি সতত স্বকীয় আদর্শ ও মানবিক সত্তারই সন্ধান করেছেন। "ইতিহাসের নরনারীর প্রাণের গভীরে তাঁর অন্বেষণ।"[৫] রাজসত্তার অন্তরালবর্তী মানুষ গোবিন্দমাণিক্যই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। অতীতাশ্রয়ী ভিখারিণী ক্ষুধিত পাষাণ দালিয়া প্রভৃতি ছোটগল্পেও তিনি নরনারীর মানুষিক দিকটির পরিচয় দিয়েছেন। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পার্থক্য। এই পার্থক্য আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস পাঠ করা যায়। অপরিণত রচনা করুণার সঙ্গে বিষবৃক্ষ-এর তুলনা করলেই এই দুই ঔপন্যাসিকের রোমান্টিক ভাবনার মৌল পার্থক্য ধরা পড়ে এবং চোখের বালিতে স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

—বাংলা নভেল ও বাস্তবতা—

গল্পের বিষয়বস্তুতে স্থান-কাল-পাত্র—এই তিনের একই বিন্দুতে অবস্থানকে বাস্তবতা বলে এবং এর যে-কোনো একটিকে বাদ দিলে নভেল-এর বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ

৫. জ্যোতির্ময় ঘোষ/রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়/১৯৬৯/১৩৮ পৃঃ।

হবে। এ পর্যায়ে নভেল-এর বিষয়বস্তুতে লেখকের কালোচিত্যবোধ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতটা টলে যেতে পারে। বস্তুতঃ আধুনিক বাঙালির বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীর উদ্ভবকে সম্ভব করে।

জীবনানুসারী শিল্পরূপে নভেল-এর প্লট সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো কী ধরণের জীবন গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে নয়, কী ভাবে সেই জীবনকে পাঠকের নিকট পরিস্ফুট করা হয়েছে। রচনাশৈলীর এই প্রকৃতির উপরই নভেল-এর বাস্তবতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সত্যকল্পতাই নভেলের বাস্তবতার বিশেষত্ব। নভেল-এর রসবিচারে একেই জীবনসৃষ্টি বলে। যদিও এই জীবনসৃষ্টি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক, তবুও বিষবৃক্ষে পাই মূলত জীবনের বহিরঙ্গের বর্ণনা, চোখেরবালি (১৯০১)তে অন্তরঙ্গের বিশ্লেষণ; অর্থাৎ প্রথমটিতে পাই বহির্বাস্তবতা (Formal Realism)—বহির্জীবন যার অবলম্বন; দ্বিতীয়টিতে পাই অন্তর্বাস্তবতা (Inner Realism)—অন্তর্জীবন যার অবলম্বন। এখানেই শিল্প হিসেবে বিষবৃক্ষ-এর সঙ্গে চোখের বালির পার্থক্য।

বাংলা গদ্যে সাংবাদিকতার সূত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে। নক্সা-প্রহসন-নাটক-সাময়িকপত্র বাংলা কথাসাহিত্যে উল্লিখিত বহির্বাস্তবতার বিকাশে সহায়ক ছিল। মৌলিক গল্পসাহিত্য রচনার পর্যায়ে এই বাস্তবতার প্রসার ঘটে। বস্তুতঃ এই বাস্তবতার সূত্রেই গল্পরস কাহিনী থেকে আখ্যান-এ উন্নীত হয়।

আমাদের সাহিত্যে বহির্বাস্তবতার পাশাপাশি অন্তর্বাস্তবতার প্রথম প্রকাশ ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই—দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ-এ বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনার মধ্যে আয়েষা ও সূর্যমুখীর পত্র-রচনা তাদের অন্তর্রহস্য প্রকটনে সাহায্য করেছে, শৈবলিনী ও প্রতাপের হৃদয় ব্যাকুলতা ও দ্বন্দ্ব, রোহিণীর স্বগতোক্তি, শ্রীর আত্মজিজ্ঞাসা—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নরনারীর মনের কথাকে ব্যক্ত করতে যত্নবান ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন: "উপন্যাস-লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন।" এই অন্তর্বিষয়-সচেতনতা অন্তর্বাস্তবতার রূপায়নের প্রথম পদক্ষেপ। নভেল তথা উপন্যাসের এই অন্তর্বাস্তবতা নরনারীর আবেগময় জীবনের যথার্থ রূপায়নের উপর নির্ভরশীল। নরনারীর অন্তর্জীবন যখন বাঙময় হয়ে ওঠে, তখনই অন্তর্বাস্তবতার রসপরিণতি ঘটে। রবীন্দ্রনাথে এসে এই ধারা নাব্য অবস্থা লাভ করে। চোখেরবালি এই অন্তর্বাস্তবতার

সচেতন সৃষ্টি প্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই অন্তর্বাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে বিচ্ছিন্ন উপাদানরূপে, চোখেরবালিতে একটা পূর্ণাঙ্গ শিল্প রূপে।

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ বিষবৃক্ষ দিয়ে, রবীন্দ্র-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর আরম্ভ চোখেরবালি দিয়ে। এর মধ্যে কালের ব্যবধান প্রায় তিরিশ বছরের। কালোচিত যে-শিল্প সচেতনতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চোখেরবালি রচনা করেন, পরবর্তীকালে লিখিত চোখের বালি-র সূচনাতেই তার প্রমান আছে। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনবোধেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তাই নতুন বঙ্গদর্শন-এ অতীতের পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। এই পুরাতনের বর্জনে ও নতুনের সন্ধানে বাংলা উপন্যাসে যুগান্তর ঘটল, অর্থাৎ নভেল তথা উপন্যাসে গল্প থাকবে, কিন্তু উপস্থাপনারীতিটি পরিবর্তিত হবে। গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যবর্তী কালের চিহ্ন সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাই অভিনব পদ্ধতির গল্প রচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলাভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।" এই দাবী রবীন্দ্রনাথের দাবী, এই দাবী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পথিকৃতের দাবী। আলোচ্য অন্তর্বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দানে নয়, নরনারীর আঁতের কথা পরিস্ফুটনে তথা অন্তর্জীবনের রহস্য বিশ্লেষণে। চোখের বালি-র মহেন্দ্র-বিহারী-আশা-বিনোদিনী —এই চারিটি নরনারীর কামনাবাসনাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষনাত্মক পদ্ধতি অবলম্বনে ভাষা দিয়েছেন। এই অন্তর্বাস্তবতা সাধনে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রেমভাবনা ও চরিত্রদ্যোতক কথাগদ্যভঙ্গি অবশ্যই সহায়ক হয়েছে। এই প্রেমভাবনা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসেও বিভিন্নভাবে বাঞ্ছিত ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

নভেলে জীবনায়নের প্রশ্নে ঔপন্যাসিক যে-মননের আশ্রয় নিয়ে থাকেন তা তথ্য-আহরণ-সাপেক্ষ নয়, বরং নরনারীর জটিল হৃদয়-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই মনন মূলত ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, নরনারীর অন্তর্জীবনকে তা অল্প ক্ষেত্রেই স্পর্শ করতে পেরেছে। এই মননাশ্রয়ী অন্তর্বাস্তবতার রসসিদ্ধিতেই বাংলা নভেল ধীরে ধীরে চরিত্র-প্রধান হয়ে ওঠে—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এই উত্তরন পর্ব।

—বাংলা নভেল-এর শিল্পশৈলী—

নভেল গল্পের একটা ফর্ম বিশেষ। কথাবস্তুর বিশেষত্ব এবং তার পরিবেশনের নৈপুণ্যের পার্থক্যেই কথাসাহিত্যের বিভিন্নতা—কখনো তা ছোটগল্প, কখনো বড়ো গল্প, কখনো তা রোমান্স (রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন কাহিনী), কখনো তা নভেল (রবীন্দ্রনাথের মতে আখ্যান)। এই পরিবেশনের নৈপুণ্য নির্ভর করছে আধার-নির্বাচন এবং পরিবেশকের অর্থাৎ লেখকের সামর্থ্যের উপর। এই আধারের রকমভেদ বা কোন্ ধরণের আধার এটি হলো কথাসাহিত্যের শিল্পশৈলী সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা। গল্পরসের পরিবেশক হলেন লেখক, আর পরিবেশনের আধারটিকে বলা চলে ফর্ম এবং তিনি যে ঢং-এ পরিবেশন করছেন সেটি হলো লেখকের স্টাইল এবং এখানেই লেখকের স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব।

গল্পরস পরিবেশনের পাত্র বা আধার যাকে শিল্পশৈলী বলা হয়েছে, নভেল-এর শিল্পনির্মিতির বিচারে তাকেই বলে প্লট-সৃষ্টি—যে অর্থে Forster প্লট শব্দটি ব্যবহার করেছেন[৬]। তিনি Story অর্থে সাধারণ গল্প বুঝিয়েছেন,—বিষয়ের বিন্যাসে কালানুক্রম রক্ষাই যার প্রধান বিশেষত্ব; প্লট অর্থেও তিনি এক প্রকারের গল্প বুঝিয়েছেন, কিন্তু এই গল্পের বিশেষত্ব কার্যকারণ-সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের বিন্যাসে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে।

প্লটের বিভিন্ন গঠনগত দিক আছে। নভেল হাতে নিলেই এর রচনা-কৌশলগত বহিরঙ্গ রূপটি চোখে পড়ে, তাই নভেল-এর শিল্পশৈলীর সবটুকু নয়, নভেলটির অন্তরঙ্গ গ্রন্থন-রীতিটির গুরুত্বও সমধিক। এ দুয়ে মিলেই নভেল-এর শিল্পশৈলী, এ যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব—বহিরঙ্গে রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। আলোচনার সুবিধার্থে এই শিল্পশৈলীর একটি রৈখিকচিত্র নির্দেশ করা যেতে পারে—
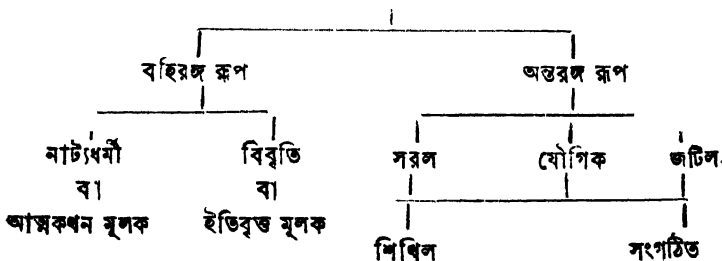
৬. Forster, E. M, Aspects of the Novel. 1963. p. 93.

সাহিত্যের রূপগত বিবর্তনের আধুনিক পর্যায়ে গদ্যে নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীর উদ্ভব ঘটে। ফলে মহাকাব্য ও নাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করেই এই শিল্পশৈলীর বিকাশ ঘটেছে। লক্ষণীয় যে, নাটকের কথোপকথন, স্বগতোক্তি বা আত্মকথন ভঙ্গিমাটিও নভেল-এর অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশরীতি হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে নভেল রচনার যেমন একটি ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, বাংলা সাহিত্যে তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের সাহিত্যে আধুনিক ব্যাপারটিই খাপছাড়া তরবারির মতো মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্য-চিন্তা পাশ্চাত্ত্য থেকে এসে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আসর জুড়ে বসেছে।

নভেল-এর প্রকাশ মাধ্যম গদ্যভাষা নভেলের শিল্পশৈলীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত[৭]। জীবনানুসারী শিল্প বলেই সর্বজনবোধ্য এবং বহুভাবনাক্ষম গদ্যভঙ্গিই নভেল-এর ভাষাদর্শ এবং এ ভাষাকে হতে হবে জীবনানুসারী, বর্ণনাধর্মী এবং চরিত্রব্যঞ্জক। আমাদের সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ছিল এই কথাগদ্য বিকাশের কাল এবং এরই সমান্তরাল নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীর বিকাশ। এই শিল্পশৈলীর বিকাশের মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে প্রসঙ্গত আমরা অনুবাদা-শ্রয়ী গল্পসাহিত্যের শিল্পসত্তার বিশেষত্ব নির্দেশ করছি—

এক. অনুবাদপর্যায়ে রচয়িতাগণ মূলের গঠনশৈলীকেই অনুসরণ করেছেন। কখনো কখনো মূলের কাব্যরূপ ও নাট্যরূপকে তাঁরা গদ্যে ধারাবাহিক বিবরণাত্মক কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। দুই. কথাবস্তুর বিন্যাস সরলরৈখিক, বিষয়বস্তু একের পর এক মালার আকারে গ্রথিত হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, অনুবাদকগণ এই সব অনুবাদকার্যে মৌলিক কোনো শিল্পভাবনার পরিচয় প্রদান করেন নি এবং অনুবাদকালে তাঁদের অধিকাংশই 'বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য ধ্বনিসুন্দর ভাষা' ব্যবহার করেছেন।

বস্তুতঃ মৌলিক গল্পসাহিত্যের ধারায় নভেলের শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে স্বকীয়তা প্রকাশ পেল। যখন অনুবাদচর্চা অগ্রসর হচ্ছে, তখনই মৌলিক গল্পরচনার ধীর ও বিলম্বিত আবির্ভাব ঘটেছে। এই মৌলিক ধারার স্পষ্টতঃ তিনটি পর্ব: ক. প্রাক্-বঙ্কিম পর্ব, খ. বঙ্কিম ও বঙ্কিম-সমসাময়িক পর্ব, ও গ. রবীন্দ্র পর্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমাকে স্পর্শ করেই আমাদের আলোচনার সমাপ্তি।

৭. Kettle, A. **An Introduction to the English Novel. Vol I. 1969. p.34.**

—প্রাক্-বঙ্কিম পর্ব—

প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা কথাসাহিত্যের কোনো কোনো রচনা গল্পরস সৃষ্টির দিক দিয়ে মৌলিকতা দাবী করলেও শিল্পশৈলীর বিচারে পরবর্তীকালের গল্পসাহিত্যের উপর কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নববাবুবিলাস, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, আলালের ঘরের দুলাল, চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও হুতোম প্যাঁচার নক্শা বর্তমান পর্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থ।

আলোচ্য গল্পসাহিত্যের শিল্পশৈলীর বিচারে প্রথমেই বহিরঙ্গের দিকটি লক্ষণীয়। এই সব রচনায় প্রধানতঃ প্রাচীন ধারাবাহিক বর্ণনা রীতি অনুসৃত হয়েছে। একমাত্র শ্রীমতী ম্যলেন্স ফুলমণি ও করুণার বিবরণে ডায়েরিধর্মী বিবরণাত্মক আঙ্গিক অনুসরণ করে পরবর্তীদের তুলনায় অভিনবত্বের গুণে প্রশংসার দাবি রাখেন।

শিল্পশৈলীর অপর দিক বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও গ্রন্থনার পর্যালোচনায় আলোচ্য রচনাসমূহের নিম্নরূপ বিশেষত্ব নির্দেশ করা যেতে পারে—

এক. প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের গল্পসমূহে প্লট-সৃষ্টি নেই বললেই চলে। বস্তুতঃ বিষয় সমূহের বিন্যাস পদ্ধতি সরলরৈখিক।

দুই. নববাবুবিলাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত এই পর্যায়ের অন্যান্য রচনায় বিষয়গত অনৈক্য ও পরিমিতি বোধর অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে গল্পরসের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লেখিকার উপস্থিতিতে ও অনাবশ্যক সাব প্লটের সমাবেশে ফুলমণি ও করুণার বিবরণের বিষয়গত ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের গল্পরসও অনেক অপ্রয়োজনীয় ঘটনার চাপে শ্লথগতি হয়েছে। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের বিষয়বিন্যাস অসংলগ্ন এবং শেষাংশে খ্রীষ্টান মাহাত্ম্য প্রচারের বিষয়টির সঙ্গে গল্পের প্রধান ধারার কোনো যোগ নেই। হুতোম প্যাঁচার নক্শায় কোনো নির্দিষ্ট গল্প নেই, রচনাটি একটি বিশেষ কালের কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক সমাজচিত্র এবং এই চিত্রগুণের জন্যই রচনাটির 'নক্শা' নামের সার্থকতা।

তিন. আলোচ্য পর্বের গল্পরচনায় এপিসডিক বিন্যাসপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ঘটনাগত সম্পূর্ণতার দিক দিয়ে পরিচ্ছেদ রচনা ও খণ্ডভাগ এর প্রধান বিশেষত্ব। নববাবুবিলাসে একজন নববাবুর জীবনকথা অঙ্কুর-পল্লব-পুষ্প-ফল এই চারিখণ্ডে বিবৃত হয়েছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ঘটনাগত সম্পূর্ণতা আলালের ঘরের দুলালের বিন্যাসপদ্ধতির বিশেষত্ব। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের পরিচ্ছেদ সমূহও

বিষয়গত দিক থেকে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনীদ্বয়ের বিষয়বিন্যাসও এপিসডিক।

চার. বিষয়গত সারল্য আলোচ্য গল্পসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পর্যায়ের কোনো কোনো রচনায় প্রধান ও অপ্রধান দুটি বিষয় সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফুলমণি ও করুণার বিবরণে ফুলমণি ও করুণার দুই বিপরীতধর্মী জীবনধারা এবং সুন্দরী ও প্যারীর কিশোরী জীবনের আলেখ্য পাপ-পুণ্যের সমান্তরালে রচিত হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালে বাবুসমাজের পাপাচার ও করুণ পরিণতি পরিস্ফুটনের জন্য মতিলাল ও রামলাল সহোদর দুই ভাইয়ের বিপরীত জীবনধারা বর্ণিত হয়েছে। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের শেষদিকে দুই বিপরীতধর্মী সহোদরের জীবনকথা প্রাধান্য পেয়েছে।

পাঁচ. চরিত্রসমূহে কোনো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্র ঘটনা বা বক্তব্যের অধীন। নীতিপ্রতিষ্ঠার কারণেই কোনো কোনো চরিত্র প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে উঠেছে।

ছয় এই পর্যায়ে গল্পরসের প্রবহমানতা 'তারপর তারপর'-এর কৌতূহলে সচল ছিল, কার্যকারণ সম্পর্কে এই গল্পরস গতিশক্তি লাভ করেনি।

বস্তুতঃ নভেল জাতীয় রচনার বিষয় বিন্যাসে জীবনঘনিষ্ঠতা বলতে যা বুঝি এই পর্বের গল্পসাহিত্যে তা সুলভ নয়। নীতিপ্রচার এসব রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে নরনারীর মানবিক সত্তা ও অন্তরঙ্গ বিষয়সমূহ অপ্রকাশিত রয়েছে।

—বঙ্কিম ও বঙ্কিম-সমসাময়িক পর্ব—

বঙ্কিম পর্ব

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স ও নভেল সামগ্রিক ভাবে উপন্যাস নামেই পরিগণিত। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) নামক রোমান্স রচনা করেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্বাধিকার ঘোষণা করেন। রচনার বিষয়বস্তুরূপে তিনি অনাধুনিক ভারতের ইতিহাসকেই প্রধানত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমকালীন জীবনের পটভূমিতে অল্পসংখ্যক গ্রন্থই রচনা করেছেন। এ সব রচনায় প্রধান বিষয় রূপে বঙ্কিমচন্দ্র কামনা বাসনা যুক্ত নরনারীর প্রেমকেই ব্যবহার করেছেন। নভেলে অবশ্য বিবাহ-পূর্ব অপেক্ষা বিবাহোত্তর জীবনের রূপজ মোহই গুরুত্ব লাভ করেছে। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সমাজস্বীকৃত প্রেমেরই অকুণ্ঠ জয়গান করেছেন।[৮]

৮. অজিতকুমার ঘোষ/শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার/১৯৬৭/২৮৯ পৃঃ।

বাংলা কথাসাহিত্যে শিল্পশৈলীর বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন রোমান্সকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, কারণ তাঁর সৃষ্টিতে ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার সংখ্যাই বেশি। রোমান্স রচনায় সিদ্ধিলাভের পরেই তিনি নভেল রচনা করেন। এর পরেও তিনি কখনো রোমান্স কখনো নভেল রচনা করেন। তাই তাঁর শিল্পশৈলীর বিচার রোমান্স ও নভেল নির্বিশেষে সামগ্রিক রচনার ভিত্তিতেই কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের শিল্পশৈলীর বিচারে প্রথমেই বহিরঙ্গ দিকটির উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনি দু'প্রকার রূপাবয়বের স্রষ্টা।

এক. মহাকাব্যিক পদ্ধতি বা বিবৃতি ধর্মী : ইন্দিরা ও রজনী ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের আর সব উপন্যাসই এই রীতিতে রচিত হয়েছে। দুই. আত্মকথনমূলক : বাংলায় ইন্দিরা উপন্যাসে প্রথম এই পদ্ধতিতে গল্পরস পরিবেশিত হয়। উপন্যাসটি নায়িকা ইন্দিরার আত্মকথা। রজনী-অমরনাথ-লবঙ্গলতা-শচীন্দ্রনাথের জবানীতে রজনী উপন্যাস রচিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পশৈলীর অন্তরঙ্গ বিশেষত্বটি হলো কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা-পারম্পর্য রক্ষা করে বিষয়ের বিন্যাস সাধন। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্বকীয় শিক্ষা ও উপলব্ধির দ্বারা গল্প-সাহিত্যকে প্লটভিত্তিক করে তুলেছেন। এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়-বিন্যাসের কৌশলসমূহ আলোচিত হলো—

এক. বঙ্কিমচন্দ্রের প্লটরচনার ধর্তাইটা পরিকল্পিত ও পূর্ব-নির্ধারিত। তাঁর অধিকাংশ রচনায় খণ্ডভাগ ও নামকরণ এবং পরিচ্ছেদের শিরোনাম ও বিষয়গত সম্পূর্ণতা এই প্রত্যয়বোধের অন্যতম কারণ এবং এ-সব শিরোনাম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর পরিচয় জ্ঞাপক।

দুই. বিষয়গত ঐক্য তাঁর রচনার অন্যতম বিশেষত্ব। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার পরিচয় একটি পত্রে পাওয়া যায়।[১] বিষয়গত পরিমিতিবোধ এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। অবশ্য সবক্ষেত্রেই তিনি এই ঐক্য বজায় রাখতে পারেন নি। মৃণালিনীর পটভূমি বঙ্গে মুসলিম-বিজয়, কিন্তু ঘটনাস্রোতের আবর্তনে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর নিয়তি-তাড়িত কাহিনীটি পশুপতি-মনোরমার কাহিনীর নিকট ম্লান হয়ে গিয়েছে। যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রাধান্য থাকাই উচিত ছিল। বিষবৃক্ষের হীরা-দেবেন্দ্রের বিষয়টি সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর কথাবস্তুর পক্ষে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চন্দ্রশেখরের মীরকাসেম-দলনীর কাহিনী প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর মূল কাহিনীর পক্ষে

১. দ্রঃ—বর্তমান গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

কি খুব বেশি আবশ্যক ছিল? বরং মীরকাসেম-দলনীর কাহিনী একটি স্বতন্ত্র রোমান্সের কথাবস্তু হতে পারত।[১০] অপর দিকে বিষয়গত পরিমিতি ও ঘটনাগত ঐক্যের দিক থেকে কপালকুণ্ডলা-রজনী-কৃষ্ণকান্তের উইল-রাজসিংহ উপন্যাস রূপে অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ।

তিন. বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পারম্ভে 'পথে'র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। দুর্গেশনন্দিনীর আরম্ভ এই ভাবেই। এই কৌশলটি মূলতঃ ভূদেবীয়।[১১] বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরা পর্যন্ত গল্পারম্ভ রীতির দিক দিয়ে ভূদেবকে অনুসরণ করলেও চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তের উইল-রাজসিংহ-দেবীচৌধুরাণীতে গল্পারম্ভ 'পথ' দিয়ে নয়। এক দেশে এক রাজা ছিলেন—এই প্রাচীন গল্পবলার রীতি চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তের উইল-রাজসিংহে অনুসৃত হয়েছে। আনন্দমঠের আরম্ভ ইতিহাসগ্রন্থের মতো, কিন্তু সীতারামে পূর্বরীতিই ফিরে এসেছে।

চার. বিষয়-বিন্যাসে পত্র লেখন একটি কৌশল রূপে গৃহীত হয়। বিশেষত্বের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পত্রসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

ক. দীর্ঘপত্রসমূহ বিশেষ করে সূর্যমুখীর পত্র, নগেন্দ্র-হরদেব ঘোষালের পত্রালাপ বিষবৃক্ষ-এ তথ্যাতিরিক্ত বলেই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার দীর্ঘ-পত্রখানির মারফত বিমলার যথার্থ পরিচয় ও তিলোত্তমা-বিমলা-বীরেন্দ্রসিংহ প্রমুখের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে, রাজসিংহের মহাকাব্যিক প্লট রচনায় চঞ্চলকুমারীর পত্রের গুরুত্বও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। খ. সংক্ষিপ্ত পত্রগুলি তথ্যজ্ঞাপন ও ঘটনাস্রোতের গতিপরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। কতলু খাঁ (দুর্গেশনন্দিনী)-র পত্রটি কিংবা ব্রাহ্মণবেশী (কপালকুণ্ডলা)-র পত্রটি ঘটনা-স্রোতের গতি পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। মৃণালিনীর পত্রটিতে মৃণালিনী-গিরিজায়া-হেমচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোবিন্দলাল ও ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল)-এর পত্রালাপ ঘটনার পরিণতি জ্ঞাপক ছিল। গ. অন্তর্জীবন কথন: প্লট রচনায় ব্যাখ্যানের চেয়ে বর্ণনার দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক ছিল, কিন্তু কোনো কোনো পত্র আত্মকথনের সূত্রে এই ব্যাখ্যানের অভাবটি পূরণ করেছে। আয়েষা ও জগৎসিংহ (দুর্গেশনন্দিনী)-এর পত্রালাপ এবং বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়ের ব্যাপারে কমলমণির নিকট লিখিত

১০. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/১৩৭০ বঃ/২২৪ পৃঃ।
১১. প্রমথনাথ বিশী/ভূমিকা—ভূদেব রচনা সম্ভার/৸৵০-৸৶০ পৃঃ।

অন্তরে-বাহিরে ক্ষত-বিক্ষত পতিপ্রাণা সূর্যমুখীর পত্রটি চরিত্রসমূহের অন্তর্লোক প্রকটনেই সাহায্য করেছে।

পাঁচ. আকস্মিক ঘটনা, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ গণনা, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্লট-রচনাকে প্রভাবিত করেছে। এ সবই রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত। দুর্গেশনন্দিনীর সূচনায় জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমা ও বিমলার আকস্মিক সাক্ষাৎকার এবং অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষ গণনার ফলাফল দুর্গেশনন্দিনীর পরিণতি জ্ঞাপক ছিল। কাপালিক এবং অতি প্রাকৃত পরিবেশ ছাড়া কপালকুণ্ডলার প্লট রচনা ভাবাই যায় না। নায়িকাদের স্বপ্নদর্শন কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষের প্লটের ক্ষেত্রে পরিণতি জ্ঞাপক ছিল। মৃণালিনীর সূচনায় জ্যোতিষ মাধবাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মৃণালিনীর ইঙ্গিতপূর্ণ স্বপ্নদর্শন পথনির্দেশক রূপে কাজ করে। চন্দ্রশেখরে রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ এবং যোগবল একই ভূমিকা পালন করেছে। রজনীতে আকস্মিক ভাবে অন্ধ রজনীর শচীন্দ্রের শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ লাভই ঘটনাপ্রবাহকে পরিণতিমুখী করেছে। মোবারক সম্পর্কে জ্যোতিষ গণনা রাজসিংহের ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি জ্ঞাপক ছিল। আনন্দমঠে সন্ন্যাসী-সংঘই সমগ্র পটভূমি রচনা করে এবং উপন্যাসের বিষয়টিও সেই পরিমণ্ডলেই পূর্ণতা লাভ করে। সীতারামে জ্যোতিষ গণনা আছে, ঘটনারম্ভে ফকিরও আছে এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাটির তাৎপর্যও গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী প্রমাণিত করবার জন্যই সীতারাম উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে যত্নবান হয়েছেন, জ্যোতিষবচন ফলেছে, তবে কিছুটা ভিন্ন অর্থে। বঙ্কিম-উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট-ভাবনা কতটা সংহত ও সুনিরূপিত ছিল।

ছয়. কথাবস্তুতে বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতন উপস্থিতি তাঁর উপন্যাসের গঠনকৌশলের অন্যতম বিশেষত্ব। 'ইংরাজীর প্রকৃত নভেলের পারিপাট্য' বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আনয়ন করেছেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই অভিমত[১২] যথার্থ হলেও, উপদেশদানের প্রবণতা এবং বিষয়-বিন্যাসে ঘোষক ও যোগসূত্ররচনাকারীর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করার ফলে শিল্পশৈলীতে শিথিলতা দেখা দিয়েছে এবং গল্পধারার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। ক. সাহিত্যকে সামাজিক হিতবাদের প্রচার মাধ্যম করতে গিয়ে তিনি নীতিজ্ঞের

১২. বর্তমান গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিষবৃক্ষের 'বিষবৃক্ষ কি ?'—পরিচ্ছেদের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন, কিংবা বিষবৃক্ষের সর্বশেষ বক্তব্যটি "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" খ) বিষয়-গ্রন্থনে যোষক ও সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকা গ্রহণের প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রথমাবধি লক্ষণীয়। দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে জগৎসিংহের পরিচয়দান প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন: "যৎকালে কার্য সমাধা করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তর মধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।" কিংবা রাজসিংহের সূচনাতে: "বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে। সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা।" এই ধরণের অসংখ্য উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এর ফলে বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পসত্তা এবং গল্পরসের নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অধিকন্তু গল্পও সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতি হতে পারে নি।

সাত. বিষয়বস্তুর নাটকোচিত খণ্ড বিন্যাস, উত্থান-পতন ও তার নাট্যগুণ বঙ্কিমী প্লট রচনার অন্যতম বিশেষত্ব। কপালকুণ্ডলায় ঘটনাগত খণ্ড বিন্যাস উপন্যাসটিকে একটি চতুরঙ্ক নাটকের গঠনকৌশল দান করেছে এবং পাশ্চাত্ত্য নাটকের ট্র্যাজিক প্রতিবেদনের রূপটি শেষ খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য মৃণালিনীর বিষয়বিন্যাসে এই চতুরঙ্ক পদ্ধতির অনুসরণ বিষয়গত দুর্বলতার জন্য সার্থক হয়নি, ষষ্ঠখণ্ডে চন্দ্রশেখর-এর বিষয় বিন্যাসও নাট্যপরিকল্পনা-সঞ্জাত এবং তা ট্র্যাজিক প্রতিবেদনের সহায়ক হয়েছে। এ ছাড়াও দীর্ঘ কথোপকথন ও নাটকীয় ঘটনার আয়োজনের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য নাট্যধর্ম রক্ষা করেছেন।

ক. কথোপকথন নাটকের প্রাণ। চরিত্রসমূহের কথোপকথনের শিল্পিত প্রকাশ-ভঙ্গির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিষয়-বিন্যাসে নাট্যরস সঞ্চার করেছেন। প্রথমতঃ কথোপকথনের সহায্যে গল্পকে এগিয়ে দেওয়া, যেমন দুর্গেশনন্দিনীর 'অভিরাম স্বামীর মন্ত্রনা' বা 'মুক্তকণ্ঠ', কপালকুণ্ডলার 'আশ্রয়ে', বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী ও কমলমণি, রাজসিংহের 'চিত্রবিচারণ,' 'সমিধ সংগ্রহ', 'স্বয়ংযম' প্রভৃতি পরিচ্ছেদ সমূহের কথোপকথন, কৃষ্ণকান্তের উইলের হরলাল ও রোহিনীর কথাবার্তা কিংবা রোহিণী হত্যার প্রাকালে গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর কথোপকথন প্রভৃতিও এর অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ নরনারীর অন্তর্জীবন প্রকটন, যেমন বিষবৃক্ষের 'ধরা পড়িল' পরিচ্ছেদে কমলমণি ও কুন্দনন্দিনীর কথোপ-

কথনচ্ছলে কুন্দনন্দিনীর প্রেমবিহ্বলতার প্রথম প্রকাশ, চন্দ্রশেখর-এর 'বজ্রাঘাত পরিচ্ছেদের কথোপকথনে প্রতাপকে পাওয়ার জন্ত শৈবলিনীর সুপ্ত বাসনার প্রকাশ, কৃষ্ণকান্তের উইলের কল্পিত সুমতি ও কুমতির কথোপকথনের মাধ্যমে রোহিণী ও ভ্রমরের অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি। এই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন উপন্যাসে বিশ্লেষণের দ্বারস্থ না হয়ে কথোপকথনের সাহায্যে নরনারীর অন্তর্জীবন প্রকটনের প্রয়োজনীয় কাজটুকু সেরে নিয়েছেন।

খ. নাটকীয় ঘটনার আয়োজন। দুর্গেশনন্দিনীর আরম্ভে সাক্ষাৎকার স্থলকে 'দেবমন্দির' বললে কম বলা হয়, ওটি বস্তুতঃ রঙ্গালয়ের নাট্যমঞ্চ, 'প্রকোষ্ঠে' ও 'খড়্গো খড়্গো'র ঘটনাসমূহ নাটকীয়তায় পূর্ণ। কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের সঙ্গে কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎকার ও কাপালিকের বধ্যভূমি থেকে নবকুমারের উদ্ধারলাভ নাট্যরসযুক্ত, চন্দ্রশেখরের প্রতাপ ও শৈবলিনী কর্তৃক পরস্পরকে উদ্ধারও নাটকীয়তায় পূর্ণ।

আট. ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের রচয়িতা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রসমূহকে প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছেন। আয়েষা-জগৎসিংহ, নবকুমার-কপালকুণ্ডলা, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী-হীরা, গোবিন্দলাল-রোহিনী ঘটনার গহন অরণ্যে আলালের ঘরের দুলালের মতিলালের মতো হারিয়ে যায় নি। লক্ষণীয় যে, ঘটনার বিকাশের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রসমূহ রূপায়ণ করেন, চরিত্রসমূহকে ঘটনার নিয়ামকরূপে সৃষ্টি করেন নি, ফলে চরিত্রসমূহের বিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায় না। অধিকন্তু উপন্যাসের প্লট রচনায় বঙ্কিমী রীতির সাধারণ ধর্মটি এর জন্য অনেকাংশে দায়ী: বঙ্কিমচন্দ্র কেন বা কী ভাবে—এই প্রশ্নের বিশ্লেষণমূলক উত্তর না দিয়ে পাঠকচিত্তের 'তারপর, তারপর' জাতীয় কৌতূহলের সন্তুষ্টি সাধন করেছেন। ফলে চরিত্রসমূহ হয়েছে type ও flat, round চরিত্র নেই বললেই চলে, একমাত্র শৈবলিনী চরিত্র-কল্পনায় বিবর্তনের আংশিক পরিচয় আছে। এর মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পাদর্শ বিশেষভাবে কাজ করেছে: তিনি চরিত্রসমূহকে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার অধীন করার পক্ষপাতী ছিলেন।[১৩] লক্ষণীয় যে, ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার চরিত্রগুলি এরিস্টটলীয় মহৎ ভাবনার দ্যোতক। ঘটনা কল্পনার তড়িৎস্পর্শে পল্লবিত হলেও চরিত্র বিকশিত হয় নি। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুধাবনীয়: "বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক

১৩. দ্রঃ—বর্তমান গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে ; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল-দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি।"[১৪]

বিষবৃক্ষ-ইন্দিরা-রজনী-কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা করেই বঙ্কিমচন্দ্র নভেল-রচয়িতা-রূপে পরিগণিত হন। কথাবস্তু ও চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে তিনি এই পর্যায়েই বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন এবং পরবর্তী নভেল-রচয়িতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

লক্ষণীয় যে, কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী ধারাবাহিক আখ্যান রচনা-পদ্ধতির পরিবর্তন আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বিন্যাসকে একটি নিটোল রূপ দিলেন। তাঁর প্লট-ভাবনায় বিষয়সমূহ প্রধানতঃ অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত।

বাংলা কথাসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম নরনারীর জীবন পরিস্ফুটনে যত্নবান হন। গভীর জীবনবোধ ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে নরনারীর শাশ্বত ও চিরন্তন রূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে শেক্সপীয়রকে আদর্শ মেনেছিলেন।[১৫] জীবনের অতলে ডুব দিতে পেরেছিলেন বলেই বঙ্কিম-চন্দ্রের আঁকা নরনারী আমাদের নিকট আজো জীবন্ত ও শাশ্বত মনে হয়। আয়েষা আজো শাশ্বত, কুন্দনন্দিনী আজো ফুলটির মতো সতেজ, রোহিণী আজো আকাশের নক্ষত্রটির মতো জ্বল জ্বল করছে।

বাংলা কথাসাহিত্যকে তিনি কী দিতে পেরেছেন তাই আমাদের বিচার্য, তিনি কী দিতে পারেন নি তা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়, কেননা 'নভেল' তথা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি কিছুই লাভ করেন নি, কিন্তু তিনি ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেলেন। তাঁরই তৈরী পথে বাংলা নভেল-এর যাত্রা আরম্ভ হলো।

বঙ্কিম-সমসাময়িক পর্ব

১৮৬১-৬২কে বঙ্কিমচন্দ্রের Rajmohan's Wife-এর আনুমানিক রচনাকাল ধরলে এবং ১৮৯৩কে তাঁর 'শেষ ও বৃহত্তম উপন্যাস' [রাজসিংহ (পুনঃপ্রণীত)-এর

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ছিন্নপত্র/১৯০৫/১৫ পৃঃ।

১৫. Bankim Rachanavali (English). Sahitya Samsad. 1969 p. 184.

চতুর্থ সংস্করণ]-এর রচনাকাল ধরলে, দীর্ঘ তিরিশ বছরেরও বেশি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের জগতে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দেদীপ্যমান ছিলেন। এই পর্বে আরো অনেক বাঙালি ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। এই পর্বের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের মধ্যে আছেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ এই কালের হয়েও এই পর্বভুক্ত নন, কারণ তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিকাশ বঙ্কিম পরবর্তী-কালে : চোখের বালিকে মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-পরবর্তী।

ক. প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯) রচনা করেই প্রথম বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিষয়বস্তুর বিচারে রচনাটি রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)-এর অনুসারী হলেও প্রতাপচন্দ্র এতদ্‌সম্পর্কিত সমসাময়িক বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করেন। এই তথ্য তাঁর রচনার ভূমিকায় ও পরিশিষ্টে আছে। বসন্ত রায়কে হত্যার পর থেকে প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস পর্যন্ত সকল ঘটনা ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এবার আমরা 'উপন্যাস' হিসেবে রচনাটির যাথার্থ্য বিচার করতে পারি।

এক. বঙ্গাধিপ পরাজয় দুই খণ্ডে রচিত—প্রথম খণ্ড ১৮৬৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪তে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সর্বমোট একচল্লিশটি অধ্যায়ে রচিত। রচনাটি সমসাময়িক ইংরেজি বৃহদাকার উপন্যাসের সমতুল্য এবং প্রথম সর্ববৃহৎ মৌলিক বাংলা রচনা। রচনা হিসেবে দ্বিতীয় খণ্ডের কোনো মৌলিক অবদান নেই এবং মূল বিষয়টির সঙ্গেও সম্পৃক্ত নয়। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে প্রথম খণ্ডেই লেখকের বক্তব্য বিষয় শেষ হয়েছে। প্রথম খণ্ডেই বঙ্গাধিপ প্রতাপা-দিত্যের পরাজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়বস্তুগত রস পরিণতিও ঘটেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে জানা যায় দীর্ঘ বারো বছর পর সুযোগ ও পাঠকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাবার পর লেখক প্রথম খণ্ডের বিষয়ের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। কিন্তু তা অবশ্যই কাম্য নয়। এছাড়াও ঘটনার অতিরেক ও বিষয়ের অহেতুক সম্প্রসারণে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের বিষয়গত ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং গল্পরসও জমাট বাঁধে নি।

দুই. রচনাটি বিবৃতি মূলক এবং ধারাবাহিক বর্ণনারীতিই বিষয়গ্রন্থনে অনুসৃত

হয়েছে। ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। কোনো কোনো অতীত কাহিনী লোকমুখে বিবৃত করে লেখক বিষয়গত উপস্থাপনায় অভিনবত্ব আনয়ন করেছেন।

তিন. বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)-র ঢং-এ প্রতিটি অধ্যায় শীর্ষ সংস্কৃত উদ্ধৃতি যোগে অলঙ্কৃত। আর গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সার্থকতা নির্ণয়ক 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং' উদ্ধৃতিটি উৎকলিত হয়েছে।

চার. বিষয়-বিন্যাসে লেখকের উপস্থিতি ধরা পড়ে, এটি ঔপদেশিক বিড়ম্বনার ফল। এর ফলে গল্পরসের প্রবাহ ধীর হয়েছে।

পাঁচ. নামকরণ প্রসঙ্গটি লেখকের ভূমিকা থেকেই জানা যায়। তিনি প্রথমে রচনাটির নাম 'বঙ্গেশ-বিজয়' রাখেন, এবং তদনুসারেই বক্তব্য রাখেন। পরে মুদ্রণকালে নাম পরিবর্তন করে বঙ্গাধিপ পরাজয় রাখেন। অবশ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রেও 'বঙ্গেশ-বিজয়' নামটি ক্ষুদ্রাকারে রক্ষিত হয়েছে।

ছয়. ভাষার দুর্বলতা এই উপাখ্যানের অন্যতম ত্রুটি। তিনি প্রধানত সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্য অনুসরণ করেছেন, কিন্তু কোনো কোনো কথোপকথনে সাধু-চলিতের মিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় (যেমন বল্লভ-প্রভাবতীর কথোপকথন, প্রথম খণ্ড)। কথাগদ্যের বিশেষত্ব প্রতাপচন্দ্র ঘোষের জানা ছিল না। এই রচনায় "পবিত্র সংস্কৃতজাত শব্দই অধিক ব্যবহার হইয়াছে, কেবল যেখানে সামান্য বাঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রাকৃত ভাব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, সেইখানেই অপভ্রংশ শব্দই নিযুক্ত হইয়াছে।" লেখক এই কথা 'ভূমিকা'তেই বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তৎসম শব্দ প্রধান ভাষা ব্যবহার করেও কবিত্ব রস সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, এর কারণ ভাষায় কল্পনার তড়িৎস্পর্শের সঞ্চার, কিন্তু এই সঞ্চার শক্তি প্রতাপচন্দ্রের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

সাত. ব্যক্তিত্বোজ্জ্বল কোনো চরিত্রের সন্ধান এই রচনায় পাওয়া যায় না। ব্যক্তি চরিত্রের প্রকাশ নয় সামগ্রিক ভাবে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস রচনাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। অধিক কী? গল্প রচনার চেয়ে ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় প্রদানের জন্যই লেখক সমধিক উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

মধ্যযুগের বাঙলার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা ও রাজা প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিকতা রক্ষার ঐকান্তিক প্রয়াসের জন্য রচনার বিষয়টি কার্যত বিরাট আকার ধারণ করে। উপরোক্ত কারণে সমালোচকগণ যদি বঙ্গাধিপ পরাজয়কে উপন্যাস পদবাচ্য

না করেন, তবে খুব অন্যায় করা হবে না।[১৬] এবং শিল্পশৈলীর স্বার্থেই আমাদেরকে এই রায় মেনে নিতে হবে। বস্তুতঃ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রোমান্স বা ঐতিহাসিক উপন্যাস জাতীয় রচনার শিল্পশৈলী আয়ত্ত করতে পারেন নি। তিনি অনুপ্রেরণার শিকার হয়েছিলেন। নচেৎ তিনি দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় অগ্রসর হতেন না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের অন্য একটি গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট-এর কথাবস্তুর উৎস বঙ্গাধিপ পরাজয়।[১৭]

খ. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তারকনাথের স্বর্ণলতা এই পর্বের আরেকটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির রচনা। ১৮৭২-এর সেপ্টেম্বর থেকে জ্ঞানাঙ্কুরে স্বর্ণলতা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়। ১৮৭৪-এ স্বর্ণলতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক জীবন ধারা ও মানুষই নভেল-এর বিষয়বস্তু হবে—এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারকনাথ স্বর্ণলতা রচনা করেন। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, এই প্রয়াস কতদূর সার্থক হয়েছে।

প্রথমতঃ তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবলম্বনে ও সমসাময়িক বাঙালি জীবনের পটভূমিতে স্বর্ণলতা রচনা করেন। তিনি 'বাস্তবধর্মী উপন্যাস' রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন, এই প্রসঙ্গে তিনি স্বর্ণলতার আখ্যাপত্রে 'Fictions to please should wear the face of truth'—হোরেসের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেন। তারকনাথ সম্ভবত আলালের ঘরের দুলাল ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের দ্বারা প্রভাবিত হন। কারণ তাঁর রচনাও দুই সহোদর ভাইয়ের বিপরীত ধর্মী জীবন কথা। এছাড়া এই তিনের বক্তব্যও সমধর্মী : পাপের পরাজয়, ধর্মের জয়। তারকনাথও পূর্ববর্তী দুজনের মতো নীতিবেত্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শশিভূষণ ও বিধুভূষণকে কেন্দ্র করে তিনি প্রথমাবধি পাপপুণ্যের বণ্টনে আগ্রহী ছিলেন। পাপের পরিণাম ঘটেছে শশিভূষণ-প্রমদা-প্রমদার মাতার ক্ষেত্রে, আর ধর্মের বিজয় কেতন উড়েছে বিধুভূষণের জীবনে এবং সরলার মৃত্যুতে। বস্তুতঃ এই নীতির স্বার্থেই স্বর্ণলতার কথাবস্তু জীবন্ত হতে পারে নি, পারে নি চিত্তাকর্ষক হতে। অন্যদিকে গল্পেও কোনো জটিলতা দেখা দেয় নি।

দ্বিতীয়ত : কথাবস্তুর বিচারে স্বর্ণলতা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের রূপায়ণ নয়।

১৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায়/ঐতিহাসিক উপন্যাস—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৪/৩৬ পৃঃ।

১৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/রবীন্দ্র জীবনী (১ম খণ্ড)/১৯৭০/১৩৪ পৃঃ।

নীলকমলের জীবন, শশিভূষণ-বিধুভূষণের জীবনধারা ও গোপাল-স্বর্ণলতার বিবাহ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত নয়। অধিকন্তু পরিচ্ছেদ বিন্যাসের দিক দিয়েও স্বর্ণলতার দুটি স্পষ্ট বিভাগ আছে। সাতাশ পরিচ্ছেদে বিধৃত প্রথম বিভাগে পড়ে শশিভূষণ-বিধুভূষণের সংসারের কথা, এবং পরের আঠারো পরিচ্ছেদে আছে গোপাল-স্বর্ণলতার কথা। বস্তুতঃ মূল গল্পের পরিসমাপ্তি সরলার মৃত্যুতেই এবং গোপাল-স্বর্ণলতার বিষয়টি গল্পের মূলধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত নয় বরং এই বিচ্ছিন্ন বিষয়টি একটি পৃথক নভেলের বিষয় হতে পারত। কেননা নভেলের উপজীব্য বিষয় প্রেম এবং তা এই দ্বিতীয় ভাগেই আংশিক বিদ্যমান। আর সরলার মৃত্যুতেই আখ্যানটি শেষ হলে অপেক্ষাকৃত একটি নিটোল গল্প হয়ে উঠতে পারত। কথাবস্তু সম্পর্কে লেখকের পরিমিতি বোধের অভাবেই এই বিপর্যয় ঘটেছে অধিকন্তু আখ্যানের মাঝখানে নীলকমলের কথা গল্পপ্রবাহের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করেছে।

তৃতীয়ত : নভেল রচনা একটা আর্ট এবং একটা ফর্ম বিশেষ। লেখক এ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। তাঁর মনোভঙ্গি ছিল সাংবাদিকের অনুরূপ। তিনি সমকালীন নরনারীর জীবনের উপরিভাগকেই দেখেছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি স্বর্ণলতা ও গোপালের অন্তরঙ্গ জীবনের দ্বন্দ্ব ও রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন নি। ফলে বিষয়-বিন্যাসে ও চরিত্র সৃজনে অন্তর্বাস্তবতার অভাব থেকে গিয়েছে। অধিকন্তু নীতি প্রচারেরর ফলে চরিত্র সমূহও নির্দ্বন্দ্ব হয়ে পড়েছে, হয়েছে একরঙা। একমাত্র সরলাই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে এবং শ্যামা চরিত্রটি মানবিক গুণে উজ্জ্বল।

চতুর্থতঃ বিষয়টিও জটিল নয়, কথাবস্তুর উপস্থাপনও জটিল নয়। ধারাবাহিক বর্ণনরীতি বিষয়-বিন্যাসে অনুসৃত হয়েছে। রেলগাড়ীর বগী জুড়ে দেওয়ার মতো পরিচ্ছেদ সমূহ একের পর এক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নভেল-এর প্লট-বিন্যাস হবে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত।

পঞ্চমতঃ আখ্যানের গৌণ বিষয়ের একটি চরিত্রের নামে নামকরণ করায় আখ্যানটির গল্পরস মাঠে মারা পড়েছে। স্বর্ণলতা মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নয় বা কোনো প্রধান চরিত্রও নয়। এক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নামকরণের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান নায়িকার নামানুসারে রচনার নামকরণ

করেন। এদিক থেকে সরলার নামে আখ্যানের নামকরণ অধিক শ্রেয় ছিল।[১৮] ষষ্ঠতঃ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমের আদর্শের বিরোধিতা[১৯] করলেও গোপালের মিলন পর্যায়ে শশাঙ্ক শেখর স্মৃতিগিরির বাধাদান, স্বর্ণলতার বন্দীদশা, অগ্নিকাণ্ড, গোপালের ট্রেনবিপর্যয়, কারাবাস ও মুক্তি প্রভৃতি ঘটনার পর স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের মিলন ও বিবাহ রোমান্টিকতার স্পর্শবহ এবং অলৌকিক রসে সঞ্জীবিত। এক্ষেত্রে লেখক বঙ্কিমপ্রভাবিত। সমালোচকগণের অনুকূল মন্তব্য[২০] সত্ত্বেও গোপাল ও স্বর্ণলতার মিলনকে অভাবনীয় মিলনই বলা চলে।

তবে কী বাংলা কথাসাহিত্যে তারকনাথের কোনো অবদান নেই? তারকনাথ বঙ্কিম-প্রবর্তিত কথাসাহিত্যের গতি পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। স্বর্ণলতা-র কথাবস্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের সাধারণ বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার পটভূমিতে গৃহীত হয়। এরূপ বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের দ্বারা প্রভাবিত হন।[২১] কিন্তু তারকনাথ যথার্থ ঔপন্যাসিক প্রতিভার অধিকরী ছিলেন না, তাই ডিকেন্স বা অন্য কারোর রচনাশৈলীকে তিনি আত্মস্থ করতে পারেন নি। তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি কোনো নতুন শিল্পভঙ্গি। তাই তাঁর বঙ্কিমবিরোধিতা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ স্বর্ণলতাকে স্বসমাজ-নির্ভর প্রথম সার্থক উপন্যাস ও বাঙলাদেশের প্রথম সামাজিক উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করেছেন।[২২]

শিল্পশৈলীগত বড়ো রকমের ত্রুটির জন্যই স্বর্ণলতা শেষপর্যন্ত নভেল হয়ে উঠতে পারে নি, সার্থক কী না সে প্রশ্ন তোলা অনাবশ্যক। অধিকন্তু তাঁর কথাগদ্য সরল সাধুভাষায় রচিত এবং যথেষ্ট জীবননিষ্ঠ হলেও কল্পনা-সম্পৃক্ত হতে না পারায় গদ্য স্পন্দিত হতে পারে নি এবং হয় নি যথার্থ সাহিত্যরসবাহী ও

১৮. অমৃতলাল বসু স্বর্ণলতা-র নাট্যরূপ দেন (১৮৮৮) এবং সরলা নামে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কেননা সরলা ব্যতীত অন্যকোনো চরিত্রের পক্ষে দর্শকদের নিকট আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না।

১৯. স্বর্ণলতা গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২০. 'স্বর্ণলতা'র চতুর্থ সংস্করণে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত একটি পত্র মুদ্রিত হয়। পত্রটিতে স্বর্ণলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে: "ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর-ডাকাতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এ সকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী তাহার অসাধারণ কোনও গুণ আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে।"

২১. প্রমথনাথ বিশী/ভূমিকা—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত স্বর্ণলতা/১৯৬৫ [১১] পৃঃ।

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৫৭/১৯৪৬/২২ পৃঃ

প্রসাদগুণ সম্পন্ন। সম্ভবত রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজ ও সংসার রচনাদ্বয়ে স্বর্ণলতার প্রভাব পড়েছে।

গ. রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিম-সমসাময়িক উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্দ্রই প্রধান উপন্যাস-লেখক। তাঁর উপন্যাস ছয়টি হলো বঙ্গ বিজেতা (১৮৭৪)-মাধবীকঙ্কন (১৮৭৭) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯)-সংসার (১৮৮৫) সমাজ (১৮৯৩)। বিষয়-ভাবনার দিক থেকে প্রথম চারটি রচনা ইতিহাসাশ্রয়ী এবং শেষ দুটি রচনা সমসাময়িক জীবন-ভিত্তিক। Grant Duff-এর লেখা মারাঠা ইতিহাস এবং Todd-এর লেখা রাজস্থানের ইতিহাস পাঠে অনুপ্রাণিত হয়েই রমেশচন্দ্র জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক কাহিনীরূপে মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা রচনা করেন।[২৩] অবশ্য অতীত ইতিহাস নিয়ে গল্প রচনার প্রেরণা তিনি Scott-এর রচনা পড়েই লাভ করেন। আর সংসার ও সমাজ সামাজিক মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়[২৪]। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে উপন্যাস রচনার প্রেরণা লাভ করলেও তিনি বঙ্কিমের মতো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এরজন্য দুয়ের মনোভঙ্গি দায়ী। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিকের প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিকের প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এবারে তাঁর রচনার শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে—

এক. রমেশচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এবং বিষয়বিন্যাস ঘটনাক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিক পদ্ধতিতে রচিত। বিষয়গত জটিলতা পরিহার করায় বিষয়বিন্যাস অনেকাংশে সরলরৈখিক হয়েছে এবং যৌগিক বিষয়ের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। ঘটনাগত বা বিষয়গত দিক থেকে প্রত্যেকটি রচনার পরিচ্ছেদ সমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, মনে হবে এক একটি statement বিশেষ, ইতিহাস-নিষ্ঠা এর মূলে কাজ করেছে। কার্যত একই রচনাভুক্ত হলেও পরিচ্ছেদ সমূহ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত নয়। এই সত্য শুধু ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার ক্ষেত্রে নয়, সংসার ও সমাজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

২৩. Ramesh Chandra Dutt. Open Letters to Lord Curzon and Speeches and papers. Calcutta, 1904. p. 150.

২৪. Gupta, J. N. Life and work of R C. Dutt. Calcutta, 1911. p. 189.

দুই. ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা চারটির প্রত্যেকটি পয়ত্রিশটি শীর্ষনামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ শীর্ষ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অনুরূপ অর্থবহ ও বিষয়ানুসারী উদ্ধৃতি সম্বলিত। আর সংসার ও সমাজের প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিবিহীন তিরিশটি শীর্ষনামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিচ্ছেদ শীর্ষে কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু দুই শ্রেণীর উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যার এই নির্দিষ্টতা গল্পের স্বভাব-বিরুদ্ধ, মনে হবে প্রত্যেকটি গল্পকেই সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়েছে। এ যেন পঞ্চাঙ্ক নাটকের অঙ্ক ভাগের মতো।

তিন. বিষয়গত ঐক্যসাধনে রমেশচন্দ্র আদৌ সাফল্য অর্জন করেন নি। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে সরযূ-রঘুনাথের প্রণয়গাথা মূল গল্পের পক্ষে খুব কি আবশ্যক ছিল? অনুরূপে পুষ্পকুমারী তেজসিংহের প্রণয়গাথ রাজপুত জীবন সন্ধ্যার মূল কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নয়।

এ ছাড়া রচনায় একটি প্রধান কাহিনী ও একটি গৌণ কাহিনী আছে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গৌণ কাহিনীটি প্রধান হয়ে উঠেছে। জীবন প্রভাত-এ প্রধান কাহিনীটি হলো রঘুনাথ কেন্দ্রিক ও গৌণ কাহিনীটি হলো শিবাজী কেন্দ্রিক। 'জীবন সন্ধ্যা য় প্রধান কাহিনীটি হলো তেজসিংহ কেন্দ্রিক এবং গৌণ কাহিনীটি হলো প্রতাপসিংহ কেন্দ্রিক। আর, সংসারও সমাজ রচনাদ্বয় বলতে গেলে একটি গল্পেরই প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড।

বস্তুতঃ তথ্য পরিবেশনের নৈপুণ্য থাকলেও রমেশচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙালি-জীবন-ভিত্তিক রচনা দুটি 'নভেল' অর্থে রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। এই সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর উদ্দেশ্য প্রবণ মনোভাব কাজ করেছিল। বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের গুরুত্ব প্রচারের জন্যই রমেশচন্দ্র সংসার ও সমাজ রচনা করেন। তিনি ইতিহাসকারের তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলেও কবির মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি ও ঔপন্যাসিকের গভীর জীবনবোধ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না,[২৫] ফলে কথাবস্তুর মধ্যে রম্যভাবটি প্রকাশ পায় নি। আর কল্পনার তড়িৎ স্পর্শের অভাবে গল্পের বাতাবরণও সঞ্জীবিত হতে পারে নি। এর ফলে বিষয়বিন্যাস সুসম্বদ্ধ যুক্ত হতে পারে নি এবং গল্পরসও জমাট বাঁধে নি। পরিণতিতে সংসার ও সমাজ সমাজচিত্র হয়ে উঠেছে। যা নিটোল গল্প হয়ে উঠতে পারে নি তাকে

২৫. Humayun Kabir. The Bengali Novel. 1968. p.20.

নভেল তো দূরের কথা সাধারণ অর্থে উপন্যাস বলা চলে কি না তা ভেবে দেখতে হবে। আর, স্বজ্যমান বাংলা নভেল রচনার ধারায় তিনি শিল্পশৈলীগত কোনো বিশেষত্বও আনয়ন করতে পারেন নি।

—রবীন্দ্র পর্ব—

উপন্যাসে রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষ : করুণা

বঙ্কিম-প্রতিভার বিকাশ পর্বেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। 'করুণা' (১৮৭৭) ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ প্রতিভার পরিচয়-বহ। বাংলায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘগল্পকেও উপন্যাস নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, এই অর্থে 'করুণা' উপন্যাস, কিন্তু যথার্থ নভেল পদবাচ্য কি না তা ভেবে দেখতে হবে। করুণা রবীন্দ্রনাথের প্রথম অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার গল্প রচনার প্রয়াস। যে-বাবুসমাজকে কেন্দ্র করে বাংলায় মৌলিক আখ্যান সাহিত্যের বিকাশ এবং বাবুপর্যায়ের রচনার প্রতিষ্ঠা, তরুণ রবীন্দ্রনাথের করুণা কিয়ৎ পরিমাণে সেই বাবু-সমাজের পটভূমিতে রচিত। করুণা প্রথমে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৭৭)। কিন্তু আজ পর্যন্ত করুণা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি, যদিও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে [বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত] করুণা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, 'শনিবারের চিঠি'তেও [রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা] প্রকাশিত হয়েছিল।

করুণার বিষয় ভাবনা কি স্বকীয়তার চিহ্নবহ ছিল? করুণা সম্পর্কিত এই খবর জীবনস্মৃতির প্রাথমিক খসড়ায় পাওয়া যায়। "কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোন বই বাহির হইত তাহা আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না।.....এইসব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি—প্রথম বৎসরে ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা'—নামক গল্প তাহার নমুনা।"[২৬] বাল্যকালের এই জ্যাঠামিকে তিনি প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং পরিণত বয়সে-এর জন্য তিনি স্বভাবতই লজ্জা বোধ করেছেন। করুণা অসম্পূর্ণ নয়, পূর্ণ রচনা[২৭]। আমাদের আলোচনা করুণার শিল্পশৈলী সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ। শিল্পশৈলীর বিচারে করুণার নিম্নরূপ বিশেষত্বসমূহ নির্দেশ করা যায়।

২৬. গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড) /১৯৬৪/১০১০ পৃঃ।
২৭. জ্যোতির্ময় ঘোষ/রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়/১৯৬৯/৬৪ পৃঃ।

এক. 'সূচনা' বাদে সাতাশটি পরিচ্ছেদে করুণা রচিত। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ শিরোনামযুক্ত। বিষয়বিন্যাস এখানে পূর্বপরিকল্পিত, বিবর্তিত নয়। পাঠকমনের 'তারপর'-এর কৌতূহল-পরিতৃপ্তি আলোচ্য বিষয়বিন্যাসের অন্যতম বিশেষত্ব। আর ঘটনাগত দিক থেকে পরিচ্ছেদসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি বঙ্কিমী বিষয়বিন্যাসের ধর্তাইয়ের অনুসৃতি।

দুই. প্রধানা নায়িকা করুণার নামে আলোচ্য রচনার নামকরণ করলেও রবীন্দ্রনাথ করুণার বিষয়গত ঐক্য রক্ষা করতে পারেন নি। করুণা-নরেন্দ্র গল্পবৃত্তে করুণা-নরেন্দ্র-স্বরূপচন্দ্র ত্রিভুজটির সার্থকতা থাকলেও মহেন্দ্র-রজনী মোহিনী ত্রিভুজটি মূল বৃত্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যসূত্রে বিধৃত হতে পারে নি। এই ত্রিভুজটি গল্পে জটিলতা আনয়ন করেছে।

তিন. রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে উপন্যাসোচিত বিস্তৃতি দিতে পারেন নি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে বহু ঘটনা ও মানুষের চাপে গল্পভাগ শুকিয়ে গিয়েছে। গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড)-এ মুদ্রিত নষ্টনীড় ও করুণার পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে তেতাল্লিশ ও পঞ্চান্ন, নষ্টনীড়ে অমল-চারুলতা-ভূপতি মাত্র তিনটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র, সমস্যা একটিই —চারু ও অমলের মধ্যকার প্রেমজ সম্পর্কের কোরক রূপটি এবং চরিত্র তিনটিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট, কিন্তু করুণায় গল্পভাগের তুলনায় বেশি সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। লেখকের কল্পনাশক্তির যথেষ্ট প্রসার না ঘটায় গল্পভাগ রমণীয় হতে পারে নি।

চার. করুণার বিষয়বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পত্রেরও সাহায্য নিয়েছেন। অনুতপ্ত মহেন্দ্রের চিঠিতে তার আত্মগ্লানির কথা প্রকাশ পায়। এই পত্র বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র ও কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালের পত্রের অনুরূপ।

পাঁচ. বিবৃতিধর্মী রচনা হলেও রবীন্দ্রনাথ করুণায় 'আমি' নামের একটি চরিত্র আনয়ন করে করুণার নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই 'আমি' চরিত্রটি সকলের মধ্যে থেকেও কারো মধ্যে বাঁধা পড়ে নি। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই 'আমি' সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।" এই 'আমি' গল্পের বিশেষ কোনো চরিত্র নয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কোনো ঔপদেশিক ভূমিকাও পালন করে নি বরং গল্পের বিষয়বিন্যাসে সংযোগ-রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

ছয়. চরিত্রসমূহ সজীব হলেও ঘটনাধীন। গল্পের জন্য নয়, ঘটনার জন্যই তিনি ঘটনাসৃষ্টি করেছেন এবং সংযোজিত ঘটনা আকস্মিকতায় পরিচয় বহ, পাঠককে

চমৎকৃত করবার জন্যই যেন ঘটনার আয়োজন। অধিকন্তু পরিসরের স্বল্পতায় চরিত্রসমূহ সুপরিস্ফুট হতে পারে নি।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় করুণার অভিনবত্ব কোথায়, রবীন্দ্র-উপন্যাস ভাবনায় করুণার স্থান কোথায় এবং করুণা সম্পর্কিত শেষ কথা কী?—বর্তমান পর্যায়ে তা আলোচিত হচ্ছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে করুণা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ প্রতিভার পরিচয়বহ। বাংলা উপন্যাসের ধারায় তিনি যে অভিনবত্ব আনয়ন করেন করুণায় তার প্রাথমিক পরিচয় রয়েছে। বস্তুতঃ করুণা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মিলনস্থল। করুণা নভেল রচনার সচেতন শিল্প প্রয়াস না হলেও স্বকীয়তার চিহ্নবহ। একদিকে যেমন করুণার নরেন্দ্র আলালের ঘরের দুলালের মতিলাল, মহেন্দ্র বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র ও কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল, করুণার গৃহত্যাগ সূর্যমুখী ও শৈবলিনীর গৃহত্যাগ ও স্বর্ণলতার সরলার কষ্টভোগ, মোহিনী রোহিণীর স্মৃতি, ভবি স্বর্ণলতার শ্যামার ত্যাগ, মহেন্দ্র-গদাধর-স্বরূপচন্দ্র মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়ের বিভিন্ন চরিত্রের কথা স্মরণ করায়; অন্যদিকে তেমনি চোখের বালির মহেন্দ্র ও আশা করুণার মহেন্দ্র ও রজনী, মানভঞ্জন ছোটগল্পের গোপীনাথ ও গিরিবালা যথাক্রমে করুণার নরেন্দ্র ও করুণা, এবং ভাবসাদৃশ্যের দিক থেকে ভিখরিণী গল্পের কমল রজনীর কথা স্মরণ করায়। বিষয়বর্ণনার দিক থেকেও করুণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছোটগল্প ও উপন্যাসের তুলনা করা যায়। যেমন গৃহপরিত্যক্ত করুণার মনোভাবের সঙ্গে পুত্রযজ্ঞ গল্পের বিনোদা এবং বিচারক গল্পের হেমশশীর মনোভাব, করুণার মোহিনীর গৃহে মহেন্দ্রর রাত্রিকালীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরবর্তী মনোভাবের সঙ্গে চোখের বালির মহেন্দ্রর মনোভাব, এবং করুণার নিরুদ্দেশ যাত্রার পথের বর্ণনার সঙ্গে জীবিত ও মৃত গল্পের কাদম্বিনীর শ্মশান থেকে প্রত্যাবর্তন পথের বর্ণনা ও নৌকাডুবি উপন্যাসের রমেশের আশ্রয় ত্যাগ করে কমলার অজানা পথযাত্রার বর্ণনা তুলনীয়।

সাধারণভাবে রবীন্দ্র-উপন্যাসের দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে—রবীন্দ্র-উপন্যাস [এক] হৃদয়-রহস্য মূলক, [দুই] ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তা ছাড়া রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিষয়ভাবনায় ভৌগোলিক সীমানার ব্যাপ্তিও লক্ষণীয়। করুণাতেও এই বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়। প্রথমতঃ করুণায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ রজনী ও মহেন্দ্রের হৃদয়লোক উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং এই প্রয়াস পরবর্তী উপন্যাস সমূহে বিশেষত চোখের বালিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ করুণা সচেতন

শিল্পপ্রয়াস নয় বলে চরিত্রসমূহ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নায়িকা করুণাকে প্রথাসিদ্ধ নায়িকার ছাঁচে না ঢেলে কিছু প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। তৃতীয়তঃ ঘরোয়া পরিবেশ বা পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে করুণা গল্পের পরিমণ্ডল গড়ে উঠলেও তা গ্রামের বাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কলকাতা এবং সুদূর কাশী অঞ্চলপর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। পরবর্তী কালের চোখের বালি, নৌকাডুবি, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ এই ভৌগোলিক চৌহদ্দিকে ভেঙেছেন এবং উপন্যাসকে বিস্তৃত পটভূমির উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তাঁর সামাজিক উপন্যাসে ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করতে চান নি। অধিকন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কাহিনীর পরিণতি দেখানোর জন্য কুন্দনন্দিনীর ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগ এবং রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করতে হয়েছে, হয়তো রেলওয়ে ব্যবস্থার বিস্তৃতির অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই সব নায়িকাকে কাশীতে পুনর্বাসন দিতে পারেন নি, কিংবা জীবনাদর্শের প্রশ্নে বিচারকের দণ্ডনীতি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে, অথবা কেউ কেউ যেমন মনে করেছন, বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি[২৮] থেকে এরা বঞ্চিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রথমাবধি বিধবাদের প্রতি অন্য মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 'করুণা'র বিধবা মোহিনীর জন্য কাশীবাসের ব্যবস্থাপত্র রচনা করেন, চোখের বালির বিনোদিনীর জন্যও তা-ই। শরৎচন্দ্রও তাঁর বিধবা নায়িকাদের প্রয়োজনমতো কাশী পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মৃত্যুই জীবনের সমাপন নয়।

বস্তুতঃ বাংলা উপন্যাসের ধারায় করুণা অভিনব সংযোজনা এবং করুণা রবীন্দ্র উপন্যাসভাবনার আকর-গ্রন্থ। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে-পথ ধরে উপন্যাস-লোকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই পথ ধরেই তার উপন্যাস পূর্ণতা লাভ করে। মাঝখানের দুটি ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি রবীন্দ্র-উপন্যাস ধারায় অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে। কিন্তু করুণা সম্পর্কে শেষ কথা এখনো বলা হয় নি। করুণা রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের সৃষ্টি নয়। নয় নভেল রচনার সচেতন শিল্প প্রয়াস। বিষয়গত পরিমিতি বোধের অভাবে করুণার গল্পের পথ চলা হয়েছে ভারাক্রান্ত। 'আমি' নামক একটি ক্ষুদ্র চরিত্রের উপস্থিতির ফলেই প্লটসৃষ্টিতে বৈঠকি ঢংএর অনুকৃতি ঘটেছে। কিন্তু এই 'আমিই' পরবর্তীকালে চতুরঙ্গ উপন্যাসে একটি চারিত্রিক বিশেষত্ব অর্জন করে।

২৮. **Majumdar, B. B. Heroines of Tagore, 1968. p. 207.**

বস্তুতঃ এছাড়া শিল্পশৈলীগত কোনো রচনাচাতুর্য করুণায় প্রকাশ পায়নি, যা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো ঢিলে-ঢালা বিবৃতিমূলক গল্পসাহিত্যের অনুবর্তন।

বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি

আমরা প্রথমেই বলেছি বঙ্কিম-প্রতিভার পরিণত পর্বেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। করুণা বউঠাকুরানীর হাট রাজর্ষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই প্রকাশ পায়। বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাস নামে অভিহিত হলেও যথার্থ নভেল কি না, বিচার্য। রাজর্ষি ছোটদের পত্রিকা বালক-এর জন্য রচিত হয়। করুণার আলোচনায় নভেল-এর টেকনিকগত বিশেষত্ব সমূহ বিবেচিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় শিল্পশৈলীর বিচারে করুণার পর চোখের বালির আলোচনা প্রাধান্য পেলেও বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি একেবারে ফেলনা রচনা নয়। এই দুই রচনায় নভেলের শিল্পশৈলীগত নৈপুণ্য তেমন প্রকাশ না পেলেও[২৯] এবং গল্পের বিষয়বিন্যাস সহজ সরল প্রবাহের মতো হলেও এদুটি রচনায় কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা অলভ্য নয়।
রচনাদুটি মধ্যযুগীয় বাঙলার ঐতিহাসিক কাহিনী ভিত্তিক হলেও রবীন্দ্রনাথ কাহিনী বয়নে রাজসত্তার পরিচয় দানের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে মানবিক সত্তা ও সম্বন্ধ বিশ্লেষণে জোর দিয়েছেন। বউঠাকুরানীর হাটে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, যুবরাজ উদয়াদিত্য ও রানী সুরমার কথা এবং বিশেষত বসন্তরায়ের কথা বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীর বিশেষত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বউঠাকুরানীর হাটের সূচনায় লিখেছেন: "প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তার প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউঠাকুরানীর হাট গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপার, সেও অল্পবয়সেরই খেলা।" কাহিনী আখ্যান নাটকে চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব আদর্শবাদী বা ভাবমূলক চরিত্রসৃজনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বসন্তরায় ও উদয়াদিত্য এই ভাবধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কৈশোরের শ্রীকণ্ঠ সিংহের সজীব স্মৃতি বসন্তরায় চরিত্র সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে। এই চরিত্র সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সৃষ্টি। বসন্তরায়ের

২৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/১৯৫৬/১২৩ পৃঃ।

এই চারিত্রিক বিশেষত্ব ছাড়া অন্যান্য "চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি।"

রাজর্ষি গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে লাভ করেন এবং এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশিয়ে রাজর্ষি গল্প রচিত হয় এবং বালকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর রাজর্ষির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গল্পের থীম সম্পর্কে লিখছেন: "আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার চাপে পরিমিত হতে পায় না। ব্যঞ্জনের সংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হলো।" অর্থাৎ মূল থীমটি শেষ পর্যন্ত পল্লবায়িত হয়েছে এবং পরিমিতি রক্ষা পায় নি। "বস্তুতঃ উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে"। এ রবীন্দ্রনাথেরই মূল্যায়ন। তবে কি সর্বমোট পয়তাল্লিশটি পরিচ্ছেদের বাকি তিরিশটির কোন স্বার্থকতা নেই? নামকরণের দিক থেকেই কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় সমূহের সার্থকতা আছে।[৩০] বস্তুতঃ রাজর্ষিতে রাজসত্তার অন্তরালবর্তী মানুষটির কথাই বলা হয়েছে এবং গোবিন্দমাণিক্যের রাজমহিমা অপেক্ষা মানবিক পরিচয়ই সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রথম পনেরো পরিচ্ছেদে গোবিন্দমাণিক্যের রাজসত্তার পরিচয়ের পাশাপাশি মানবিক পরিচয় প্রকাশ পেলেও গোবিন্দমাণিক্যের ঋষিসত্তাই পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে প্রাধান্য পেয়েছে। এখানেই রাজর্ষি নামকরণের সার্থকতা অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভাবকল্পনা এই পর্যায়ের অন্যতম চরিত্র বিল্বন ঠাকুরের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাটকের ঠাকুর্দা জাতীয় চরিত্রের উৎস এই বিল্বন-চরিত্র।[৩১] এই জাতীয় চরিত্রসৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রভাবনা-সঞ্জাত। ইতিহাসের বিষয়বস্তু আহরণে ও ব্যবহারে এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্থক্য।

চোখের বালি

করুণার (১৮৭৭) প্রায় পঁচিশ বৎসর পর চোখের বালি (১৯০১) প্রকাশ পায়। গল্পের জন্য ঘটনার প্রাধান্য পরিহারপূর্বক মানব-মানবীর অন্তর্জীবন-নির্ভর আখ্যান রচনা রবীন্দ্র-উপন্যাসের অন্যতম শিল্প বিশেষত্ব। করুণার পর বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিতে এই মনোভঙ্গির সূচনা এবং চোখের বালিতে

৩০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ/১৩৭৩ বঃ/১১৭ পৃঃ।
৩১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/রবীন্দ্র জীবনী—১ম খণ্ড/১৩৬৭ বঃ/১২৮ পৃঃ।

এসে এর রূপপরিণতি ঘটেছে। চোখের বালির শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব নির্দেশে অগ্রসর হলে দেখা যায়—

ক. বাংলা কথাসাহিত্যে প্লটের সংহতি প্রথম চোখের বালি উপন্যাসে দেখা দিল। চোখের বালির পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের বিন্যাস ফুলের মালার মতো ঘটনা পরম্পরার বিবরণ নয়, বরং একটি বহুদল ফুলের দল বিন্যাসের মতো। প্রত্যেকটি ফুলদলের মতো চোখের বালির প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই মূল বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, এক একটির বিচ্যুতি মানেই গল্পের অঙ্গহানির সম্ভাবনা। অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিচ্ছেদ রচনা ঘটনার বিবরণী হয়ে উঠেনি, কারণ চোখের বালি হৃদয়রহস্যমূলক—নরনারীর হৃদয় সম্পর্কিত জটিলতার রহস্যভেদ ও বিশ্লেষণই প্রধান বিষয়, অধিকন্তু এই উপন্যাসে ঘটনা হলো চরিত্রোৎসারিত। ফলে পরিচ্ছেদ বিন্যাসে ঘটনার পারম্পর্য গুরুত্বলাভ করে নি। তাই আলোচ্য উপন্যাসের প্লটভাবনা চিরন্তন গল্প বলার পথে অগ্রসর না হয়ে, পাঠকমনের 'কী' ও 'কী ভাবে'—এই প্রশ্নের উত্তর দানের ঐকান্তিকতায় পথ চলেছে। চোখের বালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"—তখন তাঁর দাবীকে যথার্থ বলেই মনে হয়।

খ. চোখের বালির শিল্পশৈলীর অনন্যতা থীমগত ঐক্যসাধনে। নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত চিরন্তন সমস্যা চোখের বালি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনা রূপে প্রকাশ পেয়েছে। নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত সমকালীন রবীন্দ্র-ভাবনার পরিচয় আছে প্রাচীন সাহিত্যের 'কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে। নরনারীর মনের কারখানা ঘরের কথাই উপন্যাসের নরনারীর কামজ ও প্রেমজ সম্পর্কের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। মহেন্দ্র-বিহারী-আশা—এই বন্ধুত্বের ত্রিভুজটিকে ভিত্তি করে বিনোদিনীর উপস্থিতিতে মুখ্য ও গৌণ কামজ ও প্রেমজ ত্রিভুজগুলি জন্ম লাভ করে। মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী, মহেন্দ্র বিহারী-বিনোদিনী এই দুটি প্রধান ত্রিভুজ এবং বিহারী-আশা-বিনোদিনী একটি অপ্রধান ত্রিভুজ—এই তিন ত্রিভুজই মহেন্দ্র-আশা বিহারী প্রাথমিক ত্রিভুজটিকে আশ্রয় করে একই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এরা কেউই পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছে না। বস্তুতঃ চোখের বালি উপন্যাসে থীমের উদ্ভব ও বিকাশ বিনোদিনী নামক বালবিধবাটির উপস্থিতি ও সক্রিয় ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। আর সেইজন্যই উপন্যাসের আরম্ভেই বিনোদিনী চরিত্রের উল্লেখ ও অবতারণা। অবশ্য

চোখের বালি উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকেই স্পষ্টত আলোচ্য থীমের প্রকাশ ঘটে। বিনোদিনীর সুপ্ত প্রেমবোধের উন্মেষই ছিল এর কারণ এবং পরবর্তী স্তরে বিনোদিনীর এই প্রেমভাবনার বিকাশকে কেন্দ্র করে মহেন্দ্র, বিহারী ও আশা আবর্তিত ও চালিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিনোদিনীর কাশীতে স্বেচ্ছা নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই চোখের বালি উপন্যাসেরও সমাপ্তি।

বালবিধবা বিনোদিনী মহেন্দ্রের সংসারে গৃহদাহের কারণ হতে পারে এবং তৈরি হতে পারে নতুন বিষবৃক্ষ তা দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ-এর উল্লেখ থেকেই সুন্দর ভাবে প্রতীত হয়েছে। প্রথম ও প্রধান ত্রিভুজটির উদ্ভব এই পর্যায়ে। "ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনি-আপনি যে একখানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে" তা এই তিনের আগোচর থেকে গেলেও বিহারীর অগোচর থাকে নি। বিহারীর মধ্যকার প্রেমকাতর মন তখন বলে উঠল "আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান করিয়া লইতে হইবে।" মহেন্দ্র বিনোদিনী-আশার মাঝখানে বিহারীর এই সচেতন উপস্থিতি দ্বন্দ্বের নতুন ক্ষেত্র বিস্তার করে। এখানেই ষোড়শ অধ্যায়ের সূচনা। এবারে কেন্দ্রবিন্দু বিনোদিনী, প্রতিদ্বন্দ্বী মহেন্দ্র ও বিহারী, প্রেমজ সম্পর্কের এই দ্বিতীয় প্রধান ত্রিভুজটি সপ্তদশ অধ্যায়ে চড়ুইভাতিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। দ্বন্দ্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রের গৃহলোকে দূরাবস্থানে বিহারীকে কেন্দ্র করে আশা ও বিনোদিনীর দ্বন্দ্ব অপ্রধান ত্রিভুজটি রচনা করে। বস্তুতঃ এখানেই সংহত প্লটবয়নের বিশেষত্ব। বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনায় পূর্বাহ্ণে অখণ্ডভাবে বিন্যস্ত না হলে এরূপ নিটোল গল্প রচনা সম্ভব নয়[৩২]।

গ. চরিত্রসৃষ্টি: ঘটনার বিস্তার নয়, বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও তাদের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকাশ চোখের বালির প্লটভাবনার আন্তর বিশেষত্ব। 'আঁতের কথা' বলাই 'চোখের বালি'র মুখ্য বৈশিষ্ট্য। 'করুণা'র আলোচনায় আমরা বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—ক) হৃদয় রহস্যমূলক, (খ) ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। আঁতের কথা যতটা ব্যক্তি-চরিত্র সাপেক্ষ, ততটা ঘটনা-নির্ভর নয়। চোখের বালিতে মহেন্দ্র-বিহারী-আশা-বিনোদিনীর জীবনবৃত্ত রূপায়িত হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের অন্তর্জীবনের কথা। চোখের বালির মূল সমস্যা এই চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের গভীরে নিহিত। ফলে ঘটনা চরিত্রের অধীন হয়ে পড়েছে। চোখের বালির চরিত্রসমূহের গতিশীলতা ও সজীবতাই সর্বাধিক লক্ষণীয়, কোনো

৩২. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)/১৩৭৬ বঃ/৩৭১ পৃঃ।

চরিত্রকেই ছাঁচে ফেলা বা প্রতিনিধিত্বমূলক বলা চলে না. নভেল-এর বিবর্তিত (round) চরিত্র বলতে যা বুঝি বাংলা সাহিত্যে চোখের বালিতেই তার স্বচ্ছন্দ প্রাচুর্য। এই চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ কোনো আলঙ্কারিক প্রথানুগত্য স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উপস্থাপনায় বঙ্কিমী প্লটভাবনার পরিবর্তে চরিত্র সৃজনের উপর প্রাধান্য দেন. চোখের বালিতে এই রাবীন্দ্রিক বিশেষত্ব স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়ে। এই চরিত্রসৃজনে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা, বিশেষত উপমার ব্যবহার সার্থক হয়েছে। কোনো চরিত্রই কোনো একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে চরিত্র শুধু চলৎ শক্তি লাভ করে নি, বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে চরিত্রগুলি বিবর্তনকে আত্মস্থ করে পরিণতি লাভ করেছে।

বিনোদিনী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেও চোখের বালি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলো বিহারী। এই চরিত্রটি কোনো এক সময়ে 'ষ্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো' [রাজলক্ষ্মীর মতে : দ্রষ্টব্য ২য় পরিচ্ছেদ] হলেও মনে উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অঘটনঘটনের মূলে কাজ করেছে, অথচ সকলের মধ্যে থেকেও বিহারী কোথাও বদ্ধ থাকে নি। বিহারীর মধ্যে জীবন সম্পর্কিত আদর্শবাদ সর্বদা সক্রিয় ছিল। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিহারী চরিত্র বলিষ্ঠ মনোভঙ্গির পরিচয় দিতে পারে নি। বিহারী একটু চাপা প্রকৃতির। বিনোদিনী সর্বাধিক ব্যক্তিত্বোজ্জ্বল চরিত্র এবং তারই নামে এই উপন্যাসের নামকরণ। নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই নারীই পুরুষের উদ্দেশ্যে বলতে পেরেছে : "এত ঔদাসীন্য কিসের! আমি কি জড় পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুণির (আশার ডাকনাম চুণি) সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।" এর পর বলার অবকাশ থাকে না এই নারী কোন প্রকৃতির। যৌবন রাগে দীপ্ত এই বালবিধবা তার সতৃষ্ণ জীবনবোধ নিয়েই মহেন্দ্র-আশা-বিহারী বৃত্তটির মধ্যে প্রবেশ করেছে। এবং মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সে ঘোষণা করতে পেরেছে : "সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার"—কিন্তু এই মহেন্দ্রকেও সে বিমুখ করেছে ; কারণ মহেন্দ্র 'ভীরু কাপুরুষ', সে না জানে ভালবাসতে, না জানে কর্তব্য করতে, তার কোনো কিছু করবার সাধ্য নেই। এই মহেন্দ্র চরিত্রটিতে শরৎচন্দ্রের সুরেশেরই পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। একদিন এই মহেন্দ্রকে ত্যাগ করে বিনোদিনী তাই বিহারীর উদ্দেশ্যে অভিসার করেছে।

এবং বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করে বলতে পেরেছে : "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালো-বাসো। .... মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।" এখানেই বিনোদিনী চরিত্রের গতিশীলতা।

বস্তুতঃ বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর ছায়া এবং শরৎচন্দ্রের অচলার পূর্ববর্তিনী। বিনোদিনী উনবিংশ শতাব্দীর নায়িকাদের মধ্যে অনন্যা এবং পরবর্তী কালেরও অগ্রগণ্যা। অধিকন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিনোদিনী চরিত্রের গুরুত্ব অসীম। রবীন্দ্রনাথ নারী চরিত্র রূপায়ণে দুই নারী-তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন—একটি নারীর কল্যাণী রূপ, অপরটি নারীর প্রেয়সী রূপ। বিনোদিনী চরিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ নারীর এই দুই সত্তাকেই রূপ দিয়েছেন : মহেন্দ্র ও বিহারীকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বিনোদিনীর প্রেয়সী ও কল্যাণী সত্তা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. পত্র : উপন্যাসের প্লটরচনায় ও ব্যক্তিচরিত্রের মনোবিশ্লেষণে চিঠির সহায়তা বঙ্কিমচন্দ্রও গ্রহণ করেছিলেন। চোখের বালি উপন্যাসে পত্র অন্তর্জীবনের বাণীবহ রূপেই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। পত্রকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য উপন্যাসের থীমের বীজ উপ্ত হয় [সপ্তম পরিচ্ছেদ]। এই বীজই পরবর্তী কালে মহীরুহে পরিণত হয়। অধিকন্তু পত্রগুলিই ঘটনাপ্রবাহে নতুন নতুন আবর্ত ও জটিলতা সৃষ্টি করেছে। লক্ষণীয় যে বিহারীর উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রের লেখা চিঠিকে কেন্দ্র করেই মহেন্দ্র-আশা-বিহারী—এই বৃত্তের মধ্যে বিনোদিনীর প্রবেশ। মহেন্দ্রের চিঠি পড়েই বিনোদিনীর মনে জেগেছিল : "মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ..." ইত্যাদি সুতীব্র কৌতূহল। এই কৌতূহলের পরিণতিতে বিনোদিনী চোখের বালিতে অনন্যা নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছে।

একটি বাদে আর সব পত্রই বিনোদিনীর রচনা, আশার বেনামীতে মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পত্র বিনোদিনীরই রচিত। এই পত্রগুলির মাধ্যমেই মহেন্দ্রের মনে বিনোদিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিনোদিনীর তৃষিত ও অতৃপ্ত মনের বাসনা ও কৌতূহলেরও প্রকাশ ঘটে। এই বেনামী পত্রগুলির মধ্যে দুটি সত্তার প্রকাশ : এক. স্ত্রী-সত্তা—মহেন্দ্রের নিকট আশার পত্রপ্রেরণ, যদিও বিনোদিনীর রচনা। দুই. প্রেয়সী সত্তা—আশার অন্তরালে বিনোদিনীর আত্মপ্রকাশ ভাবা-বেগপূর্ণ পত্রগুলিতে বিনোদিনীর তৃষিত মনের কথা আশার বেনামীতে প্রকাশ পেয়েছে এবং পরে পত্রপ্রাপক মহেন্দ্রের তা অজানা থাকে নি। অন্যান্য

থাকে নি বিনোদিনীর মনের খবর। আশার মধ্য দিয়ে সে বিনোদিনীকে পেয়েছে। এই পর্যায়ে পর পর তিনটি পত্র রচিত হয়েছে।

বিহারীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রগুলি বিনোদিনীর স্বনামেই রচিত এবং এই পর্যায়ের প্রথম পত্রটি (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ)-কে কেন্দ্র করেই বিহারী-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মধ্যে নতুন আবর্ত তৈরি হয়েছে। বিনোদিনীর পত্র পড়ে মহেন্দ্রের মনে জেগেছে নতুন জিজ্ঞাসা : 'বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে।' অন্যায়-ভাবে মহেন্দ্রের এই পত্রপাঠে বিনোদিনীর নারী সত্তা অপমানিত বোধ করে এবং তাঁর সংহার-মূর্তি প্রকাশ পায়। তার চারদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালানই বিনোদিনীর ব্রত হলো। এরপর মহেন্দ্র আশাকে কাশী পাঠিয়ে দেয় এবং আশার অনুপস্থিতিতে মহেন্দ্র ও বিনোদিনী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়।

বিনোদিনীর স্বনামে মহেন্দ্রের নিকট লেখা পত্রটি (ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ) চোখের বালির ঘটনা প্রবাহের তুঙ্গমুহূর্ত। মহেন্দ্রের অসদাচরণের প্রতিবাদে বিনোদিনী এই পত্র রচনা করে এবং মহেন্দ্রের সঙ্গে তার সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারণ মহেন্দ্র কেবল নিজেকে ভালবাসে। বিনোদিনী তখন লিখছে : "ভালবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি।" অধিকন্তু "নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।" আর এরপরই বিহারীর কাছে বিনোদিনীর আশ্রয় ও প্রণয় প্রার্থনা এবং নতুন করে ত্রিভুজ সৃষ্টি—মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী, এবারের কেন্দ্রবিন্দু বিনোদিনী। কিন্তু বিহারীর তখনো নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত মনোভাব দেখছি। বিনোদিনীর প্রতি তার যথার্থ মনোভাব সে নিজেই তখনও জানে না। বিনোদিনীর পরবর্তী পত্র (অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ) বিহারীর উদ্দেশ্যে নির্মোহ মন নিয়ে লেখা আর এই পত্রে পূর্ববর্তী পত্রের বিপরীত ভাবনা এবং বিনোদিনীর একটি সশ্রদ্ধ ও দ্বন্দ্বমুক্ত মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

বস্তুতঃ এই পত্রগুলি বিনোদিনীর অন্তর্লোকের দ্বার উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে। বিনোদিনীর প্রেয়সী ও কল্যাণী সত্তা পত্রের প্রাপক ও বিষয়ভেদে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চোখের বালি রচনা করেন, চোখের বালির শিল্পশৈলীতে এই পত্রগুলি সেই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বিভিন্ন চরিত্রের অন্তরঙ্গ সত্য উদ্ঘাটনে চিঠিগুলি সার্চলাইটের মতো কাজ করেছে। এই আলোতে কখনো বিনোদিনী নিজে, কখনো মহেন্দ্র বা বিহারী উদ্ভাসিত।

৬ শিল্পশৈলীর বিচারে অন্যতম দিক হলো নামকরণ। নায়িকা বিনোদিনীর প্রস্তাবিত 'চোখের বালি' নামেই [আশার আগ্রহে বিনোদিনী আশার সঙ্গে চোখের বালি পাতিয়েছিল : দশম পরিচ্ছেদ] লেখক উপন্যাসটিকে চিহ্নিত করেছেন। এই নামকরণ যথার্থই শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত। আশার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধকে চোখের বালি নামে বিনোদিনী যে চিহ্নিত করেছিল, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আশা ও মহেন্দ্রের মাঝে বিজয়িনী বেশে বিনোদিনীর উজ্জ্বল আবির্ভাব আশার শান্ত ও সুখী জীবনযাপনে কণ্টক স্বরূপ। এই নামকরণের মধ্যে মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যজীবনে তার নিজের ভূমিকার স্বরূপটাই ফুটে উঠেছে। এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নিজের ব্যর্থ জীবন যৌবনের বেদনার্ত হাহাকার। অবশ্য, আশার দায়িত্ব থাক কিংবা না থাক তাকেও বিনোদিনী নিজের পক্ষে চোখের বালি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি।

বিনোদিনী যখন তার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন নিয়ে প্রথম উপস্থিত হলো তখন আশা অগ্রসর হয়ে তার পরিচয় গ্রহণে পর্যন্ত সাহস করে নি। বস্তুতঃ সংসারের সঙ্গে আশার সম্বন্ধ যখন স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ হয়ে আসছিল, তখনই (দশম পরিচ্ছেদ) বিনোদিনী তার সমগ্র নারীসত্তা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আশার জীবনের চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আশা-মহেন্দ্র-বিহারী বৃত্তটিতে বিনোদিনীর সক্রিয় উপস্থিতির পরেই চোখের বালিতে নভেলের প্রত্যাশিত থীম সৃষ্টি হলো। এখানেই উপন্যাসের চোখের বালি নামকরণের সার্থকতা।

বস্তুতঃ নভেলে আমরা স্পষ্টতর জগৎকে চাই, সেই জগৎ অবশ্যই আমাদের পরিচয় ও উপলব্ধির অন্তর্গত হবে। আর যেটা চাই সেটা হলো মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় এবং নভেলে এই অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয়ই অধিকতর কাম্য। চোখের বালি এই পরিচয়ের অধিকারী। লক্ষণীয় যে চোখের বালিতেই প্রথম সামগ্রিকভাবে অন্তর্বাস্তবতা অবিচ্ছেদ্য মাত্রারূপে যুক্ত হলো। জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় দানের জন্যই চোখের বালিতে ঘটনার প্রাধান্য হ্রাস পায়। আর সমস্যাসমূহ চরিত্রের ব্যক্তিত্বে নিহিত থাকায় গল্পটি চরিত্র-প্রধান হয়ে ওঠে। প্রতিনিধিত্ব মূলক চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চরিত্র সৃষ্টিই নভেলের বিশেষত্ব এবং এই সূত্রেই বাংলা নভেল রচনার ধারায় চোখের বালির স্বাতন্ত্র্য।

৭. নভেল-এর উদ্ভব-তত্ত্ব ও প্রথম বাংলা নভেল

সপ্তম অধ্যায় আমাদের গবেষণা নিবন্ধের সর্বশেষ অধ্যায়। পাশ্চাত্যে নভেল-এর উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। বাংলা নভেল-এর উদ্ভব সম্পর্কে সেরূপ কোনো তত্ত্ব প্রযোজ্য কি না তা বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমভাগে আলোচিত হলো। দ্বিতীয় ভাগে প্রথম বাংলা নভেল কোন্‌টি সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

—নভেল-এর উদ্ভব-তত্ত্ব—

আলোচ্য পর্যায়ে আমরা নভেলের তিনটি উদ্ভব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা নভেলের উদ্ভবে কোন্ তত্ত্বটি গ্রহণীয় হতে পারে তা বিচার করেছি।

ঐতিহ্যবাদী তত্ত্ব

মানুষের সঙ্গে নভেল-এর একটা জায়গায় বড়ো মিল আছে—সেটি হলো এদের উদ্ভব প্রক্রিয়া। "মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে।" ('বলাই'-রবীন্দ্রনাথ) প্রসঙ্গত স্মরণীয়, নভেলের আবির্ভাবও অনেক পরবর্তী স্তরে। বিশেষত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বিভিন্ন শিল্পশৈলীর পরীক্ষার-নিরীক্ষার পরিণতিতে 'নভেল' রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও নভেল-এর উদ্ভব সূত্রটিকে কোনো কোনো বিদগ্ধ সমালোচক এই পথেই অন্বেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

প্রথমেই আমরা অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করছি। বাংলায় নভেল তথা উপন্যাসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও সমস্ত ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর ও আদি লক্ষণগুলি আবিষ্কার করা যায়।"[১] এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই সংস্কৃত গল্প-সাহিত্য, বৌদ্ধজাতক, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি অনাধুনিক সাহিত্যে তিনি উপন্যাসের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন।

'বাস্তব ফ্রেমে আঁটা' বৌদ্ধজাতক সম্পর্কে তিনি স্পষ্টতই আক্ষেপের সুরে বলেছেন: "পরবর্তী যুগে যদি এই গল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিত, বাস্তবের সহিত নিবিড় স্পর্শের বাধা না ঘটিত, তবে বোধ হয় আমরাই সর্বপ্রথমে উপন্যাস-আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিতে পারিতাম; এবং তাহা

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/১৯৫৬/ ২ পৃঃ।

হইলে বোধ হয় উপন্যাসকে ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে, বিদেশীয়-ভাব-বিকৃত হইয়া, খিড়কি দরজা দিয়া আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইত না।"[২] প্রসঙ্গত মঙ্গলকাব্যের অন্যতম মুখ্য কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সম্বন্ধেও তাঁর আক্ষেপ[৩] লক্ষণীয়। ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পর্কেও বিদগ্ধ সমালোচক দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন[৪] "বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যই উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।" পল্লীসাহিত্যের এই বিশিষ্টতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেন, "ভারতচন্দ্রের বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ প্রভাব যদি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না করিত, তবে সম্ভবত: বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিন আরও অগ্রবর্তী হইত।" এই সব অভিমতই তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামের সুপরিচিত গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে। অন্যত্রও তিনি একই মনোভাব পোষণ করেছেন[৫]। 'বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থেও তিনি একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।[৬] বস্তুত এরূপ অন্বেষার পশ্চাতে গভীর ঐতিহ্যপ্রীতিই কাজ করেছে।

আরো অনেকের মধ্যেও এই ঐতিহ্যপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার আলোচনা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একজন ঔপন্যাসিকও যখন একই মনোভাব ব্যক্ত করেন,[৭] তখন প্রচলিত এই সিদ্ধান্তটি অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই। এঁদের মতে নভেল জাতীয় রচনার নিদর্শন আমাদের অনাধুনিক সাহিত্যে ছিল এবং আধুনিক কালে এসে তার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। নভেল-এর উদ্ভব সম্পর্কে এঁরা কমবেশি ঐতিহ্যবাদী তত্ত্বে [Traditional Theory] বিশ্বাসী—অতীতের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য রূপটিকে তাঁরা অনুভব করতে চান। কিন্তু বাংলা নভেল তথা উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনায় এ জাতীয় ঐতিহ্যপ্রীতি কতখানি অনিবার্য, তা বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক উৎস নির্দেশ সম্ভবপর—

এক. জাতীয়তাবাদী মনোভাব : কিছু একটা আমাদের ছিল না—এই বোধটাই গ্লানিকর। বিরাট ভারতবর্ষ, বিরাট তার অতীত, তার সাহিত্যের ঐতিহ্য। কোথায় পাবো তারে? তারই সন্ধানে এঁরা অতীতে রচিত বাস্তবধর্মী গল্প-সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন।

২—৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/যথাক্রমে ৮, ৯, ১৩ পৃঃ।
৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা/১৩৫৩ বঃ/১৩৫ পৃঃ।
৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বাংলা উপন্যাস/১৩৫৪ বঃ/২ পৃঃ।
৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/বিশেষ বই—রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই পৌষ,১৩৭৯ বঃ/খ পৃঃ।

দুই. ইতিহাসের পারম্পর্যরক্ষা : ইতিহাস নদীর মতো প্রবহমান এবং কোনো মহৎ সৃষ্টি অতীত বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং বাংলা নভেলেরও অতীত থাকতে হবে। এই বিশ্বাস থেকেই হয়তো এ-হেন অতীতচারণ। বৌদ্ধজাতক, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি রচনার কথা মনে রেখেই আলোচ্য অতীতপ্রীতিকে বর্তমানের সঙ্গে এই বলে যুক্ত করা হয়েছে : "অন্তত এইগুলিই আমাদের উপন্যাস-রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন, বাস্তবতার দিকে এইটুকু প্রবণতা লইয়াই আমরা ইংরেজী উপন্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"[৮]

এখন ভেবে দেখতে হবে, এই ঐতিহ্যপ্রীতি বাংলা উপন্যাসের (নভেল অর্থে) উদ্ভবে কতখানি গ্রহণীয়। কেন না শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলেছেন : "ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে সব নূতন ধরণের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোনো বস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না।"[৯] বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে এটি যথার্থ সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরাও একমত। বস্তুত, উপন্যাসের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচকের প্রায়-পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মন্তব্যের মূলে তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতিই কাজ করেছে। বাংলা নভেলের উদ্ভব সম্পর্কে আমাদের ধারণা—

এক. খিড়কি দরজা দিয়ে নয়, সিংহদরজা দিয়েই 'নভেল' বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। দুই. 'নভেল' রচনার অন্যতম শর্ত 'প্রয়োজনীয় গদ্যসৃষ্টি', কিন্তু মধ্যযুগে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তিন. যে-বিশিষ্ট জীবনবোধ ও জীবন-সম্পর্কিত ব্যাপক জিজ্ঞাসা 'নভেল' রচনার অন্যতম কারণ, মধ্যযুগে তা সুলভ ছিল না। চার. বাস্তবধর্মী গল্পরচনাই নভেল সম্পর্কে শেষ কথা নয়, তাছাড়া প্রাগাধুনিক সাহিত্যে বাস্তবতার পরিমাণ যেখানে যতটাই থাক না কেন, তাও সর্বাংশে অলৌকিকতা ও ঔপদেশিকতা মুক্ত ছিল কি না সন্দেহ। যেমন বৌদ্ধজাতকে বাস্তবতা ও অলৌকিকতা একাকার হয়ে গিয়েছিল, এবং রচনাসমূহের মূল সুরটাই ছিল ঔপদেশিক।[১০]

৮ ও ৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/১৯৫৬/যথাক্রমে ১৫ ও ৯ পৃঃ।
১০. Humayun Kabir. The Bengali Novel. 1968. p. 2.

বস্তুতঃ অতীতের হাত ধরে নভেল বাংলা সাহিত্যে আসে নি। ইংরেজি সাহিত্য পাঠে মুগ্ধ বাঙালি লেখক ইংরেজি নভেল-এর অনুসরণে বাংলায় নভেল রচনায় ব্রতী হন। এবং নভেল-রচনা বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলো। লক্ষণীয় যে আমাদের সাহিত্যে আধুনিক বিষয়গুলি একই সঙ্গে কোনো ক্রম রক্ষা না করেই এসেছে। বাংলায় এই নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীর বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।

বাংলা উপন্যাসের ধারাকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করবার জন্য অনেকেই বঙ্কিম-পূর্বকালের আখ্যানধর্মী রচনা সমূহের উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলায় নভেল রচনার প্রয়াস সার্থক হয় নি।

মহাকাব্য তত্ত্ব

সাহিত্যের ক্রমবিকাশ মানলে বলতে হয় যে, কোনো পরিণত সাহিত্যাদর্শই অতীত সম্পর্ক-ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। বিশেষত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নভেল বিশেষজ্ঞগণও মনে করেন যে, নভেল মহাকাব্য চেতনার আধুনিক সাহিত্যরূপ। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় নভেলের উদ্ভব[১১] সম্পর্কে এই সূত্রেই দেখা দিয়েছে মহাকাব্য তত্ত্ব (The Epic Theory of Novel)। বাংলা নভেলের উদ্ভব ও বিকাশে এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য কি না বিচার্য।

গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্লটের বিশালত্বের দিক থেকে নভেল-এর সঙ্গে মহাকাব্যের নৈকট্য আছে। ফলে আকারে নভেল মহাকাব্যের কাছাকাছি যেতে পারে। নভেল জাতীয় রচনার বিষয়প্রকৃতির বিচারে স্বীকার করতেই হবে যে নির্বিশেষ সাধারণ মানুষের কথা বলাই হলো নভেলের লক্ষ্য। বিশেষ কোনো শ্রেণী চরিত্র নভেলের উপজীব্য নয়। পক্ষান্তরে বিষয়ের ব্যপকতা ও গৌরব-সমুন্নতি, ভাবগম্ভীর আবহ ও বীররস সৃষ্টি মহাকাব্যের লক্ষণীয় বিষয়। সমগ্র দেশ, জাতি ও যুগ মহাকাব্যের অপরিহার্য বিষয়।

বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে মহাকাব্যোচিত বিশালতার অবকাশ কোথায়? তা ছাড়া, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অতীতের বাঙালিকে কেন্দ্র করে কোনো মহাকাব্য রচিত হয় নি। বরং যে-কৃত্রিম মহাকাব্য রচনার প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দেয়, তারও মূলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেরই প্রেরণা কাজ করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে মহাকাব্যের প্রেরণা ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সের মধ্যে

১১. **Watt, Ian. The Rise of Novel. 1964. p. 239.**

অনুসন্ধানযোগ্য। প্রমথনাথ বিশীও মনে করেন, "প্রাচীন মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রাজসিংহকেই তজ্জাতীয় রচনা বলা যায়।"[১২]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব নেই বললেই চলে। অধিকন্তু ১৮০১ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত রচিত গল্পসাহিত্য পর্যায়েও[১৩] রামায়ণ-মহাভারত প্রধান কোনো বিষয় হয়ে ওঠে নি। বরং শতাব্দীর মধ্যাহ্নে জাতীয় ভাবনার উন্মেষপর্বে বাংলা কাব্যে ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের প্রভাব গভীর ভাবে অনুভূত হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শ ও ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য বিকাশ লাভ করে। এই পর্যায়েই কৃত্রিম মহাকাব্য রচনার প্রচেষ্টা চলে। লক্ষণীয় যে, বাংলায় মৌলিক গল্পসাহিত্যের ধারা আখ্যায়িকা কাব্যধারার উদ্ভবের পূর্বেই বিকাশ লাভ করে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি অবলম্বনে কাব্যের পাশাপাশি গদ্যে মহৎ কোনো রসসাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ দেখা দিল না।

আখ্যায়িকা কাব্য ও উপন্যাস—উভয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গল্পরস পরিবেশন। কিন্তু এদের শিল্পশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। অনাধুনিক ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে রোমান্স রচনার প্রয়াস ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রথম দেখা দেয় এবং এই ধারা বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণতা লাভ করে। স্কট প্রমুখ ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও ভূদেবের রচনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। ভূদেবের সামনেও কোনো মহাকাব্যিক প্রেরণা ও আদর্শ ছিল না। একদিকে পাঠকের অভাবে আখ্যায়িকা কাব্য প্রবাহ শীর্ণ হয়ে আসে, অন্যদিকে ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যায়িকা কাব্যের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই বাংলায় ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স জাতীয় রচনাসমূহ পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু বাংলা নভেল-এর সূচনায় খাঁটি বা কৃত্রিম কোনো মহাকাব্যেরই প্রেরণা ছিল বলে মনে করি না।

মধ্যবিত্ত তত্ত্ব

সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা যে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যজিজ্ঞাসুরাও সমাজবিজ্ঞানীদের এই

১২. প্রমথনাথ বিশী/বঙ্কিম সরনী/১৩৭৩ বং/৩৪৩ পৃঃ।
১৩. Long, J. Descriptive Catalogue of Bengali works-এর Tales শীর্ষক অংশটি।

অভিমতকে[১৪] সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। এঁদের মতে নভেল জাতীয় রচনার উদ্ভব ও বিকাশ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও জীবনবোধের প্রসার সাপেক্ষ।[১৫] লক্ষণীয় যে, রাজা, রাজতন্ত্র বা ব্যক্তিবিশেষ এই জাতীয় রচনার পৃষ্ঠপোষক নয়।

বাংলায় নভেল-এর উদ্ভবে অনুরূপ কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করছে কি না, তা বিচার করে দেখতে হবে। প্রথমত বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেই নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। লক্ষণীয় যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য (নভেল যার প্রধান একটি শাখা)—উভয়ের অগ্রগতি প্রায় সমান্তরাল ঘটনা। আর এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ইংরেজি-জানা ব্যক্তিরাই প্রথম বাংলা সাহিত্যের চর্চায় এগিয়ে আসেন। আর, একালেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম রূপে গদ্যভাষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে বাঙালির জীবনবোধে গোষ্ঠীচেতনার স্থলে ব্যক্তিচেতনা প্রকাশ পায়। এই ব্যক্তিমানুষের উদ্ভাসনে সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হলো এবং সাহিত্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রাধান্য লাভ করায় সমকাল সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে। এ সবকিছুই নতুন জীবনভাবনা ও অনেকাংশে শ্রেণী-সচেতনতার পরিচয়বহ। লক্ষণীয় যে, সৃজ্যমান বাংলা নভেলের নরনারীর অধিকাংশই ছিল জমিতে বাঁধা। এই পর্যায়ে স্বর্ণলতা-ফুলজানি-যুগান্তর-সমাজ-সংসার প্রভৃতি রচনার কথা মনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত একালের খ্যাত-অখ্যাত সকল গল্পলেখকই সাহিত্যসেবাকে একমাত্র জীবিকা রূপে গ্রহণ করেন নি। ভবানীচরণ-বিদ্যাসাগর-প্যারীচাঁদ-দীনবন্ধু-এঁরা প্রত্যেকেই চাকুরে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পদস্থ সরকারী চাকুরে ছিলেন, তারকনাথ ছিলেন চিকিৎসক, শিবনাথও শিক্ষক ছিলেন। বস্তুত জীবিকার দিক থেকে এঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। কর্মসূত্রে নতুন মানুষ ও জনপদের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘটে, ফলে এঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার ঘটে। এ ছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনবোধের প্রভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নতুন কালের প্রতিনিধি হয়ে

১৪. **Sorokin, Pitirim A. Social and Cultural Dynamics. Vol I (Fluctuation of Forms of Art). 1937. p. 643.**

১৫. **Humayun Kabir. op. cit. p. 5.**

ওঠে এবং সর্বপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই বৃহত্তর জীবনই কল্পনাসম্পৃক্ত হয়ে কথাসাহিত্যের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে এবং রোমান্স ধারার পাশাপাশি নভেল রচনার ভাবভূমি গঠিত হয়।

অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও তাদের জীবনবোধ বাংলা নভেলের উদ্ভব ও বিকাশে অনেক বেশি সহায়ক ছিল। কিন্তু তাই বলে আমরা বাংলা নভেলের উদ্ভবের তত্ত্বরূপে মধ্যবিত্ত তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি না। কেননা, প্যারীচাঁদ নভেল রচনায় ব্রতী হয়েও নভেলের শিল্পরূপটি আয়ত্ত করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক বাঙালি জীবন অবলম্বনে ইংরেজিতে 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' রচনা করলেও পরে দুর্গেশনন্দিনী নামক রোমান্স রচনা করেই কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তাঁর রচনাবলীতে নভেল-এর চেয়ে রোমান্স জাতীয় রচনার সংখ্যাই বেশি। রমেশচন্দ্রের প্রথম চারিটি রচনাই রোমান্স, পরের দুটি রচনা সমাজ ও সংসার সামাজিক হিতসাধনের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নভেল হিসেবে সার্থক কি না বিচার্য। রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী রচনায় উৎসাহবোধ করেছিলেন।

অধিকন্তু, তখনো সাহিত্যরসজ্ঞ ও শিল্পসচেতন পাঠকসম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। বরং সৃজ্যমান পাঠকসম্প্রদায়ের গল্প-শোনার সনাতন অভাবটি পূরণের জন্যই লেখকরা ঘটনাপ্রধান ও রোমাঞ্চকর গল্প বিশেষত রোমান্স জাতীয় রচনায় অধিক উৎসাহবোধ করেন। এই জাতীয় রচনা লিখে দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বস্তুত প্রাক্ চোখের বালি কথাসাহিত্যে যথার্থ নভেল জাতীয় রচনা সংখ্যায় কম।

কার্যত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাংলা কথাসাহিত্যের গতিধারাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নি। সমাজের নিয়ামক শক্তিরূপে এরা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। অধিকন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে, যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের অভাবে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নি এবং এদের উদ্ভব ও বিকাশ নগর প্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর ফলে তখনো এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে স্বকীয় সামাজিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে নি আর পারে নি বাঙালি জীবনে বড়ো রকমের ভাব-বিপ্লব সংঘটন করতে। ফলে নভেল রচনার উপযোগী সামাজিক বাতাবরণ তখনো পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে ওঠে নি। তাই এক দিকে বাংলায় নভেল-এর বিকাশ বিলম্বিত হয়েছে, অন্যদিকে নভেল-এর

কথাবস্তুতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনাগোনাও সীমিত থাকল, যেটুকু ঘটল তাও ভৌমব্যবস্থার অন্তরালে।

লক্ষণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রেরণা লাভ করেই আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। বাংলায় নভেল পাশ্চাত্ত্য নভেল জাতীয় শিল্পরীতির প্রয়োগ পরীক্ষার ফলশ্রুতি। পাশ্চাত্ত্য নভেল-এর অনুসরণে একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি (art form) রূপে বাংলায় নভেল-এর উদ্ভব ঘটে। বস্তুত সৃজ্যমান মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনবোধ এই অনুকরণস্পৃহার বিরোধী ছিল না।

—প্রথম বাংলা নভেল—

বাংলা নভেলের উৎস সন্ধানে বহির্গত হয়ে অবশেষে আমরা 'প্রথম বাংলা নভেল'-এর সন্ধানে অগ্রসর হচ্ছি। 'প্রথম বাংলা নভেল' সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা অনুধাবন করেছি, কিন্তু সবকিছুই যে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পেরেছি, তা নয়, অধিকন্তু নভেল-এর শিল্পস্বরূপ-নির্ণয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্বসূরীগণের অভিমতাদির পুনর্বিচারের প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছে। 'নভেল' হলো লেখকের অভিজ্ঞতা নির্ভর সামাজিক নরনারীর জীবনের শিল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস, কিন্তু সেই বিন্যাস নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনকে বাদ দিয়ে নয় বরং তাকেই প্রাধান্য দিয়ে। এই সূত্রানুসারে কোন্ গ্রন্থটিকে প্রথম বাংলা নভেল বলা যায়, বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ক. নববাবুবিলাস

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কলকাতার বাবুসমাজের পটভূমিতেই নববাবুবিলাস (১৮২৫) রচনা করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে গল্প রচিত হতে পারে ভবানীচরণ তার পথপ্রদর্শক।

লেখক কর্তৃক নববাবুগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের অভিপ্রায়টি এই আখ্যানের মধ্যে বিশেষ ভাবে বিধৃত। অধিকন্তু বাবুসমাজের বিলাসী-জীবনের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। চারিখণ্ডে রচিত নববাবুবিলাসের অঙ্কুরখণ্ডে বাবুর বাল্যকাল এবং বিদ্যা অর্জনের কথা বলা হয়েছে, পল্লবখণ্ডে বাবুর অসৎ সঙ্গের কথা বলা হয়েছে, কুসুম খণ্ডে বাবুর নববাবু নামধারণ এবং বিলাসী জীবনযাপনের বৃত্তান্ত এবং ফল তথা শেষ খণ্ডে বাবুর স্ত্রীর বিরহযন্ত্রণা ও বাবুর করুণ পরিণতির কথা বিধৃত হয়েছে।

সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে নববাবুবিলাস—

ক. The Friend of India (Oct, 1825, p. 289. Calcutta) নববাবুবিলাসকে highly satirical বলে অভিহিত করেছেন। খ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নববাবুবিলাস গ্রন্থে 'ইয়ং বেঙ্গল ওল্ড বেঙ্গলের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত' হয়েছে[১৬]। গ. J. Long-ও নববাবুবিলাসকে একটি সার্থক Satire বলে অভিহিত করেছেন[১৭]।

তবে কি নববাবুবিলাসকে নভেল-এর মর্যাদা দেওয়া যায়? এটি অবশ্যই নববাবুবিলাস-এর শিল্পশৈলীগত প্রশ্ন—

প্রথমত নববাবুবিলাসের বিষয়বস্তু চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত এবং কোনো এক নববাবুর জীবনধারা ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত। এটি যে একটি যান্ত্রিক শিল্পভাবনা তার প্রমাণ ভবানীচরণের পরবর্তী রচনা নববিবিবিলাস-এর শিল্পশৈলী।

দ্বিতীয়ত বাস্তব ও স্বাভাবিক বিচারে নরনারীর দাম্পত্যজীবন এখানে গড়েই উঠছে না, যদিও তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তাই বাবু ও বাবুর স্ত্রীর অন্তর্জীবন ভাবনার পরিস্ফুটন এই বৃত্তান্তের অঙ্গীভূত বিষয় নয়।

তৃতীয়ত ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস এখানে নেই। ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র-স্ফুরণ নয়, বাবুসমাজের প্রতিবেশ রচনাই লেখকের লক্ষ্য ছিল, এই নববাবু তোতারাম দত্তের পুত্র না হয়ে অন্য কারো পুত্র হলেও ক্ষতি ছিল না। লেখক সংস্কারকের মনোভাব নিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। ফলে নববাবুটি বাবুসমাজের প্রতিনিধি চরিত্র হয়ে উঠেছে।

চতুর্থত নববাবুবিলাস বড়ো আকারের কোনো রচনা নয়, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তাছাড়া সংস্কৃতানুসারী উপমা কণ্টকিত ও হোঁচট খাওয়া ভাষায় রচিত বলে বৃত্তান্তের গল্পরস অবাধগতি নয়।

বস্তুত নববাবুবিলাস একটি বাস্তব সমাজ-প্রতিবেশ রচনা ভিন্ন যথার্থ কোনো প্লট রচনার প্রয়াস নয়। এই সব কারণেই নববাবুবিলাস প্রথম বাংলা নভেল-এর গৌরব দাবি করতে পারে না। একটি সাধারণ ঘটনাপ্রধান বর্ণনাত্মক রচনারূপেই নববাবুবিলাসকে গণ্য করতে হবে। তিনি সাংবাদিক কৌতূহল ভিন্ন অন্য কোনো আধুনিক শিল্প-প্রেরণার দ্বারা চালিত হন নি।

১৬. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়/বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ/১৮৫২/৪৭ পৃঃ।

১৭. Long, J. op. cit. দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে পুনর্মুদ্রিত, ১৩৫৬বঃ, ৪৫৩ পৃঃ।

আমাদের এই প্রসঙ্গের অবতারণার কারণ এই যে কেউ কেউ 'নববাবুবিলাস'কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরব দান করতে চেয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'নভেল' অর্থে 'উপন্যাস' শব্দটি নববাবুবিলাস এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন কী না নিশ্চয় করে বলা যায় না। তিনি বলেছেন: "নববাবুবিলাস প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবি করে।"[১৮] এ সম্পর্কে তাঁর আর একটি মন্তব্য আছে: "প্রথম বাংলা উপন্যাস নববাবুবিলাস কোনো পাশ্চাত্ত্য-গ্রন্থের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী নয়।"[১৯] আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেন: নববাবুবিলাস-এ "প্রকৃত বাংলা উপন্যসের সূচনা হইয়াছে।"[২০] কিন্তু আমাদের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে নববাবুবিলাস 'নভেল' জাতীয় রচনার মর্যাদা দাবি করতে পারে না। এখন, 'নভেল' অর্থে যদি 'উপন্যাস' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই আপত্তি আছে। কারণ নববাবুবিলাস 'নভেল' নয়, 'নভেল'-এর দৃষ্টিকোণ থেকেও রচিত নয়। বস্তুত জীবনরস স্পন্দিত আখ্যান-রচনা ভবানীচরণের লক্ষ্য ছিল না। সাংবাদিকের মতো নিরাসক্ত মনোভাব নিয়ে তিনি নববাবুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন ঘটনা পরিবেশন করেছেন। রচনাটি তথ্যসংগ্রহ ও ধারাবাহিকতার দিক থেকে কোনো এক নববাবুর জীবনী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই গ্রন্থপ্রসঙ্গে গল্প অর্থে যদি 'উপন্যাস' শব্দটি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

তা হলে সামগ্রিক ভাবে সৃজ্যমান বাংলা গল্পসাহিত্যের ধারায় 'নববাবুবিলাস' -এর বিশেষত্ব কোথায়? প্রথমত রচনাটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত, তাই নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়বহ। দ্বিতীয়ত রচনাটির বিষয়গত ঐক্য লক্ষণীয়। তৃতীয়ত ব্যঙ্গাত্মক রচনার ধারা-প্রবর্তনে এবং চতুর্থত বাবুসাহিত্যের গঙ্গোত্রী হিসেবে গ্রন্থটির ভূমিকা স্মরণীয়।

খ. ফুলমনি ও করুণার বিবরণ

হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) গ্রন্থটিকে অবলুপ্তির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে একালে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করবার পরে শ্রীসবিতা দাস 'দেশ' পত্রিকা (৫ জুলাই, ১৯৬৩/১০৩৪ পৃঃ)-য় চিঠি লিখে গ্রন্থটি সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন।

১৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/১৯৫৬/১৭ পৃঃ।
১৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বাংলা উপন্যাস/১৩৫৪ বঃ/২ পৃঃ।
২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য/বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)/১৩৭১ বঃ/২১১ পৃঃ।

The Oriental Baptist পত্রিকার তথ্য উদ্ধার করে তিনি বলেন যে The Week নামক একটি ইংরেজি গল্পগ্রন্থের ছায়ায় ম্যলেন্স মিশনারি জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি নভেল পদবাচ্য কী না—এই বিতর্কে প্রবেশের পূর্বে রচনাটির সাধারণ পরিচয় বিধৃত হলো :

ক. গ্রন্থের আখ্যাপত্রে (Title Page) রচনাটি সম্পর্কে ইংরেজিতে বলা বলা হয়েছে : The History/of/Phulmani and Karuna ; /A Book for Native Christian Women. এবং বাংলায় বলা হয়েছে : ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত। খ. এ দেশীয় খ্রীষ্টধর্মান্তরিতদের পরিবর্তিত জীবনবোধ-বর্ণনার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত হয়। এ কথা গ্রন্থের Preface থেকেই জানা যায়। অধিকন্তু গ্রন্থের শেষভাগে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে লেখিকা খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেও তৎপর ছিলেন। গ. লেখিকা অবশ্য Preface-এ রচনাটিকে একটি little story বলেই অভিহিত করেছেন।

এখন, গ্রন্থটি সম্পর্কে সমকালীন মনোভাব গৃহীত হলো :

ক. J. Long-এর মনে গল্পচ্ছলে খ্রীষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্ণনার উদ্দেশ্যেই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচিত হয়।[২১]

খ. গ্রন্থটির প্রকাশনসংস্থার মতে[২২] রচনাটি একটি বহুপঠিত খ্রীষ্টবিষয়ক গ্রন্থ।

গ. প্রসঙ্গত লেখিকার ভগিনীর মন্তব্যও অনুধাবনীয়,[২৩] অখ্রীষ্টীয়দের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব প্রচারের উদ্দেশ্যটি গল্পের আকারে বিবৃত।

বস্তুত গ্রন্থ হিসেবে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। লেখিকা ম্যলেন্স খ্রীষ্টযাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের বাসনা নিয়েই আখ্যানটি রচনা করেন। লক্ষণীয় যে, লেখিকা কখনো রচনাটির পক্ষে 'নভেল' জাতীয় রচনার গৌরব দাবি করেন নি।

কিন্তু কেউ কেউ আলোচ্য রচনাটিকে প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা দানে উৎসুক—তন্মধ্যে চিত্তরঞ্জনবন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য : 'ফুলমণি ও করুণা' "এখন থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।"[২৪]

২১. Long. J. op. cit. ৪১৭ পৃঃ
২২. The Twenty-third Report of the Calcutta Christian Tract and Book Society. p. 14-15.
২৩. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৬৫ বঃ) ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—Brief Memorials of Mrs. Mullens. p. 7-8.
২৪. তদেব, ভূমিকা— ।/. পৃঃ।

আশুতোষ ভট্টাচার্যও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন : "ইহাকেই (অর্থাৎ ফুলমণি করুণার বিবরণ-কেই) বাংলার প্রথম উপন্যাস রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"২৫

এখন, এই গ্রন্থটিকেই প্রথম বাংলা উপন্যাস (নভেল অর্থে) রূপে চিহ্নিত করা যায় কী না, সে কথা ভেবে দেখার যোগ্য। কেন না সমসাময়িক জীবনের বিষয় মাত্রই নভেল নয়, বিষয়টিকে নভেল-এর নিজস্ব মণ্ডনশৈলীতে ভূষিত হতে হবে। ফুলমণি ও করুণার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় যে—

এক. বিশেষ কোনো মানবিক সমস্যা এই বিবরণ-এর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে নি। করুণার খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণই আলোচ্য বিবরণ-এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ধর্মমাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য ফুলমণি ও করুণার দুই ভিন্নধর্মী জীবনধারা এই আখ্যানে সমান্তরাল ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ অধ্যায়ে সুন্দরী-চন্দ্রকান্তের বিবাহ-বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়ায় আখ্যানের বিষয়গত ঐক্য ও সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এছাড়া রচনার যত্রতত্র বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দান রচনাটিকে প্রকাশ্যে প্রচারধর্মী করে তুলেছে এবং গল্পরসের স্বচ্ছতা নষ্ট করেছে।

দুই. ডায়েরির আঙ্গিকে আলোচ্য আখ্যানের বিষয় বিন্যস্ত হওয়ায় এবং প্রথমাবধি বিষয়বর্ণনে লেখিকার সোচ্চার উপস্থিতি থাকায় গল্পরসের প্রবহমানতা নষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু লেখিকা সকল ঘটনা ও বিষয়াদির যোগসূত্ররচনাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। পাঠকবর্গের নিকট লেখিকা এই আখ্যানের অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্র বলে মনে হতে পারে।

তিন. নরনারীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পরিস্ফুটন নভেল-এর প্রাণ, কেননা এর দ্বারা সহজেই নরনারীর হৃদয়রহস্য উদঘাটিত হয়। কিন্তু এই আখ্যানের গৌণ অংশ সুন্দরী-চন্দ্রকান্তের পরিণয়ের মধ্যে এই প্রণয় ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ আভাষিত, এবং তা-ও মূল ধারার বাইরে থাকায় সমগ্র বিষয়বিন্যাসে কোনোরূপ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি।

চার. প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখিকা চরিত্রসমূহের চলন-বলন নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার স্বার্থে চরিত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে। ফুলমণি, করুণা, রাণী, সুন্দরী, মধু, চন্দ্রকান্ত প্রমুখ কোনো কেন্দ্রীয় ভাবনার অধীন নয়।

২৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য/পূর্বোক্ত গ্রন্থ/২১৪ পৃঃ।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'নভেল' নয়। আমাদেরও রচনাটিকে একটি গল্প বলতে দ্বিধা নেই। এটি একটি নীতিমূলক গল্প, J. Long-ও রচনাটিকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থপঞ্জীতে Ethics and Moral Tales এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। গ্রন্থটির আলোচনায় তিনি fiction শব্দটি ব্যবহার করলেও তা অবশ্যই গল্প অর্থে, নভেল জাতীয় রচনা অর্থে নয়। নববাবু বিলাস-এর মতো ফুলমণি ও করুণার বিবরণও একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মপ্রসার। সুতরাং, অহেতুক একটি রচনাকে নভেল-এর গৌরব দান করে প্রথম পর্যায়ের বাংলা উপন্যাসের জগতে আবর্ত সৃষ্টির যৌক্তিকতা দেখি না।

লক্ষণীয় বিষয় যে, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর 'পরিচিতি'তে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও রচনাটিকে কখনো 'নভেল' বা উপন্যাস' বলে চিহ্নিত করেন নি বরং তিনি রচনাটিকে 'উপাখ্যান' বলেই চিহ্নিত করেছেন।[২৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলমণি ও করুণা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন[২৭] : "ধর্ম প্রচারৈষণার জন্য কাহিনীটি উপন্যাসের কোঠায় উঠতে পারে নি।"

তবে কী বাংলা সাহিত্যে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর কোনো গুরুত্ব নেই? ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর গুরুত্বও ভাষাগত অভিনবত্বের জন্য, গ্রন্থটি সরল সাধুভাষায় রচিত। কিন্তু সৃজ্যমান বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এর অবদান ছিল সীমাবদ্ধ। কেননা দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজের মধ্যেই রচনাটির প্রচলন ছিল, "সাধারণ বঙ্গভাষী সমাজের জন্য ইহার কোন বাণী বা আবেদন ছিল না।"[২৮]

গ. আলালের ঘরের দুলাল

প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনাম 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন। রচনাটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে 'মাসিক পত্রিকা'য়, পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। রচনাটি 'নভেল' পদবাচ্য কী না—এই আলোচনার সুবিধার্থে রচনাটির সাধারণ পরিচয় পূর্বেই বিধৃত হলো :

এক. 'আলালের ঘরের দুলাল'-র Preface-এ লেখক লিখছেন : আলালের

২৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়/পরিচিতি—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৩৬৫বঃ/।/ পৃঃ।
২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা/প্যারীচাঁদ রচনাবলী/১৯৭১/(২১) পৃঃ।
২৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়/পূর্ববৎ/।৵. পৃঃ।

ঘরের দুলাল | By | Tek Chand Thakoor | "The above original Novel in Bengali being the first work of the kind,..." লেখক বাংলায় মৌলিক 'নভেল' রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের দাবি রেখেছেন।

দুই. রচনাটির বাংলা 'ভূমিকা'য় লেখক সাধারণ ভাবে লিখছেন : "এই প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই,......।" লেখক এই অংশে রচনার প্রকরণগত অভিনবত্বও দাবি করেছেন।

•তিন. নীতিশিক্ষাদান ও সমসাময়িক জীবন চিত্রণই এই গল্পের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। একথা Preface থেকে জানা যায়।

সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে আলালের ঘরের দুলাল :

এক. Bengali Literature প্রবন্ধে (১৮৭১) বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেন : "His (Peary Chand Mitra's) best work is the Alaler Gharer Dulal, which may be the first novel in the Bengali language.[২৯]"

তিন. শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন : "আলালের ঘরের দুলাল একখানি উপন্যাস। কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার প্রণীত 'বিজয় বসন্ত' ও টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস।"[৩০]

বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে 'আলাল' উপন্যাস তথা 'নভেল' রূপেই পরিগণিত হয়েছে। এখন এই স্বীকৃতি নভেল-এর বিষয়ভাবনা ও শিল্পশৈলীর বিচারে কতখানি গ্রাহ্য তা খতিয়ে দেখতে হবে :

এক. সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে রচিত হলেও রচনাটির বিষয়বস্তু মৌলিক নয়, বরং রচনাটি বাবুর উপাখ্যান ও নববাবুবিলাস-এর সার্থক পরিণতি। এই রচনার আদর্শ নববাবুবিলাস, সমসাময়িক কলকাতার নববাবুদের জীবনযাত্রার চিত্র রচনাই লেখকের লক্ষ্য ছিল।

দুই. রচনাটির বিষয়গত ঐক্য নীতির প্রশ্নে ও ঘটনাবাহুল্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মতিলালের পিতা বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ, তাঁর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধাদির বিস্তৃত আলোচনা গল্পের পক্ষে খুব আবশ্যক ছিল না। মতিলালের জীবন কথাই বর্ণনীয়, কিন্তু রচনার মূল উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষাদান হওয়ায় বরদাপ্রসাদবাবু ও রামলালের বহুল উপস্থিতিতে গল্পরস বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

২৯. Bankim Rachanavali (English). Sahitya Samsad. 1969. p. 110.
৩০. শিবনাথ শাস্ত্রী/রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/১৩৬৪বঃ/১৩১ পৃঃ।

তিন. জীবনবোধের জারক রসে জারিত না হওয়ায় রচনার বিষয়বস্তু সমসাময়িক হয়েও জীবনরসসমৃদ্ধ হতে পারে নি। এখানে জীবনের রূপায়ণ অবশ্যই বহিরঙ্গনির্ভর, অন্তর্জীবনের কোনো পরিচয় নেই, কিন্তু এই পরিচয় দানই নভেল-এর শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব।

চার. ব্যক্তিচরিত্র স্ফুটনের সহায়ক ও নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের দ্বন্দ্ববেদনার উৎস প্রেম এই রচনায় উপেক্ষিত। কিন্তু 'প্রেম' নভেল-এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত থাকবে। পক্ষান্তরে এই রচনায় বাবুসমাজের নারী বিলাসিতার অঙ্গরূপে লাম্পট্য-বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

পাঁচ. এই আখ্যানের উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঠকচাচা, সে ভবানীচরণের 'কুমন্ত্রী খলিফা'র উত্তর পুরুষ। জীবনকে তলিয়ে দেখার বিশেষত্বে 'আলাল'-এর অন্য কোনো চরিত্র এমন জীবন্ত ও বাস্তব নয়, এই চরিত্রের বড়ো বৈশিষ্ট্য যে সে action-এর স্রষ্টা, সে action-এর অধীন নয়। মতিলাল প্রধান চরিত্র হলেও আখ্যানের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ঠকচাচারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রচনার উৎপত্তি-বিকাশ পরিণতিতে মতিলাল বর্তমান থাকলেও বিকাশ ও পরিণতি পর্বে সে ঠকচাচারই অধীন। এছাড়া রামলাল ও বরদাপ্রসাদবাবু ও স্ব-ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল নয়, অনেকটা Illustrative চরিত্র। ঠকচাচী ও অনেকাংশে জীবন্ত। বস্তুত ঠকচাচা ও চাচী ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত বা জটিলতা কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন: "the knaves are life-like and full of character, the good characters are too much of mere abstractions.[৩১]"

ছয়. "আলাল" সংহত বিষয়বিন্যাসের পরিচায়ক নয়। গ্রন্থটি তিরিশটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত ও গ্রন্থারম্ভে নির্ঘণ্টে রচনার বিষয়সমূহ সূত্রাকারে বিবৃত এবং পরিচ্ছেদোক্ত বিষয় কতকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিষয়ের গ্রন্থনা ঢিলে ঢালা, অন্তরঙ্গে সম্বন্ধে গ্রথিত নয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং গল্পরস জমাট বাঁধে নি।

সাত. কল্পনাশক্তি ও গভীর জীবনবোধের অভাবে গল্পটি সামগ্রিক ভাবে সঞ্জীবিত হয় নি এবং বিষয়ের বর্ণনাভাগে কোনো রম্যভাব প্রকাশ পায় নি। বিষয় সমূহে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

আট. গল্পের উপসংহারটি বলিষ্ঠ নয়, রূপকথাধর্মী। গ্রন্থের শেষবাক্য 'আমারা

৩১. পূর্ববর্তী ২৯ সংখ্যকের অনুরূপ, p-111.

কথাটি ফুরাল, নটেগাছটি মুড়াল' 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' বা 'ঠাকুরদার ঝুলি'কেই মনে করিয়ে দেয়। নভেল-এর নিজস্ব শিল্প বিশেষত্ব সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্র যে সচেতন ছিলেন না, গল্প শেষ করার ধরণটি তারই প্রমাণ।

এরপর কি আলালের ঘরের দুলালকে 'নভেল' বলা সম্ভব? তিনি আগ্রহ ভরে বাংলায় 'নভেল' রচনায় প্রয়াসী হলেও নভেল জাতীয় শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব আয়ত্ব করার শক্তি না থাকায় তাঁর রচনা 'নভেল' হয়ে উঠতে পারে নি। 'আলাল'কে 'নভেল'-এর মর্যাদা দিলে, নভেল-এর শিল্পসত্তাই খণ্ডিত হবে।"[৩২]

তবে কী বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে আলালের ঘরের দুলাল-এর কোনো দান নেই? অবশ্যই আছে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নই শিরোধার্য: "যে-ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।"[৩৩]

'আলাল'কে উপন্যাসরূপে মেনে নিতে এ-কালের সমালোচকগণও দ্বিধান্বিত— সুশীলকুমার দে বলেছেন: "It sketches a Rake's Progress by means of the story of a rich man's spoilt son named Matilal and his ultimate reform"[৩৪] নভেল বা ফিকশন কোনো মন্তব্যই এই রচনাটি সম্পর্কে তিনি করেন নি।

সুকুমার সেনও মনে করেন "যদিচ কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতই তবু কয়েকটি কারণে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না।"[৩৫]

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন: "আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি গ্রন্থকে নভেল বলা যায় না, কারণ সেখানে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাও নাই, সমাজচিত্র ও চরিত্র-অঙ্কনই উদ্দেশ্য।"[৩৬]

এরপর আলালের ঘরের দুলালকে 'নভেল' বলা সমীচীন মনে করি না। কিন্তু বাংলা নভেল রচনার ক্ষেত্রে আলাল-এর কী কোনো মূল্যই নেই? মূল্য আছে, এবং সেটি হলো সূর্যোদয়ের আগে ঊষা মুহূর্তের মতো। অর্থাৎ আলাল 'নভেল'

৩২. Humayun Kabir. of. cit. p. 9.
৩৩. বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড)/সাহিত্য সংসদ/১৩৭১বং/৮৬৩ পৃঃ।
৩৪. De, S. K. Bengali Literature in the 19th Century. 1962. p. 604.
৩৫. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/১৩৭০বং/১৮৬ পৃঃ।
৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)/১৩৭৭ বং/১৫৩ পৃঃ।

না হলেও নভেল রচনার প্রয়াস এবং তা সৃজ্যমান কথাসাহিত্যের ধারায় নভেল ভাবনাকে সূচিত করে।[৩৭]

খ. চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান

রেভা. লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' অরুণোদয় পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৫৭), গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯-এ। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান-এর ভূমিকা কী তা বিচার্য।

স্বরচিত গ্রন্থ সম্পর্কে লালবিহারীদে-র মনোভাব প্রথমে উপস্থাপিত হলো—

এক. রচনার আখ্যাপত্রে আছে : চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান। Chandramukhee,/A Tale of Bengali Life.

দুই. লেখক সম্ভবত রচনাটিকে উপন্যাস-রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, কেন না রচনার শেষ অধ্যায়ে প্রধান চরিত্র হেমচন্দ্র-এর পরিচয় প্রদান কালে বলা হয়েছে : "এই উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্র পাঠদশা উত্তীর্ণ হইয়া......।"

লক্ষণীয় যে, স্ব-কালের সাহিত্যরসিক মহলে চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান বিশেষ কোনো কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে নি। এখন, কথামূলক রচনা না নভেল—কোন্ অর্থে উপন্যাস শব্দটি লেখক ব্যবহার করেছেন তা বিচার্য। কেননা পরবর্তী কালে রচিত Govinda Samanta নামক ইংরেজি রচনার প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক নভেল-এর বিষয়ভাবনা সম্পর্কে যেমন নির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান-এর ভিতরে বাইরে লেখক তেমন কোনো মন্তব্য করেন নি।

লক্ষণীয় যে, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর মতো চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানও নীতি শিক্ষাদান ও খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, রচনাটির আখ্যাপত্র থেকেই এই সংবাদ পাওয়া যায়। রচনাটির চতুর্দ্দশ অধ্যায় থেকে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি এদেশীয়দের মনকে আকৃষ্ট করবার জন্য বাইবেল-এর অংশবিশেষ সংস্কৃত শ্লোকাকারে বিন্যস্ত করে তার বাংলা রূপও পরিবেশন করা হয়েছে। উপাখ্যান-এর নায়ক হেমচন্দ্রের ভ্রাতা নবকুমারের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণেও লেখকের অভিপ্রায় স্পষ্ট।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান সম্পর্কে সম্প্রতি দাবি করা হয়েছে : "চন্দ্রমুখার উপাখ্যান বইটি Govinda Samanta গ্রন্থ রচয়িতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দের রচিত

৩৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/পূর্ববৎ/(২৩) পৃঃ।

মৌলিক বাংলা উপন্যাস।"[৩৮] এ সম্পর্কে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। অর্থাৎ রচনাটিকে নভেল অর্থে উপন্যাস বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ,

এক. বিষয়ের উপস্থাপনা সহজ সরল এবং ধারাবাহিক। চন্দ্রমুখী সম্পর্কে লেখক বিভিন্ন সংবাদ ও একের পর এক জুড়ে দিয়েছেন, অনেকটা রেলগাড়ীর বগী জুড়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু নভেল-এর বিষয়বিন্যাস কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত।

দুই. এই গল্পে কোনো সমস্যা নেই। জীবনের বহিরঙ্গই এই গ্রন্থে প্রশ্রয় পেয়েছে, অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় এখানে অপরিস্ফুট থেকে গেছে। ফলত, লেখক চন্দ্রমুখী, হেমচন্দ্র ও অন্যান্যদের অন্তর্জীবনের সমস্যা সমূহের রূপায়ণে অগ্রসর হন নি। ম্যলেন্স-এর মতো লালবিহারীও খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং চন্দ্রমুখীর জীবন কথা বর্ণনচ্ছলে এই মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কৌশলটি নভেল রচনার প্রধান অন্তরায়।

তিন. বিষয়গত অনৈক্য চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান-এর বড়ো ত্রুটি। গ্রন্থটির প্রথম পর্যায়ে চন্দ্রমুখীর জীবনের কথা প্রাধান্য পেলেও মোট পাঁচটি অধ্যায়ে হেমচন্দ্রের জীবনধারাকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টধর্ম মাহাত্ম্য প্রচারই লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই শেষোক্ত প্রসঙ্গটি উপনদীর মতো মূল গল্পরসের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে 'উপাখ্যান'-এর আঠারোটি অধ্যায় পরস্পর অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত হতে পারে নি। নভেল কেন, যে-কোনো কথামূলক রচনার ক্ষেত্রেই এই বিষয়বস্তুগত অনৈক্য ক্ষতিকর।

চার. লেখকের প্রচারধর্মিতার জন্য চন্দ্রমুখী মুখ্য নারী চরিত্র হয়েও প্রাধান্য পায় নি। হেমচন্দ্র ও নবকুমার অনেকাংশে পুতুল-চরিত্র। প্রচারের উদ্দেশ্যেই গল্পের শেষাংশে নবকুমার চরিত্রটির আকস্মিক অবতারণা। এই চরিত্রটি রচনাকালে খুব সম্ভবত আলালের ঘরের দুলাল-এর কথা লেখকের মনে ছিল, আলালের মতিলাল ও রামলাল-এর অনুরূপ হেমচন্দ্র ও নবকুমার সমান্তরাল চরিত্রসৃষ্টি। হেমচন্দ্রের পরিণতি মতিলালের দুঃখজনক পরিণতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চরিত্রসমূহ বস্তুত দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে।

পাঁচ. এছাড়া নভেল-এ অপেক্ষিত নরনারীর প্রণয়াদি আলোচ্য আখ্যানে নেই। ফলে আখ্যানটি কোনো দিক থেকেই রসসমৃদ্ধ হতে পারে নি।

সুতরাং চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান নভেল-এর গৌরব দাবি করতে পারে না। রচনাটি সাধারণ ভাবেও একটি সার্থক কথামূলক রচনা হয়ে উঠতে পারে নি। সুব-

৩৮. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রেভা. লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান/১৯৬৮/ভ পৃঃ।

সাময়িক বাংলাদেশের বর্ণনায় এবং তন্নিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দানে লালবিহারী সেকালের লেখকগণের মধ্যে অগ্রণী। কিন্তু কল্পনাশক্তির অভাবে রচনাটি স্পন্দিত হতে পারে নি। অনেক সময়েই অধ্যায়সমূহ সংবাদপত্রসুলভ তথ্য-চারণায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রথম তেরোটি অধ্যায়ে সাধারণ বাঙালি নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনচিত্রনের প্রয়াস থাকায় চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয় ও ভাবনাচ্যুতির ফলে এবং সামগ্রিকভাবে কোনো শিল্পরূপ গড়ে না ওঠায় গ্রন্থটিকে উপন্যাসের মর্যাদা দান করা যায় না। নিটোল গল্প সৃষ্টিতেও লেখক কৃতকার্য হন নি। গ্রন্থটির সম্পাদিত সংস্করণের 'অধিবাচন'-এ ডক্টর সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন : "চন্দ্রমুখী উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়। চন্দ্রমুখী বিগত শতাব্দীর বাংলা দেশের এক অঞ্চলের ক্ষণদীপ্ত চিত্রমালিকা।[৩১]

চ. বঙ্কিমচন্দ্রের Rajmhan's Wife ও রাজমোহনের স্ত্রী

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনের সুরু এবং কর্মজীবনের সূত্রেই তাঁর সাহিত্যসাধনার ব্যাপক প্রস্তুতি সাধিত হয়। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে। ঘর থেকে বাইরে যখন কর্মোদ্দেশ্যে যাত্রা তখনই উভয়ের সৃষ্টির চমৎকারিত্ব প্রকাশ পায়। যখন বঙ্কিমচন্দ্র নগর বাংলা থেকে দূরে বাঙলা দেশের দক্ষিণ ভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকার্যে নিযুক্ত, তখনই বাঙালি ও বাংলাভাষাকে নিজের হাতে উপহার দিচ্ছেন সাহিত্যের রমণীয় সোনার ফসল উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথও জমিদারীর কার্যোপলক্ষে নগর কলকাতা থেকে দূরে পদ্মার কূলে কূলে স্বজন নির্জনের সঙ্গমে অবস্থান কালে বাংলা সাহিত্যকে একে একে সোনার তরীতে বোঝাই করে উপহার পাঠাচ্ছেন অচিন্তিতপূর্ব সৃষ্টি সোনার তরী(১৮৯৩)-চিত্রা(১৮৯৬)-চৈতালী(১৮৯৬)র সোনার ফসল, আর স্নিগ্ধ কোমল করুণ উজ্জ্বল ছোটগল্পগুলি। পদ্মার গীতিমুখর অনিন্দ্য পরিবেশে লিরিকের মতোই ছোটগল্পের সম্ভাবনাময় সোনালী জগতে তখন তিনি বিচরণ করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও বাঙালার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের কর্মমুখর গদ্যময় বিরাট জীবনের পটভূমিতে উপন্যাস রচনা সম্ভব হলো। সরকারী কার্যোপলক্ষে বাঙলা দেশের যশোহর-খুলনা অঞ্চলের নীলকরদের অত্যাচার ও কর্ণওয়ালিশের বরপুত্র জমিদারবর্গের কার্যাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্ অঞ্চলের জমিদার-

৩১. সুকুমার সেন/অধিবাচন— পূর্বোক্ত গ্রন্থ/৮ পৃষ্ঠা।

তন্ত্রের পটভূমিতে Rajmohan's Wife ও 'রাজমোহনের স্ত্রী' রচিত হয়।
দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশ লাভের পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর পূর্বেই Rajmohan's Wife-র নামে তাঁর একটি ইংরাজি রচনা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Indian Field পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রই এই ইংরেজি রচনাটি প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না। "আমরা ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র।" বঙ্গদর্শন-এর পত্রসূচনায় (১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা লিখেছেন। ইংরেজিতে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেও বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের সাহিত্য সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সঠিক পাঠ গ্রহণ করতে খুব বেশি ভুল করেন নি। অধিকন্তু ইংরেজি রচনাটির সঠিক রচনাকালও আমাদের জানা নেই। অবশ্য মেনে নিতে বাধা নেই যে আলোচ্য ইংরেজি রচনাটি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কোনো এক সময় রচিত হয়েছিল। 'রাজমোহনের স্ত্রী' শীর্ষক সংশ্লিষ্ট বাংলা রচনাটির সন্ধান প্রথম শচীশচন্দ্রের 'বারিবাহিনী' (১৯১৮) উপন্যাসে পাওয়া যায়।
এবারে আমরা বাংলা রচনা 'রাজমোহনের স্ত্রী' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবেশ করছি। 'রাজমোহনের স্ত্রী' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত রচনা। এই অসম্পূর্ণ রচনাটি শচীশচন্দ্রের বারিবাহিনী (১৯১৮) রচনার মাধ্যমে প্রথম পাঠকদের দৃষ্টিপথে আসে। এই রচনাংশটি সম্পর্কে তিনি বারিবাহিনী-র ভূমিকায় লিখছেন: "পরমারাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর অনতিপূর্বে—১৩০০ বঙ্গাব্দে-এই আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ও শিষ্য আজ ছাব্বিশ বছর পরে শেষ করিল।" এই ভূমিকা থেকে বাংলা রচনা 'রাজমোহনের স্ত্রী' সম্পর্কে দুটি তথ্য গৃহীত হতে পারে—এক. বাংলা রচনাটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের দিকে রচিত, দুই. এই রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। কিন্তু রচনাটি অনুবাদ কী না কিংবা রচনাটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কোনো রচনার সম্পর্ক আছে কী না, এই ভূমিকা থেকে তাও যেমন জানা যায় না, তেমনি বারিবাহিনী গল্পের কতটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, সে সংবাদও জানা যায় না।
Rajmohan's Wife ও অসমাপ্ত রাজমোহনের স্ত্রী-র বিষয়বস্তু একই। অন্যান্য দিক থেকেও মিল আছে। ফলে রচনা দুটি বঙ্কিম-কথাসাহিত্যের পটভূমিতে

বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। রচনাদুটির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ, আর একটি অসম্পূর্ণ, একটি ইংরেজিতে রচিত, অপরটি বাংলায়, এই যা পার্থক্য। কথা-বস্তুর বিষয়বিন্যাস বা উপস্থাপনাও একই রকম। কোন্‌টি মূল আর কোন্‌টি অনুবাদ তা নিয়ে বিতর্কের অবসান সহজ হবে না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বারিবাহিনী-র কতটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা? অর্থাৎ বাংলা রচনা রাজমোহনের স্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র কতদূর লিখে যেতে পেরেছিলেন? কথাবস্তু ও তার উপস্থাপনা একই রকম বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যে-কথাবস্তু ইংরেজিতে প্রথম আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বাংলায় তা নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রসারিত। এরপর শচীশচন্দ্রের বারিবাহিনী-র পরবর্তী অংশের সঙ্গে বঙ্কিম-চন্দ্রের ইংরেজি রচনা Rajmohan's Wife-এর কোনো মিল নেই। বস্তুত শচীশচন্দ্রের বারিবাহিনী-র প্রথম নটি পরিচ্ছেদই বঙ্কিমচন্দ্রের অসমাপ্ত বাংলা রচনা রাজমোহনের স্ত্রী। আর, Rajmohan's Wife ইংরেজি রচনার খবর শচীশচন্দ্রের জানা থাকলে নিশ্চয় তিনি নিজের মতো করে বাংলা রচনাটি সমাপ্ত করতেন না। এতদ্‌সম্পর্কে সাম্প্রতিক কোনো কোনো ধারণা[৪০] যুক্তিযুক্ত নয়। এঁদের বক্তব্য শচীশচন্দ্র Rajmohan's Wife-এর কথা জানতেন। বস্তুত শচীশচন্দ্রের বারিবাহিনী (১৯১৮) রচনার ষোল বছর পর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পুরাতন Indian Field পত্রিকা থেকে Rajmohan's Wife আবিষ্কৃত হয়।

বলাই বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ধারায় প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস রূপে Rajmohan's Wife-এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সম্যক পূর্বাভাস এই ইংরেজি রচনাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নবর্ণিত কয়েকটি সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস সমূহের সঙ্গে Rajmohan's Wife-এর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অনুভব করা যায়।

এক. নভেল-রচনার অনুকূল সমকালীন জীবনধারা বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্য ইংরেজি রচনায় লক্ষণীয়। রচনাটির প্রেক্ষাপট উনবিংশ শতাব্দীর জমিদারতন্ত্র এবং কথাবস্তু রূপে উচ্চবিত্ত বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের কথা গৃহীত হয়েছে। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী—পরবর্তী কালের এই তিনটি উপন্যাসেও জমিদারগৃহের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত ঐতিহাসিক পরিবেশ নিয়ে

৪০. পল্লব সেনগুপ্ত/বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস—চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৭৯ বঃ/১০৫ পৃঃ।

উপন্যাস রচনার পূর্বে সমসাময়িক জীবনধারার প্রতি এই আকর্ষণ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নে একটি অবশ্য বিচার্য সূত্র।

দুই. উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তে নরনারীর প্রেম একটি প্রধান বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও নরনারীর প্রেমই প্রধান বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঔপন্যাসিক স্বভাবের সূত্রপাত Rajmohan's Wife রচনাতেই লক্ষণীয়। আলোচ্য রচনার নায়িকা মাতঙ্গিনীকে কেন্দ্র করেই প্রণয় ব্যাপারটি প্রকাশ পেয়েছে। Love can conquer শীর্ষক অংশে নায়িকা মাতঙ্গিনীর গভীর রাতে একাকিনী সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দয়িত মাধবের নিকট উপস্থিতি, We meet to part পরিচ্ছেদে একমাত্র প্রেমের জন্যই নায়িকার দুঃখকষ্ট বরণের কথা এবং নায়িকার স্বীকারোক্তিতে মাতঙ্গিনী ও মাধবের পরস্পরের ভালোবাসার কথা জানা যায়। রচনাটির কেন্দ্রীয় ঘটনা উইলচুরি হলেও মাতঙ্গিনীর প্রেমবোধ সমগ্র ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করেছে। মাথুর-মাধব-মাতঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে Rajmohan's Wife-এ আধুনিক অর্থে ত্রিভুজ প্রেমের অবতারণা লক্ষণীয়।

তিন. আলোচ্য রচনার বিষয়বিন্যাসে বিশেষত ঘটনা ধারার নাটকীয় মুহূর্তে, নায়িকার আচরণে, রহস্য উদ্ঘাটনে এবং চুরি ডাকাতিতে বঙ্কিম-উপন্যাসের রোমান্স-প্রবণতা পরিস্ফুট। উইলচুরি ও তৎপ্রসঙ্গে মাধবের গৃহে রাজমোহনের যোগসাজসে ডাকাতি এবং পরে মাথুর ঘোষের কাম-চরিতার্থতার জন্য মাতঙ্গিনীকে অপহরণ ইত্যাদি ইংরেজি রচনাটির প্রধান ঘটনাবলী। বস্তুত মাধবের গৃহে ডাকাতিকে কেন্দ্র করেই রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনীর গুপ্ত প্রেমের প্রকাশ। চুরি-ডাকাতির কথা দেবীচৌধুরানী ও রজনী উপন্যাসেও আছে। উইলচুরির ঘটনাটি অবশ্যই কৃষ্ণকান্তের উইল-এর পূর্বাভাস।

চার. কৃষ্ণকান্তের উইল-এর অনেক ঘটনার সাক্ষী বারুণী দীঘির মতোই আলোচ্য উপন্যাসের ফুলপুকুর কয়েকটি ঘটনার কেন্দ্রস্থল। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের প্রাসাদের অনুরূপ প্রাসাদ মাধব ঘোষেরও আছে।

পাঁচ. বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য প্রধান উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও নারী চরিত্র পুরুষ চরিত্রের তুলনায় অধিকতর সক্রিয়। বিশেষত এই উপন্যাসে মাতঙ্গিনীকে বাদ দিলে আর সকল চরিত্রই নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয়। এই রচনার কথাবস্তু নায়িকা-চরিত্র মাতঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকাদের মতো মাতঙ্গিনীও নিঃসন্তান। "মাধব গোবিন্দলালেরই পূর্বপুরুষ এবং মাতঙ্গিনী-হেমাঙ্গিনীর পুনর্জন্ম যথাক্রমে

রোহিণী ও ভ্রমররূপে।"[৪১] উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র করুণাময়ীর সতৃষ্ণ জীবনবোধের মধ্যে হীরা চরিত্রের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

ছয়. মাতঙ্গিনীর স্বামী বংশীবদন ঘোষের সঙ্গে করুণাময়ীর অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক এবং বিষপানে করুণাময়ীর আত্মহত্যা—এই ঘটনার মধ্যে প্রকৃত জীবননিষ্ঠ উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করেন নি। বিষপানে করুণাময়ীর আত্মহত্যা পরবর্তীকালে বিষবৃক্ষ-এর কুন্দনন্দিনীর পরিণামের সঙ্গে তুলনীয়।

সাত. এপিক বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে উপন্যাসটি রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও নিজেকে বিষয়বিন্যাস থেকে দূরে রাখতে পারেন নি। ফলে রচনার নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এরপর আর বলে দিতে হয় না এ কোন বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তী কালের বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বাভাস Rajmohan's Wife ইংরেজি রচনায় লক্ষণীয়।

বিষবৃক্ষ : প্রথম বাংলা নভেল

দুর্গেশনন্দিনীর বর্ণোজ্জ্বল রাজপথ ধরেই বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বাংলা নভেল-রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ বিষবৃক্ষ-গ্রন্থে। বিষবৃক্ষ শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা নভেল নয়, বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম নভেল। বিষবৃক্ষ-গ্রন্থেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়[৪২], 'কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।'

সমসাময়িক জীবনভিত্তিক রচনা বলে নয়, জীবনরস সমৃদ্ধ গল্প বলেই বিষবৃক্ষ-এর গুরুত্ব। কেননা নববাবুবিলাস, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, আলালের ঘরের দুলাল, চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান সমসাময়িক বাঙালি-জীবন-ভিত্তিক রচনা হলেও নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবন-বিশ্লেষণের অভাবে নভেল হয়ে ওঠে নি। কিন্তু বিষবৃক্ষ গ্রন্থেই প্রথম সমকালীন নরনারীর অন্তরঙ্গ সমস্যাসমূহ (বালবিধবার জীবনের রিক্ততা ও অবরুদ্ধ কামনার বহিঃপ্রকাশ, বিবাহিত পুরুষের পরনারী আসক্তি, অবহেলিত পত্নীর মর্মবেদনা) রূপায়িত হয়েছে। এই প্রয়াসও অনেকাংশে ঘটনানির্ভর, কিন্তু অন্তরঙ্গ দিকটিও উপেক্ষিত হয় নি। বিষবৃক্ষের

৪১. সুকুমার সেন/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড/১৩৭০ বঃ/২২০ পৃঃ।
৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শরৎচন্দ্র/প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ বঃ/কলিকাতা/৮০৬-৮০৮ পৃঃ।

বিভিন্ন পত্র এর পরিচয়বহ। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন চরিত্রের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় প্রদানের জন্য বিষবৃক্ষ-গ্রন্থের প্লটরচনায় অভিনব কৌশলে চিঠির ব্যবহার করেছেন। নগেন্দ্র নামক মহদাশয় ব্যক্তিটির রূপজমোহের পরিচয় এবং তার মানসিক গতিপ্রকৃতির সংবাদ পঞ্চম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের পত্রেই প্রথম পাওয়া যায়, পাওয়া যায় একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর পত্রেও। আরো কয়েকটি চিঠির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ-এর প্লটরচনায় মনোবিশ্লেষণের সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং এই ভাবেই তাঁর রচনায় অন্তর্বাস্তবতা সঞ্চারিত হয়েছে।

কথাবস্তুরূপে সমসাময়িক নরনারীর প্রেমজ-জীবনবোধকে তিনি যুক্তিসিদ্ধভাবে ব্যবহার করেছেন। সূর্যমুখী-কুন্দ-নগেন্দ্র ও কুন্দ-হীরা-দেবেন্দ্র—বিষবৃক্ষের বিষয়-বিন্যাসে এই দুটি প্রেমের ত্রিভুজে বালবিধবা কুন্দনন্দিনীই সাধারণ সূত্র। বঙ্কিম-চন্দ্র এই বালবিধবাকে কেন্দ্রে রেখে বিষবৃক্ষ-এর ঘটনাবর্ত রচনায় এবং নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব, অবদমিত কামনা-বাসনা এবং নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ তথা নরনারীর অন্তর্জীবনের উদ্ঘাটনে কালোচিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা নভেলের আদিকর্মিক রূপে এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনবত্ব। সেকালের বাঙালি জীবনে বিবাহ-পূর্ব প্রণয় স্বাভাবিক ছিল না, এক্ষেত্রে কুন্দের মতো বালবিধবাদের সংস্পর্শেই বিবাহ-উত্তর প্রণয় সংঘটন সম্ভব। কৃষ্ণকান্তের উইল-এর প্লট-রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ বিন্যাস-কৌশল অবলম্বন করেন। অবশ্য বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের (১৮৫৬) পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা নারীর ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিভিন্ন সমস্যা রূপায়ণে প্রয়াসী হন। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে বিষবৃক্ষ-এর হীরা অনন্যসৃষ্টি। নারীত্বের অধিকার আদায়ে সে সূর্যমুখীর প্রতিস্পর্ধী। ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সে ছিল সক্রিয়। নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যই সে কুন্দনন্দিনীকে নেপথ্য থেকে প্রকাশ্য মঞ্চে হাজির করে। তারফলে বিষবৃক্ষ-এ জটিলতা ও গতি সঞ্চারিত হয়। হীরাই নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর জটিল জীবনকে জটিলতর করেছে কিন্তু তার প্রচণ্ড জীবনতৃষ্ণার জন্যই অবশেষে তাকে দেবেন্দ্রের রূপাগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হতে হয়েছে। এখানেই হীরা চরিত্রের ট্র্যাজেডি। জীবনকে ভোগ করবার প্রবল বাসনা ও জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ নিয়েই সে যেমন একদিকে সূর্যমুখীর প্রতিস্পর্ধী হয়েছে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কুন্দকে ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে দেবেন্দ্রের লালসাগ্নি থেকে সে

অবলা কুন্দকে রক্ষা করেছে। বস্তুত জীবনবোধের ইতিবাচক দিকসমূহ হীরা চরিত্রে বর্তমান।

এবারে আমরা বিষবৃক্ষ-এর শিল্পশৈলীর বিচারে অগ্রসর হচ্ছি। বিষবৃক্ষের প্লট-রচনায় রোমান্স প্রবণতা, অপ্রাকৃত বিষয়, বিষয়গত অনৈক্য ও নীতি পরায়ণতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর পরিচয়, নগেন্দ্র কর্তৃক কুন্দকে উদ্ধার এবং মৃত্যুর আবহ রচনা (কুন্দের পিতার মৃত্যু এবং কুন্দের মৃত্যু), কুন্দকে পাওয়ার জন্য বৈষ্ণবী বেশে দেবেন্দ্রের নগেন্দ্রের বাটীতে আগমন, অভিমানবশত সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ ও প্রত্যাগমন , কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা এবং কুন্দের মৃত্যুতে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলন বস্তুত রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত[৬৩]। এসব ক্ষেত্রে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের চেয়ে ঘটনার আকস্মিকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শনই বিষবৃক্ষের প্লটগ্রন্থনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নদর্শন পরিণতি জ্ঞাপক ধরে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের প্লটরচনায় মনোযোগী হয়েছেন। কুন্দনন্দিনীর এই স্বপ্নদর্শন ছিল সূত্রধর্মী। পরলোকগতা মাতা স্বপ্নে কুন্দকে দুটি প্রস্তাব দেয়, প্রথম প্রস্তাবে কুন্দের স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ, দ্বিতীয় প্রস্তাবে বেঁচে থাকলে কুন্দকে ভবিষ্যতে দুজনের থেকে দূর-অবস্থান। "আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।" এ দুজনের একজন নগেন্দ্র, অপরজন হীরা। পুনশ্চ তার মা তাকে তার ভবিষ্যতের করুণ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে বলেছিল: "আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোক প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে।" এখানেই শেষ নয়, এরপর তিনি আশ্বাসবাক্য শুনিয়েছেন: "আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব।.. তখন আমার সঙ্গে আসিও।" সচেতন পাঠকের নিকট কুন্দের মৃত্যুর ইঙ্গিত থেকে গেল। লক্ষণীয় যে, কুন্দের প্রথম প্রস্তাব গ্রহণের তাৎপর্য হতো শুধু কুন্দের স্বেচ্ছামৃত্যু নয়, গল্পেরও অকালমৃত্যু এবং তা তৃতীয় পরিচ্ছেদেই। এটি অবশ্যই লেখকের অভিপ্রেত ছিল না। তাই কুন্দ প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করে নি, করলে আমরা নগেন্দ্র নামক মহদাশয় ব্যক্তিটির ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের পরিচয় এবং হীরা নামক উজ্জ্বল নারী চরিত্রটির পরিচয়

৬৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত/১৩৭৫ বঃ/৫৫৯ পৃঃ।

কোন দিনই পেতাম না। বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যচরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাই তিনি প্রথম স্বপ্নের সূত্র ধরেই বিষবৃক্ষ-এর প্লট-রচনায় অগ্রসর হন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধ এই ধারাটিকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দেয় নি। বিধবাবিবাহের করুণ পরিণতি দেখাতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। কেননা প্রথম স্বপ্নের পরই কুন্দের বিবাহ, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে কুন্দের বৈধব্য এবং নগেন্দ্রের গৃহে আশ্রয় লাভ, কিছুকাল পরে নগেন্দ্রের সঙ্গে বাল বিধবা কুন্দের বিবাহ হয়। এই বিবাহই কুন্দের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে এবং মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো গতি ছিল না। এই সূত্রেই দ্বিতীয় স্বপ্নে কুন্দজননী দেখা দিয়ে বলেছে: "কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?" পুনরপি, "বলিযাছিলাম, আর এক বার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসার সুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।" তখন কুন্দের আর্তনাদ আমরা শুনেছি: "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।" জীবন সম্পর্কিত দুঃসহ অভিজ্ঞতা নিয়েই শেষ পর্যন্ত কুন্দ বিষপানে মৃত্যুবরণ করেছে।

বিষবৃক্ষ রচনার পূর্বে একটি পত্রে[৪৪] নভেলের শিল্প বিশেষত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্লটভাবনায় বিষয়গত ঐক্যের কথা জোর দিয়ে বললেও বিষবৃক্ষ-এ বিষয়গত ঐক্য তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। যেমন, হীরা-দেবেন্দ্র প্রসঙ্গটি সর্বাংশে অপ্রয়োজনীয় না হলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চেতনা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ং পূর্ণতা-অভিলাষী। লক্ষণীয় যে, কৃষ্ণকান্তের উইল-এর প্লট অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং নিটোল। গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীকে নিয়ে নভেলের প্রেমের ত্রিভুজটি রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য কৃষ্ণকান্তের উইল নভেল হিসেবে সার্থকতর সৃষ্টি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই গ্রন্থটিকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দিয়েছিলেন।[৪৫] বস্তুত বিষয়বস্তু ও শিল্পশৈলীর বিচারে কৃষ্ণকান্তের উইল-এর উৎকর্ষ তর্কাতীত। প্লটভাবনায় সংহতির অভাবের দিক থেকে বিষবৃক্ষ এক অর্থে মৃণালিনীর উত্তরসাধনা।

জীবনসম্পর্কিত সমস্যাসমূহের উদ্‌ঘাটনই নভেল জাতীয় শিল্পকর্মের প্রধান লক্ষ্য, নৈতিক তত্ত্ব ঘোষণা নয়। সমসাময়িক বাঙালি জীবনের কোনো কোনো গভীর

৪৪. Bankim Rachanavali (English works). Sahitya Samsad, 1969, p.171.
৪৫. বঙ্কিম-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)/সাহিত্য সংসদ/১৩৬৩ বঃ/৩৭ পৃঃ।

সমস্যা অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র মানব জীবন সম্পর্কিত বিশেষ একটি নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্যই বিষবৃক্ষ রচনা করেন। প্রসঙ্গত আমরা বিষবৃক্ষ-এর বহু উদ্ধৃত শেষাংশটি স্মরণ করতে পারি: "আমরা 'বিষবৃক্ষ' সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

বিষবৃক্ষ কি?—শীর্ষক অধ্যায়ে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের আকর্ষণকে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তসংযমের অভাব রূপে অভিহিত করেছেন: "লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।"

বিষবৃক্ষ-এর ভাষাবিচারেও স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম নভেল-এর উপযোগী ভাষার সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সমসাময়িক বাঙালি জীবনের রূপায়ণে তিনি অপেক্ষাকৃত নির্ভার ও সরল সাধুগদ্য ব্যবহার করেছেন। পূর্ববর্তী রোমান্স সমূহের ভাষার সঙ্গে বিষবৃক্ষের ভাষার ব্যবধান বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যজনিত। সমসাময়িক নরনারীর জীবন বিষবৃক্ষ-এর উপাদান বলে তার ভাষাও বর্ণাঢ্য না হয়ে অপেক্ষাকৃত জীবনরস সমৃদ্ধ হয়েছে এবং রচনায় তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব ও দেশজ শব্দের প্রাধান্য স্বাভাবিক হয়েছে।

আলোচিত শৈল্পিক ত্রুটি সমূহ মেনে নিয়েও বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিষবৃক্ষকে প্রথম বাংলা নভেল-এর গৌরব দিতে হবে। কারণ বাংলা নভেল রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রই আদিকর্মিক এবং বিষবৃক্ষই নভেল রচনার প্রথম সচেতন ও সার্থক প্রয়াস। নববাবুবিলাস এবং ফুলমণি ও করুণার বিবরণ নভেলের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত নয়, আর নভেল রচনার সাধ থাকলেও প্যারীচাঁদ বা লালবিহারী কেউই নভেল-এর শিল্পসত্তাকে আত্মস্থ করে নভেল রচনায়, আলালের ঘরের দুলাল এবং চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান এর কথা মনে রেখে, অগ্রসর হন নি।

জীবনরস সমৃদ্ধ মৌলিক বিষয় উদ্ভাবন ও বাংলায় নভেলকে একটি স্বকীয় রূপদান বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। প্রথম বাংলা নভেল বিষবৃক্ষ-এর গুরুত্ব অন্যদিক থেকেও। রবীন্দ্রনাথ বিষবৃক্ষ-এর প্রেরণাকে আত্মস্থ করেই চোখের বালি রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। বঙ্কিম-সুলভ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কতকাংশে প্রচ্ছন্ন রেখে ও প্লট রচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেও বিষয়ভাবনার ক্ষেত্রে বিবাহ-উত্তর প্রেম ও বিধবার প্রেম অর্থাৎ অবৈধ প্রেমকেই রবীন্দ্রনাথ

গ্রহণ করেছেন।[1] চরিত্র পরিকল্পনাতেও বিষবৃক্ষ-এর (এবং কৃষ্ণকান্তের উইল-এরও) প্রেরণা বিশেষ ভাবেই অনুভূত হয়। চোখের বালির আশা কতকাংশে সূর্যমুখী ও ভ্রমরের আদলে গঠিত, মহেন্দ্র নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের মতোই বালবিধবার রূপজ মোহে আকৃষ্ট। বিনোদিনী চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর বিশ্লেষণপন্থী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও রোহিণীর জীবনপিপাসা ও কুন্দনন্দিনীর নির্লিপ্ততাই যেন একক্ষেত্রে সামঞ্জস্যসূত্রে বিধৃত। বিহারী চরিত্রটিকে এনে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতার পরিধি বিস্তৃত করে দিলেন এবং তাঁকে "নামতে হলো মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।" বিনোদিনী চরিত্র-পরিকল্পনা ছাড়া চোখের বালিতে 'দৃঢ় ধাতুর মূর্তি' অবশ্য সুলভ নয়। তা'ছাড়া 'মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ'-দানে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের সাহিত্যে পথিকৃৎ সেই কথাটা তো মানতেই হয়। চোখের বালি উপন্যাসে একাধিকবার বিষবৃক্ষ-এর উল্লেখ এবং উপন্যাস রচনার দীর্ঘকাল পরে 'সূচনা' লিখতে গিয়ে 'বিষবৃক্ষের চাষ' শব্দযুগলের ব্যবহার তাৎপর্যহীন নয়। বিহারীর মুখের কথা ধার করে সমগ্র চোখের বালি উপন্যাসটিকেই তো বলা যায়: 'দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ'!